আবার গোয়েন্দাপীঠ

শ্বাসরোধী সাত কাহিনির সাতসতেরো

সুপ্রতিম সরকার

BanglaBook.org

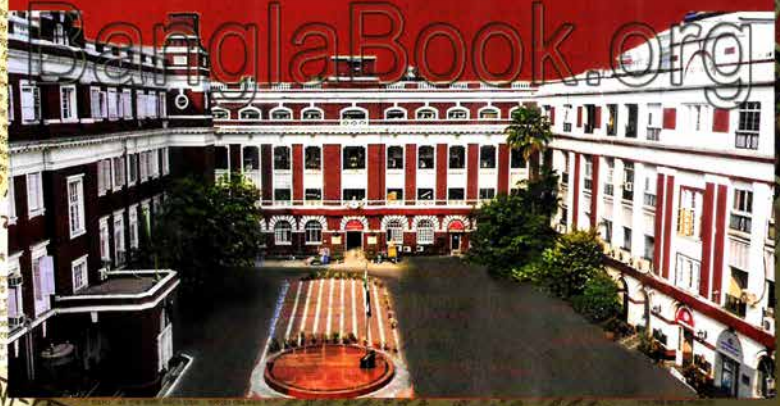

আবার গোয়েন্দাপীঠ, কিন্তু এবার আর শুধু লালবাজারের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতা পুলিশের দুটি মামলার পাশাপাশি এবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরও কয়েকটি বহুচর্চিত ঘটনার রোমহর্ষক নেপথ্যকাহিনি এই বইয়ে মলাটবদ্ধ। স্রেফ ঘটনাপ্রবাহ নয়, নয় স্রেফ তদন্তপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি। অভিজ্ঞ আই পি এস অফিসার সুপ্রতিম সরকারের ক্ষুরধার লেখনীতে 'আবার গোয়েন্দাপীঠ'-এর পাতায় পাতায় ঘটেছে অপরাধ-মনস্তত্ত্বের উন্মোচন। প্রকাশ্যে এসেছে মানবমনের সব গহনের, সব দহনের অন্তরমহল।

www.BanglaBook.org

9 789389 876628

আবার গোয়েন্দাপীঠ, কিন্তু এবার আর শুধু লালবাজারের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতা পুলিশের দুটি মামলার পাশাপাশি এবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরও কয়েকটি বহুচর্চিত ঘটনার রোমহর্ষক নেপথ্যকাহিনি এই বইয়ে মলাটবদ্ধ।

কিছু মামলা থাকে, যা নিয়ে মানুষের আগ্রহ কখনও কমে না। কিছু ঘটনা থাকে, যার 'কী-কেন-কীভাবে'-র আদ্যোপান্ত নিয়ে ঔৎসুক্য চিরকালীন। এরকম একাধিক তুমুল চাঞ্চল্যকর মামলার রুদ্ধশ্বাস বিবরণ ধরা আছে এই বইয়ে। নোয়াপাড়ার সুদীপা পাল থেকে দমদমের সজল বারুই। দেড় দশক ফেরার থাকার পর হুগলির 'ডন' হুব্বা শ্যামলের গ্রেফতারি, কিংবা বীজপুরে ডাকাতি করতে এসে গৃহবধূকে চারতলা থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলা। এমনই সাড়া-জাগানো সাতটি মামলাকে লেখক বেছে নিয়েছেন 'গোয়েন্দাপীঠ' সিরিজের তৃতীয় বইয়ে। স্রেফ ঘটনাপ্রবাহ নয়, নয় স্রেফ তদন্তপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি। অভিজ্ঞ আই পি এস অফিসার সুপ্রতিম সরকারের ক্ষুরধার লেখনীতে 'আবার গোয়েন্দাপীঠ'-এর পাতায় পাতায় ঘটেছে অপরাধ-মনস্তত্ত্বের উন্মোচন। প্রকাশ্যে এসেছে মানবমনের সব গহনের, সব দহনের অন্তরমহল। এ বই রহস্যরসিক পাঠকের। এ বই আগামীর তদন্তশিক্ষার্থীরও। বাংলা অপরাধ-সাহিত্যকে আরও ঋদ্ধ করার যাবতীয় রসদ মজুত এ বইয়ে। গোয়েন্দাপীঠ, আবার।

আবার

গোয়েন্দাপীঠ

শ্বাসরোধী সাত কাহিনির সাতসতেরো

সুপ্রতিম সরকার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০২০

© সুপ্রতিম সরকার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-89876-62-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

ABAR
GOYENDAPITH
SWASRODHI SAT KAHINIR SATSATERO
[Nonfiction]
by
Supratim Sarkar

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুখবন্ধ

'আবার গোয়েন্দাপীঠ' সুপ্রতিমের চতুর্থ বই। 'গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার'-এর দুটি খণ্ড এবং 'অচেনা লালবাজার', লেখকের আগের তিনটি বই-ই যে পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর পেয়েছে, সেটা নতুন কোনও তথ্য নয়। নতুন তথ্য বরং এই, নিজের চতুর্থ বইয়ের কাহিনিসূচিতে লেখক লালবাজারের সীমানা ছাড়িয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরও কয়েকটি মামলার আখ্যান। 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অফ দ্য ইস্ট' বলে খ্যাত কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের কীর্তিও যে এই বইয়ে মলাটবন্দি হয়েছে, সেটা জেনে খুশি হয়েছি।

বাংলা অপরাধ সাহিত্যের ভাণ্ডার নানা স্রষ্টার নানা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রহস্যকাহিনিতে আসক্ত পাঠকের রসনাতৃপ্তির বিপুল আয়োজন রয়েছে সেই ভাণ্ডারে। তবে সে আয়োজন মুখ্যত লেখকদের কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবের ঘটনার ভিত্তিতে পুলিশি তদন্তপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রামাণ্য রচনা (পরিভাষায় 'Police Procedural') স্বল্পই রয়েছে বাংলায়। 'গোয়েন্দাপীঠ' সিরিজের বইগুলি যে সেই তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কল্পনার গোয়েন্দাকাহিনিতে লেখকের স্বাধীনতা থাকে চরিত্রদের ইচ্ছেমতো ভাঙাগড়ার, ঘটনাকে ইচ্ছেমতো বোনার, রহস্য-রোমাঞ্চের উপাদানকে ইচ্ছেমতো সাজানোর। বাস্তবের কাহিনি নিয়ে লেখায় এই স্বাধীনতা থেকে লেখক বঞ্চিত। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট থাকে স্পষ্ট লক্ষ্মণরেখা, যার বাইরে পা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ঘটনা যা ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল, চরিত্ররা যে যেমন ছিল, তার থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হওয়ারও বিলাসিতা দেখাতে পারেন না লেখক। এই সীমাবদ্ধতাকে যদি মাথায় রাখি, বাস্তবের অপরাধের রহস্যভেদের কাহিনিকে পাঠকের কাছে মনোগ্রাহী ভাবে পরিবেশন করা সহজ কাজ নয়। আগের বইগুলিতে এই কঠিন কাজটি সাবলীল দক্ষতায় করে দেখিয়েছে সুপ্রতিম। পাঠক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই বইটিতেও 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'। লেখনীর গুণে এবং ঘটনার বিন্যাসে প্রতিটি কাহিনিই এত টানটান, একবার শুরু করলে শেষ না করে থামতে পারবেন না।

যে-সাতটি কাহিনি এই বইয়ে স্থান পেয়েছে, তার প্রত্যেকটিই চাঞ্চল্যকর। সমাধান-পরবর্তী বিচারপর্বে কত যে বাধাবিপত্তি পেরিয়ে অপরাধীর শাস্তিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হয় রক্তমাংসের গোয়েন্দাদের, লেখক তা লিপিবদ্ধ করেছেন কলকাতা পুলিশের একটি বিরল মামলার বিবরণে। সারা বাংলায় আলোড়ন ফেলে-দেওয়া এবং মানুষের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে-যাওয়া এমন কিছু ঘটনার নেপথ্যকথা সবিস্তারে ধরা আছে এই বইয়ে, যে মামলাগুলি সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ-ঔৎসুক্য আজও সীমাহীন। 'Juvenile Delinquency', অর্থাৎ শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা এবং মনস্তত্ত্বের নিপুণ কাটাছেঁড়া করেছেন লেখক, দুটি তুমুল সাড়া-জাগানো মামলার আদ্যোপান্ত বর্ণনায়। যাঁরা ভবিষ্যতের তদন্তপড়ুয়া, তাঁরা এই বই থেকে প্রভূত উপকৃত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই বইয়ের লেখককে দীর্ঘদিন সহকর্মী হিসাবে চেনার সূত্রে জানি, যে কোনও কাজেই পরিশ্রম আর আন্তরিকতায় এতটুকুও ঘাটতি রাখে না সুপ্রতিম। উপরন্তু, একটা সহজাত সৃজনশীল মন আছে তার, আছে চমৎকার রসবোধ। সুপ্রতিমের লেখালেখিতেও এই গুণগুলির স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়। দায়িত্বপূর্ণ

পদের নানাবিধ পেশাদারি চাপ সামলানোর ফাঁকে সময় বার করে পুরনো মামলার হাজার হাজার পাতার কেস ডায়েরি ঘাঁটা, মামলার নির্যাসকে একটি সুখপাঠ্য কাহিনির ঠাসবুনোট কাঠামোয় বাঁধা এবং বাস্তবের গোয়েন্দাদের কৃতিত্বের একটা ধারাবাহিক 'ডকুমেন্টেশন' করে যাওয়া নিবিড় যত্নে... এ কাজের জন্য গভীর 'প্যাশন'-এর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় দায়বদ্ধতার। লেখকের সেই 'প্যাশন' এবং দায়বদ্ধতার পরিচয় আপনারা পাবেন এই বইয়ের প্রতিটি পাতায়।

'আবার গোয়েন্দাপীঠ' পাঠকমন জয় করবেই,আমি নিশ্চিত।

অনুজ শর্মা
নগরপাল, কলকাতা
১ জানুয়ারি, ২০২০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখকের কথা

‘গোয়েন্দাপীঠ’ সিরিজের তৃতীয় বই। ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’-এর প্রথম দুটি খণ্ডের থেকে চরিত্রে ভিন্ন নয় মোটেই। এ বইয়ে মলাটবন্দি বাস্তবের মামলা, বাস্তবের গোয়েন্দা এবং বাস্তবেরই তদন্ত-আখ্যান। আগের দুটির মতোই।

ভিন্ন অবশ্য ব্যাপ্তিতে। লালবাজারের চৌহদ্দি পেরিয়ে ‘আবার গোয়েন্দাপীঠ’ পা রেখেছে রাজ্যের অন্যত্রও। এ বইয়ে কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একাধিক তুমুল চাঞ্চল্যকর মামলার ইতিবৃত্ত।

‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’-এর প্রথম দুটি খণ্ড পাঠক-প্রশ্রয় পাওয়ার পর থেকে কিছু বার্তা নিয়মিত আসত কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজের ইনবক্সে। আসত লেখকের কাছে সরাসরিও।

‘আচ্ছা, বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও তো অনেক সাড়া-জাগানো মামলা আছে। ওগুলোর তদন্ত নিয়ে জানতে চাই। যেমন ধরুন দমদমের ওই কেসটা...।’

‘রাজ্য পুলিশের সিআইডি-ও তো বহু হইচই ফেলে-দেওয়া কেসের রহস্যভেদ করেছে। সেগুলো নিয়ে লেখা হবে না কিছু? ওই যে সেই ডাকাতির ঘটনাটা...।’

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঠিকই তো। শুধু তো কলকাতা নয়, পাঠকের প্রবল কৌতূহল তো স্বাভাবিকই সেই সব ঘটনা নিয়েও, যা ঘটেছিল রাজ্য পুলিশের এলাকায়। এবং যার সমাধান হয়েছিল নিখাদ পেশাদারি উৎকর্ষে। এমন সব ঘটনা, এমন সব মামলা, এমন সব চরিত্র, কুড়ি-পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেলেও যা নিয়ে এখনও অনন্ত আগ্রহ সাধারণের। কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল, কীভাবে হয়েছিল, তা মোটামুটি মনে থাকলেও নেপথ্যকথা আরও বিশদে জানার ঔৎসুক্যে ভাটা পড়েনি বিন্দুমাত্র।

সেই আগ্রহ-ঔৎসুক্য-কৌতূহল নিরসনের যথাসাধ্য প্রয়াস রয়েছে 'আবার গোয়েন্দাপীঠ'-এ। এই বইয়ের একাধিক কাহিনিতে বাধ্যতই উঠে এসেছে শিশু-কিশোরদের অপরাধ-মনস্তত্ত্বের কাটাছেঁড়া। উঠে এসেছে এমন কিছু কেসের সবিস্তার ঘটনাপ্রবাহ, যার ভয়াবহতা আজও গেঁথে রয়েছে আমবাঙালির স্মৃতিতে।

প্রথম দুটি খণ্ডের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় আরও একটি সংগত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। মহিলা গোয়েন্দা কি নেই পুলিশে? পুরুষতন্ত্রই একচেটিয়া? যদি তা না হয়, তা হলে 'গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার' সিরিজের দুটি বইয়ে কেন স্থান পায়নি মহিলা গোয়েন্দাদের সমাধান করা কোনও কেস?

পুরুষদের কিছুটা আধিপত্য আছে তদন্তক্ষেত্রে, অনস্বীকার্য। কিন্তু সে দাপট মোটেই নয় নিরঙ্কুশ। মেধা-পরিশ্রম-আন্তরিকতার ত্র্যহস্পর্শে বহু জটিল মামলার সুচারু সমাধান করেছেন মহিলা গোয়েন্দারা। বাস্তবের ফেলু-ব্যোমকেশদের সঙ্গে সমানে পাল্লা-দেওয়া 'মিতিনমাসি'-দের দক্ষতার নমুনা এই খণ্ডে ধরা রইল কলকাতা পুলিশের এক বিরল মামলার তদন্তপ্রক্রিয়ায়।

কলকাতার নগরপাল শ্রীঅনুজ শর্মার উৎসাহ এবং প্রশ্রয় ছাড়া দিনের আলো দেখত না এই বই। তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন মামলার ব্যাপারে বহু প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে যে সহকর্মীরা অকৃপণ সাহায্য করেছেন, তাঁদের ছোটই করা হয় শুকনো ধন্যবাদ জানালে। কৃতজ্ঞতা রইল অকুণ্ঠ।

কয়েকটি কাহিনিতে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে কিছু পার্শ্বচরিত্রের। যাঁরা এখনও জীবিত, এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। আসল নাম ব্যবহার করে ওঁদের সামাজিক বিড়ম্বনা বাড়াতে চাইনি।

আশা, এ বই রহস্যরসিক পাঠকের ভাবনার রসদ জোগাবে। চিন্তার উপাদান জোগাবে অপরাধ-বিজ্ঞানের পড়ুয়াদের।

গোয়েন্দাপীঠ, আবার।

১ জানুয়ারি, ২০২০
কলকাতা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচিপত্র

শ্যামলদা, ভাল আছেন? ১

হাতে মাত্র ৯৬ ঘণ্টা ২৭

গন্ধটা সন্দেহজনক ৫২

গোরস্থানে আজও সাবধান ৮৪

যা গেছে তা যাক ১০২

মিতিনমাসিও সত্যি ১২৭

সিনেমাতেও এমন হয় না ১৪৭

নির্দেশিকা ১৬৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

শ্যামলদা, ভাল আছেন?

—শালা পুরো পৈতে করে দিয়েছি বডিটাকে।

—মানে?

—আবে...পৈতে বুঝিস না? আড়াআড়ি নামিয়ে দিয়েছি। চিরে গেছে পুরো। ঘাড় থেকে কোমর অবধি। ওই যে রে, যেভাবে পৈতে থাকে বামুনদের। আর মালটাকে কুপিয়েছি ওর মায়ের সামনে। বুড়ি তো রক্ত দেখে বেহুঁশই হয়ে গেল...

—মায়ের সামনে মারলে এভাবে?

—দরকার ছিল। ইচ্ছে করেই করেছি। মালটা পুলিশের খোঁচড়গিরি করছিল বড্ড। মহেশতলার ঠেকে গত হপ্তার রেইডটা ওই-ই করিয়েছিল। পাকা খবর আছে আমার কাছে। তাই ঘরে ঢুকে মারলাম। মায়ের সামনে পৈতে করে দিলাম। এই যে লুড়কে গেল... আর কারও হিম্মত হবে না মাথা তোলার...কই বে...ঢাল একটা মোটা করে... মাথাটা ছাড়ুক একটু...

—এই নাও দাদা... এইট্টি এমএল... তিনটে ঢকাঢক নামিয়ে দিলেই দেখবে মদটা চলকাচ্ছে ভেতরে...

—ধুর... ওসব এইট্টি ফেইট্টিতে খোড়ি চলকায় আমার! কিসে চলকায় জানিস? মার্ডারের পর। গরম রক্তটা যখন ছিটকে এসে মুখে লাগে না... কী আর বলি তোদের!... বুঝবি না তোরা... গরমাগরম রক্ত স্ট্রেট ছিটকে এসে মুখে... আঃ... বিন্দাস... ও নেশার কাছে মদ-ফদ মায়া...

'দাদা'-র ব্যাখ্যা স্তব্ধ করে দেয় গোল হয়ে ঘিরে বসে থাকা শ্রোতাদের। 'দাদা'। বন্ধুদের কাছে 'শ্যামল'। জুনিয়রদের কাছে 'শ্যামলদা'। বা স্রেফ 'দাদা'। বাকিদের কাছে, প্রতিপক্ষ গ্যাংয়ের কাছে, পুলিশের কাছে পরিচয় অন্য নামে। যে নামে রিষড়া-কোন্নগর অঞ্চলে বাঘ, গোরু এবং অন্যান্য যা যা প্রাণী আছে, সব এক ঘাটে জল খায়।

হুব্বা। হুব্বা শ্যামল।

BanglaBook.org

ডাক্তার আর পুলিশ। নানাধরনের মৃতদেহ দেখতে হয় এই দুই পেশার লোকদের। সাধারণ লোকের গা গুলিয়ে উঠবে দেখলে, এমন থ্যাঁতলানো-দোমড়ানো-পচাগলা ক্ষতবিক্ষত 'বডি'

হরিধা শ্যামল

খুঁটিয়ে দেখাটা ডাক্তার বা পুলিশের রুটিন কাজের মধ্যেই পড়ে। অভ্যেস হয়ে যায়। বিকৃত মৃতদেহ আলাদা করে কোনও প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় না সচরাচর।

এই লাশটা ব্যতিক্রম। পড়ে ছিল রিষড়া রেলগেটের কাছে। বহু ডেডবডি দেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রিষড়া থানার ওসি-ও প্রথম দেখায় চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। মৃতের বয়স পঁচিশ-তিরিশের বেশি নয়। শরীরের উপরের অংশ আড়াআড়িভাবে কোপানো। ডানদিকের কাঁধ থেকে বাঁদিকের কোমর অবধি। বেলাগাম বেরিয়ে পড়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ছড়িয়েছে-ছিটিয়েছে রাস্তায়। ধারালো অস্ত্রের কোপ পড়েছে গলাতেও। এক নয়, একাধিক। এ খুনের বর্ণনায় 'নৃশংস' নেহাতই নরম বিশেষণ।

খবর পেয়ে স্পটে চলে এসেছেন এসডিপিও (সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার), শ্রীরামপুর। যিনি লাশে একঝলক চোখ বুলিয়ে দৃশ্যতই সামান্য বিচলিত হয়ে পড়েছেন, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক থাকার। ওসি তাকান এসডিপিও-র মুখের দিকে। আন্দাজ করার চেষ্টা করেন তরুণ আইপিএস অফিসারের অস্বস্তির কারণ, 'স্যার, বডি আইডেন্টিফাই হয়নি এখনও। চেনেন নাকি একে?'

মানুষটাই যখন নেই আর, পরিচয় গোপন করাটা প্রহসন। এসডিপিও উত্তর দেন শান্ত গলায়, 'সোর্স ছিল আমার। উত্তরপাড়ার ছেলে। কেউ জানত না যে ও সোর্স। খুব রিলায়েবল ছিল। অসম্ভব সাহস... দুর্দান্ত নেটওয়ার্ক...পিনপয়েন্ট খবর দিত... দিন দশেক আগের মহেশতলার রেইডটার ইনপুটগুলো ওরই ছিল...'

চুপ করে থাকেন ওসি। তিনি নিজেও মহেশতলার ওই রেইডে ছিলেন। মহেশতলা থানা থেকে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে একটা তেমাথা মোড়। মোড়ের মাথায় একটা পানবিড়ির দোকান। যার থেকে বাঁ হাতে কয়েকশো মিটার হেঁটে গেলে দোতলা বাড়ি একটা। দোতলাটা ভাল করে ঢালাই হওয়া বাকি এখনও। এসডিপিও সাহেবের কাছে খবর ছিল, ওই দোতলায় পালের গোদা সহ ফুল টিম-কে পাওয়া যাবে রাত সাড়ে বারোটার পর। মদ-মাংস-মোচ্ছবের ঢালাও আয়োজন থাকবে মধ্যরাতের 'ঠেক'-এ।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ হলে যা হয়, বাদ সেধেছিল সন্ধে থেকে অঝোর বৃষ্টি। 'মুভমেন্ট' যতটা

BanglaBook.org

গোপন রাখা উচিত, ততটা রাখা যায়নি। ওই আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির মধ্যেও বাড়িটাকে 'কর্ডন' করা হয়েছিল সোয়া একটা নাগাদ। কাউকে পাওয়া যায়নি। যাদের ধরতে যাওয়া, তারা যে কোনওভাবেই হোক, রেইডের আঁচ পেয়ে গিয়েছিল। সোর্সের সেদিনের খবর যে একশো শতাংশ ঠিক ছিল, সে তো এই ছিন্নভিন্ন লাশই জানান দিচ্ছে। বাংলা হিসেব, পুলিশের 'সোর্স' হওয়ার চরম মাশুল দিতে হয়েছে এই যুবককে।

বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে গাড়িতে ওঠেন এসডিপিও। রহস্যের 'র'-ও নেই এখানে। তদন্তেরও 'ত' নেই। খুনটা কে করেছে, কেন করেছে, সে নিয়ে ভাবারও কিছু নেই। রিষড়া রেলগেটের লেভেল ক্রসিংটাও জানে।

হুব্বা। হুব্বা শ্যামল।

সন্ধে নেমেছে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্তের ব্রিফিং সেরে নিচ্ছেন ডিআইজি সিআইডি (অপারেশনস), যাঁকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অফিসাররা। মন দিয়ে শুনছেন প্রতিটা শব্দ।

—আর্মস থাকবে না ওদের কাছে, এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর। সুতরাং ক্রসফায়ার আউট অফ কোয়েশ্চেন। যদি পালানোর চেষ্টা করে, কেউ ফায়ার করবে না। জানি, প্রাইজ ক্যাচ, কিন্তু ফায়ারিং আন্ডার নো সার্কামস্ট্যান্সেস...আই রিপিট... আন্ডার নো সার্কামস্ট্যান্সেস। ভিড়ের মধ্যে পাবলিকের কোনও ইনজুরি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে... প্রেজ কিপ দিস ইন মাইন্ড। তেমন হলে জাস্ট দৌড়ে চেজ করবে... নাথিং মোর। দৌড়ে কোথায় যাবে, কতদূর পালাবে? ধরা পড়বেই। গাড়িদুটো কোথায় থাকবে সেটা আরেকবার বুঝে নাও ভাল করে। পেয়ে গেলে সোজা এনে গাড়িতে তুলব আমরা। আর বেশি সময় নেই হাতে... জাস্ট অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার... কোনও ডাউট আছে কারও? এনি কোয়েশ্চেনস?

উত্তর আসে সমস্বরে, 'নো স্যার!'

'ডন'। শব্দটা ইদানীং অপাত্রে দান করে মিডিয়া। মাঝারি মাপের কোনও স্থানীয় গুন্ডা-মস্তানের নামের আগেও 'ডন' বা 'গ্যাংস্টার' বসিয়ে দেওয়াটা আজকাল নেহাতই সাধারণ ঘটনা।

এ কাহিনি তেমন কোনও রাম-শ্যাম-যদু গোত্রের মস্তানকে নিয়ে নয়। খুচরো গুন্ডামি আর টুকরো মস্তানির সীমানা ছাড়িয়ে কীভাবে আক্ষরিক অর্থেই 'ডন' হয়ে উঠেছিল হতদরিদ্র

BanglaBook.org

পরিবারের এক অশিক্ষিত যুবক, পুলিশকে প্রায় দুই দশক ধরে নাকানিচোবানি খাইয়ে অপরাধ-দুনিয়ায় কীভাবে কায়েম করেছিল একাধিপত্য, তার কিছুটা ধরা থাকল এ কাহিনিতে। ধরা থাকল পুলিশের সঙ্গে ধারাবাহিক টক্করের ইতিবৃত্ত। এবং পরিণতি।

শ্যামল দাস। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বাবা শ্রমিক, হুগলির শ্রীদুর্গা কটন মিলে। কোন্নগরের ধর্মডাঙায় একটা বাড়িতে কোনওমতে সপরিবার দিন গুজরান। পাড়ার স্কুলে বাবা ভরতি করিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেদের। কিন্তু ক্লাস থ্রি-র বেশি আর পড়াশুনো এগোয়নি শ্যামলের। মা-বাবার হাজার বাবা-বাছা সত্ত্বেও যেতই না স্কুলে। আর গেলেও পালিয়ে আসত একটা-দুটো ক্লাসের পরেই। রিষড়া রেলগেটের কাছে গিয়ে মালগাড়ির আসা-যাওয়া দেখত। ভাবত, মালগাড়ি বলে কেন? কী 'মাল' থাকে ওই ইয়া ইয়া বগিগুলোর ভিতরে? কারা পাঠায়? কোথায় পাঠায়?

স্কুলের পাট চুকে যাওয়ার পর কিশোর শ্যামলের দিন কাটত ঘুঁটে দিতে মা-কে সাহায্য করে আর রাতটা কাটত বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। দোসর ছিল ঠিক উপরের দাদা বাচ্চু। স্কুলের মায়া সে ক্লাস ফাইভেই কাটিয়ে দিয়েছিল। আটের দশকের শুরুর দিক তখন। দুই ভাই মিলে খুঁজে বেড়াত টাকা রোজগারের সহজ উপায়। চোদ্দো বছর বয়েসেই বিড়ি আর 'বাংলা'-য় বউনি। নেশার খরচটা তো অন্তত তুলতে হবে। বাবা একদিন খুব বকাঝকা করলেন শ্যামল-বাচ্চুকে। বাচ্চু চুপ করে থাকল। শ্যামল অবশ্য চুপ করে বকুনি হজম করার বান্দা নয়। বাবার মুখের উপর সরাসরি বলে দিল, 'তোমার মতো মজুরগিরি আমি করব না। তার চেয়ে ওয়াগন ভাঙলে অনেক বেশি টাকা। আমি নিজেরটা নিজে বুঝে নেব।' বাবা কাঞ্জিলাল দাস বুঝে গেলেন, এ ছেলে পোষ মানার নয়। এই বয়সে নিজেরটা নিজেই বুঝে নেবে বলছে। ঠিকই বলছে বোধহয়। না হলে চোদ্দো বছর বয়সে বুঝে যায় ওয়াগন ভাঙার হিসেব! মুখের উপর তেড়িয়া মেজাজে বলে দেয়, 'মজুরগিরি করব না!'

'ওয়াগন ব্রেকিং'-এ শ্যামলের হাতেখড়ি অবশ্য বছরদুয়েক পরে। ক্রিমিনাল কেরিয়ারের শুরু তারও আগে, স্থানীয় আইসিআই ফ্যাক্টরির মালপত্র চুরি করা দিয়ে। যে ফ্যাক্টরির স্থানীয় নাম 'অ্যালকালি'। রাতের অন্ধকারে সরিয়ে ফেলা মালপত্র বেচে যা আসত, তাতে আর কতটুকু হত? মাসে দুটোর বেশি সিনেমা দেখা যেত না। সপ্তাহে একদিনের বেশি 'ইংলিশ' খাওয়া যেত না। পকেটে পয়সা না থাকায় মাঝপথে জুয়ার বোর্ড ছেড়ে উঠে যেতে হত। অ্যালকালি ফ্যাক্টরির পাশের মাঠে বসে শ্যামল ক্ষোভ উগরে দিত বন্ধুদের কাছে, 'ধুর, এভাবে বাঁচা তো সেই মিল মজদুরের বাঁচাই হল।'

আরও একটু ভালভাবে বাঁচতে অগত্যা ওয়াগন ভাঙা আর টুকটাক ছিনতাই। 'টুকটাক'-এর গণ্ডি অবশ্য দ্রুতই পেরল বছর আঠারোর শ্যামল। কোন্নগরে একটা ফ্যাক্টরির টাকা নিয়ে সংস্থার এক কর্মী সাইকেলে করে সন্ধেবেলা ফিরছিলেন। শ্যামল আটকাল কোন্নগর আন্ডারপাসের

BanglaBook.org

মুখে, 'টাকার ব্যাগটা দে!' ওই কর্মী প্রতিবাদ করলেন, 'এটা আমার টাকা নয়। কোম্পানির টাকা। তা ছাড়া যারই টাকা হোক, তোকে দেব কেন? তুই কে? কোন হরিদাস?' বলামাত্রই শ্যামল সোজা ছুরি ঢুকিয়ে দিল পেটে। এবং টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট।

ওটাই প্রথম খুন। পুলিশের খাতায় ছিঁচকে ছিনতাইবাজ থেকে দাগি দুষ্কৃতীতে উত্তরণের ওটাই প্রথম ধাপ। সেই প্রথম পুলিশের তাড়ায় সাময়িক পালিয়ে যাওয়া এলাকা থেকে। থানায় থানায় 'রাফ রেজিস্টার' বলে একটা খাতা থাকে। যাতে নথিবদ্ধ রাখা হয় এলাকার দুষ্কৃতীদের নাম। সেখানে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সেই প্রথম জায়গা পেল শ্যামল। চেহারার বর্ণনায় (পুলিশি ভাষায়, 'ডেস্ক্রিপটিভ রোল') লেখা হল, বেঁটে, হাইট পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি। গায়ের রং চাপা। ছিপছিপে চেহারা।

অপরাধী হিসেবে 'গুরুত্ব' যে ক্রমশ বাড়বে আরও, প্রথম খুনের মাসদুয়েকের মধ্যেই সেটা জানান দিল শ্যামল। কোন্নগর-নবগ্রাম এলাকায় পরপর কয়েকটা ডাকাতি করে। দাদা বাচ্চু এবং কিছু উঠতি চ্যাংড়াকে সঙ্গে নিয়ে মাঝরাতে গৃহস্থবাড়িতে ঢুকে বেপরোয়া লুঠপাট। কেউ প্রতিরোধ করলে এলোপাথাড়ি মারধর।

লোহাচুরি-টুরি অনেকেই করে। কিন্তু এই আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেটা তো নিজের পাড়ার আশেপাশেই ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে! স্থানীয় মানুষ উত্তরপাড়া থানায় ডেপুটেশন দিলেন। প্রতিদিন অন্তত দু'বার করে শ্যামলের ধর্মডাঙার বাড়িতে শুরু হল পুলিশি রেইড। প্রতিটা ঘরের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তল্লাশি। শ্যামলের বাবা-মাকে পুলিশ স্পষ্ট বলে এল, 'ছেলেকে বলুন সারেন্ডার করতে। না হলে রোজ এভাবে বাড়িতে পুলিশ আসবে যখন-তখন, লাইফ হেল হয়ে যাবে আপনাদের।'

বাড়ির চাপ। পুলিশের চাপ। এলাকার মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সামাজিক চাপ। পাড়াছাড়া হতে বাধ্য হল শ্যামল। সেটা আটের দশকের শেষ ভাগ, '৮৬-৮৭। মা-বাবা-ভাইদের প্রতি কোনও পিছুটান ছিল শ্যামলের, এমন অভিযোগ কখনও কেউ করতে পারেনি। প্রবল পিছুটান বরং ছিল অন্যত্র। পাড়ারই এক কিশোরীর সঙ্গে প্রেম গত কয়েক বছর ধরে। নাম তাপসী। যার পরিবারের ঘোর আপত্তি ছিল একজন সমাজবিরোধীর সঙ্গে মেয়ের মেলামেশায়। পাড়াছাড়া হওয়ার পর এক বন্ধু মারফত ক্লাস এইটের তাপসীকে বার্তা পাঠাল শ্যামল, 'কয়েকটা বছর শুধু ধৈর্য ধরে থাকো...।' কথা রেখেছিল শ্যামল। বছরদুয়েকের মধ্যেই এক রাতে ঝটিতি অভিযানে দলবল নিয়ে ঢুকেছিল পাড়ায়। তাপসীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করেছিল পরের দিনই।

সমাজবিরোধী তো অনেকেই থাকে। কিন্তু গুন্ডামি-মস্তানির প্রচলিত সীমানা পেরিয়ে যদি কোনও সমাজবিরোধীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি 'বাহুবলী' হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি থাকে, পৃষ্ঠপোষকের বড় একটা অভাব হয় না আমাদের সমাজে। ছাতা একটা জুটেই যায় ঠিক। জুটে গেল শ্যামলেরও।

BanglaBook.org

দক্ষিণ শহরতলির এক রাজনৈতিক নেতার বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠল। ঘাঁটি গাড়ল মহেশতলায়।

পরের ছ'-সাত বছর হুগলিতে পাকাপাকিভাবে ঢুকতে না পারলে কী হবে, রাজ্যের অন্যত্র এবং কখনও কখনও রাজ্যের বাইরেও একটার পর একটা ক্রাইম করে বেড়িয়েছিল শ্যামল। কী নেই অপরাধের সেই দশকর্ম ভাণ্ডারে? হাওড়ার বন্ধ কারখানার লোহার ছাঁট পাচার। দূরপাল্লার ট্রেনে প্যাসেঞ্জার সেজে উঠে গভীর রাতে ডাকসাইটে ডাকাতি। বেপরোয়া বোমাবাজি করে এলাকা দখল কোনও রাজনৈতিক দাদার অঙ্গুলিহেলনে। মোটা টাকার বিনিময়ে 'সুপারি-কিলিং'।

এমনই এক সুপারি-কিলিং করতে গিয়ে নয়ের দশকের শুরুতে মুঘলসরাইয়ে রেলপুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল শ্যামল। মাসখানেকের জেলযাত্রার পর বেরিয়ে এসে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করেছিল দাদাগিরি। চেহারাটাও বদলে গেছিল এই কয়েক বছরে। ছিপছিপে ছিল না আর। শরীরে জমছিল সমৃদ্ধির মেদ। এই শ্যামলের 'ডেস্ক্রিপটিভ রোল' লিখতে হলে 'ছিপছিপে' বদলে গিয়ে হত 'গাট্টাগোট্টা, সামান্য মোটার দিকে'।

'গ্যাং' থাকলে তবেই না গ্যাংস্টার! শ্যামল একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল নিজস্ব গ্যাং। হাওড়ার কুখ্যাত সাট্টা-কারবারি রাম অবতারের কাছে সাট্টার প্যাড লেখার কাজ করত রমেশ মাহাতো। কিন্তু স্বপ্ন দেখত 'বড়' মাঠে খেলার। প্যাড লেখে তো পাতি পাবলিক, ক'পয়সাই বা হয়? বালি-বেলুড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা জুয়ার ঠেকে শ্যামল-রমেশের আলাপ। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব, এবং সেই বন্ধুত্ব গভীরতর হয়ে শ্যামলের গ্যাংয়ের অলিখিত নাম্বার টু হয়ে ওঠা রমেশ মাহাতোর।

নাম্বার থ্রি? 'বেনারসি বাপি'। আসলে বাঙালি। নাম, বাপি খাস্তগির। বেনারসে জন্ম এবং বড় হওয়া বলে নাম 'বেনারসি'। শ্যামলের সঙ্গে প্রথম দেখা লিলুয়ার বিজলি কোয়ার্টারে, যেখানে দুষ্কৃতীদের নিত্য যাতায়াত। লম্বায় ছ'ফুট, নির্মেদ শরীরের বাপিকে দলে নিতে একটুও ভাবতে হয়নি শ্যামলকে। গ্যাংয়ের অন্যদের অনেকেরই নাম করা যায়। লম্বা লিস্ট। তবে 'কোর গ্রুপ' বলতে মন্টু, সত্য, পুতন, চিকুয়া, জিতেন্দর, নেপু...।

শেষ নামটা অন্যদের তুলনায় কিছু বাড়তি শব্দ দাবি করে। নেপু— নেপু গিরি। কিছু লোকের বোধহয় জন্মই হয় অপরাধ-লগ্নে। নেপু যেমন। 'বর্ন ক্রিমিনাল' গোত্রের। শুধু বন্দুকের অপেক্ষা, 'নামিয়ে দিয়ে আয় তো নেপু।' কোনও প্রশ্ন না করে যাকে 'নামানোর' নির্দেশ এসেছে, তাকে খুন করে আসবে নির্মম নির্বিকার। এমন পেশাদার খুনির দরকার ছিল শ্যামলের।

'খুন' ব্যাপারটা অবশ্য নেপুর থেকেও ঢের বেশি মজ্জাগত ছিল শ্যামলের। অপরাধ-বিজ্ঞানের খটোমটো পরিভাষায় বললে, শ্যামল ছিল 'প্যাথলজিক্যাল কিলার'। আনন্দ পেত খুন করে। হয়তো প্রাণে মেরে ফেলার দরকারই নেই কাউকে, স্রেফ ধমকধামকই যথেষ্ট, তবু শ্যামল বিজাতীয় তৃপ্তি পেত 'লাশ ফেলে দিয়ে'। মদের সঙ্গে গাঁজার নেশা জমে উঠলে বাবু হয়ে বসে

BanglaBook.org

থাকত স্থির। বদলে যেত চোখের দৃষ্টি। কথা প্রায় বলতই না। এমন একটা বোমভোলা চেহারা হত যে, সঙ্গীরাই বলত, 'দ্যাখ... দাদা পুরো হুব্বা হয়ে গেছে!'

সেই থেকেই নামকরণ। হুব্বা। হুব্বা শ্যামল। নেশার ঘোরে থম মেরে 'হুব্বা' হয়ে থাকার সময়টাতেই শ্যামল ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। তখনই মাথাচাড়া দিত কারণে-অকারণে রক্ত দেখার তাড়না, লাশ দেখার স্পৃহা—'ধুর... এসব মদ-ফদ মায়া... আমার কিসে চলকায় জানিস... মার্ডারের পর যখন গরম রক্তটা মুখে ছিটকে এসে লাগে না... আঃ... বুঝবি না তোরা...!' রমেশ-বাপি-মন্টুর মতো ঘনিষ্ঠরা শ্যামলের এই রক্ত দেখার রাত্রিকালীন ছটফটানিটা জানত। বছরের পর বছর ধরে সঙ্গে থাকার ফলে আঁচ করতে পারত, ওইসময় আশেপাশে বিরোধী গ্রুপের ছেলে পেলে তো কথাই নেই, এমনকী নিজের গ্রুপের ছেলেছোকরাদের উপরও যখন-তখন চড়াও হয়ে যেতে পারে শ্যামল। রমেশ টিমের জুনিয়রদের বলেই রেখেছিল, 'শ্যামল যদি কোনওদিন রাত সাড়ে দশটার পর ডাকে, আসবি না। না এলে দাদা রাগ করবে, এই ভয়ে দুম করে চলে আসবি না কিন্তু। বেশি রাতে ডাকলে আসবি না, ব্যস। দাদা রাগ করলে করবে। সেটা আমি সকালে বুঝে নেব।'

হাতে যথেষ্ট টাকা। দুর্ধর্ষ গ্যাং-ও তৈরি এই ক'বছরে। শ্যামল সিদ্ধান্ত নিল, ঘরের ছেলের ঘরে ফেরার এটাই সেরা সময়। কোন্নগর-ধর্মডাঙায় শ্যামলের, সরি, হুব্বা শ্যামলের সদলবল পুনঃপ্রবেশ ঘটল এলাকাছাড়া হওয়ার প্রায় এক দশক পরে। ৯৫-'৯৬-এ, নয়ের দশকের মাঝামাঝি। লক্ষ্য মূলত দুটো। প্রথম, রিষড়ায় সদ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া বিন্দাল ফ্যাক্টরিতে পড়ে থাকা লক্ষ লক্ষ টাকার মাল পাচার। দ্বিতীয়, হুগলি-হাওড়ার অপরাধ দুনিয়ায় 'বেতাজ বাদশা' হয়ে ওঠা।

প্রথম লক্ষ্যপূরণে অভিনব পন্থা নিল শ্যামল। নিজে বা নিজের টিমের ছেলেপুলেদের দিয়ে ফ্যাক্টরির মাল চুরি আর পাচার আর নয়। ওসব কেরিয়ারের শুরুর দিকে অনেক হয়েছে। এবার চুরিটা অন্যরা করুক, কিন্তু নিজের টিমের নজরদারিতে।

কীরকম? শ্যামল নিয়ম বেঁধে দিল। জটিল কিছু নয়। বিন্দাল ফ্যাক্টরির মাল যে কেউ চুরি করতে পারে। অবারিত দ্বার। কিন্তু চুরির পর বেচতে হবে শ্যামলের কাছেই। এবং বাজারদরের থেকে অর্ধেক দামে। এক কেজি ছাঁটের বাজারদর যদি তিনশো টাকা হয়, ফ্যাক্টরি থেকে সরানো সেই এক কেজি শ্যামলকে বেচতে হবে দেড়শো টাকায়। অর্ধেক দামে কিনে নেওয়া সেই মাল এবার শ্যামল বাজারে বেচত চলতি দরে।

এই সিস্টেমের প্রতিবাদ করার মানে পৃথিবী থেকেই 'খরচা' হয়ে যাওয়া, জানত সবাই। জানত, শ্যামলের সঙ্গে এই কেজি প্রতি দেড়শো টাকাটা অন্তত দুশো করতে চেয়ে একজন তর্কাতর্কি করেছিল। পরিণতি ভাল হয়নি। বুকে সোজা পিস্তল ঠেকিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গলায় শ্যামল বলেছিল, 'পাঙ্গা নেওয়ার আগে তোর একটা জিনিস মনে রাখা উচিত ছিল। গাড়িটা তুই চালাচ্ছিস না। আমি

BanglaBook.org

চালাচ্ছি।' এরপর দুটো গুলি খরচ করেছিল শ্যামল। 'পাঙ্গা'-নেওয়া লোকটির 'বডি' খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের খাতায় 'মিসিং'। জনশ্রুতি, লাশটা রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

হাজার হাজার টনের অরক্ষিত এবং পরিত্যক্ত মাল এভাবে বেচে খুব দ্রুত টাকার পাহাড়ে পা রাখল শ্যামল। অতঃপর দ্বিতীয় লক্ষ্য। এলাকায় নিজের নিরঙ্কুশ আধিপত্যে শিলমোহর দেওয়া।

খুব সোজা হল না ব্যাপারটা। অপরাধ জগতে শূন্যস্থান 'শূন্য' থাকে না বেশিদিন। এলাকায় প্রায় এক দশক ধরে শ্যামলের অনুপস্থিতির সুযোগে তৈরি হয়ে গিয়েছিল একাধিক ছোট-বড় গ্যাং। যাদের মধ্যে শ্যামলের দিকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মতো বুকের পাটা একজনেরই ছিল। বাঘা। ভাল নাম, ভোলানাথ দাশ। যে একসময় ছিল শ্যামলেরই টিমে। বখরা নিয়ে ঝামেলায় দল ছেড়েছিল। কোন্নগর পেরিয়ে কানাইপুরে ঢুকলেই বাঘার এলাকা শুরু।

'৯৭-৯৯, এই সময়টায় শ্রীরামপুর মহকুমার পুলিশ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল শ্যামল-বাঘার টক্কর, এলাকা দখলের লড়াই, খুন-পালটা খুন, বোমাবাজি, রক্তপাত। খুনোখুনি কখনও কখনও এতটাই মাত্রা ছাড়াত যে ঘটনার আঁচ মহকুমা বা জেলা পেরিয়ে পৌঁছে যেত কলকাতাতেও। জায়গা করে নিত শহরের বাংলা-ইংরেজি খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। একবার যেমন হল। শ্যামলের গ্রুপের দুটো ছেলেকে রাতের দিকে একলা পেয়ে কুপিয়ে মেরে দিল বাঘার ছেলেরা। পরের রাতেই বদলা নিল শ্যামল। বাঘার পাড়াতে দলবল নিয়ে ঢুকে চূড়ান্ত তাণ্ডব করল। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিল বাঘার বাড়ি। বাঘা কোনওমতে জনাদুয়েক সঙ্গীকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। পালাতে পারেনি চারজন। তারা বাঁচল না। তাদের কুপিয়ে পিস পিস করে কেটে স্থানীয় পুকুরপাড়ে ফেলে রেখে গেল শ্যামল।

দু'দিনের মধ্যে দুষ্কৃতীদের গোষ্ঠী-সংঘর্ষে আধডজন খুন হলে পুলিশি প্রতিক্রিয়া যেমন হওয়ার, তেমনই হল। জেলার সমস্ত থানা থেকে অফিসার-ফোর্স এনে শ্যামল আর বাঘা, দু'জনের গ্রুপের ছেলেদের সবার বাড়িতে রাতভর তল্লাশি-অভিযান। সোর্সের খবর অনুযায়ী একাধিক গোপন ঠেকে একযোগে হানা। মোড়ে মোড়ে পুলিশ পিকেট। গাড়ি থামিয়ে নাকা-চেকিং। চব্বিশ ঘণ্টাই সাদা পোশাকে নজরদারি তিন শিফটে। ধরাও পড়ল বেশ কয়েকজন। কিন্তু মূলত যাকে ধরার জন্য এত আয়োজন, সেই শ্যামল বেপাত্তা। ভ্যানিশ।

শ্যামলের ঘনিষ্ঠ বলয়ে ছিল যারা, সেই রমেশ-বাপি-মন্টু-পুতন-নেপু-চিকুয়া-রা সবাই কখনও না কখনও ধরা পড়েছিল নয়ের দশকের এই শেষের বছরগুলোয়। শ্যামলই শুধু 'অড ম্যান আউট'। ধরা পড়েনি কখনও। কোনও গুন্ডা-মস্তান কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় কিছুদিন দাদাগিরি করে বেড়িয়েছে, মস্তানিতে কাঁপিয়ে দিয়েছে, এমন উদাহরণ খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু শ্যামলের ব্যাপারটা আলাদা। এত খুন-জখম-লুঠপাট করেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বছরের পর বছর অধরা থাকাটা শ্যামলকে শুধু হুগলিতে নয়, সারা রাজ্যেরই

BanglaBook.org

অপরাধ-মানচিত্রে 'মিথ'-এর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর যে ধরা পড়ে পড়ুক, শ্যামলকে ধরতে পারবে না পুলিশ, এই ধারণাটা একটা দীর্ঘসময় ধরে জলবাতাস পেয়েছিল। শ্যামল নিজেও 'ডন' ছবিতে বচ্চনের কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া ডায়লগটা সামান্য পালটে নিয়ে বলত রাতের আড্ডায়, 'শ্যামলকো পকড়না মুশকিল হি নহি... না-মুমকিন হ্যায়।'

কেন মুশকিল? কেন না-মুমকিন? কোন জাদুমন্ত্রে নিজের রাজ্যপাট দিব্যি কায়েম রেখেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকত পুলিশের? পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মী-অফিসার, যাঁরা নব্বই-এর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে পরের দশ বছরের কোনও না কোনও সময় কাজ করেছেন শ্রীরামপুর মহকুমায় বা হুগলি জেলার অন্যত্র, তাঁদের সঙ্গে কথা বললে একাধিক কারণ বেরিয়ে আসে।

এক, শ্যামলের অত্যাশ্চর্য ইনফর্মার-নেটওয়ার্ক। যাঁরা রিষড়া-কোন্নগর অঞ্চলের বাসিন্দা বা নিয়মিত যাতায়াত আছে ওই এলাকায়, তাঁরা জানবেন স্থানীয় ভূগোল। যাঁরা যাননি কখনও, ধারণা নেই তেমন, তাঁদের জন্য বলা, রিষড়া-কোন্নগর অঞ্চলের বিভিন্ন বন্ধ হয়ে যাওয়া ফ্যাক্টরির বিস্তীর্ণ এলাকার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল শ্যামলের বিচরণভূমি। অ্যালকালি... জেকে স্টিল... বিন্দাল... ইউনাইটেড ভেজিটেবলস...। পাশাপাশি ছিল স্থানীয় ক্লাব 'সেবক সংঘ'-র মাঠ.. ধর্মডাঙা... বারুজীবী কলোনি...।

শেষ যে জায়গার নামটা লিখলাম, কৌশলগত কারণে সেটাই ছিল শ্যামলের পক্ষে নিরাপদতম। বারুজীবী কলোনি। রাতে এখানেই থাকত বেশিরভাগ সময়। কেন? এই জায়গাটায় তিনদিক দিয়ে ঢোকা যেত। রিষড়া রেলগেট দিয়ে। কোন্নগর আন্ডারপাস দিয়ে। কিংবা দিল্লি রোড দিয়ে ডানকুনি হয়ে। ডানকুনি হয়ে পুলিশের গাড়ি ঢুকলে দেখা যেত অনেক দূর থেকে। কিন্তু রিষড়া রেলগেট বা কোন্নগর আন্ডারপাস দিয়ে পুলিশের পক্ষে দ্রুত ঢুকে যাওয়া সম্ভব ছিল বারুজীবী কলোনিতে। ডিফেন্সকে মজবুত করতে তাই রেলগেট আর আন্ডারপাসের মুখে সন্ধে থেকে ভোর অবধি 'ডিউটি' করত শ্যামলের বাহিনী। নজরে রাখত প্রতিটা গাড়ি, প্রতিটা বাইককে। সাদা পোশাকে পুলিশ ঢুকছে, এ নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ হলেও নিমেষের মধ্যে মোবাইলে খবর চলে যেত শ্যামলের কাছে।

এ তো গেল রাত। নজরদারি বজায় থাকত দিনের বেলায়ও। এলাকার প্রতিটা গলিতে, প্রতিটা মোড়ে ছড়িয়ে থাকত ইনফর্মাররা। যাদের সবাইকে মাসে মাসে ভদ্রস্থ অঙ্কের টাকা দিত শ্যামল। দিয়ে রাখত মোবাইল ফোন। ওসি থেকে শুরু করে এসডিপিও বা জেলার এসপি স্বয়ং...বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিসার কম চেষ্টা তো করেননি শ্যামলকে ধরতে। রিকশা করে, অটো করে, বাইকে করে, নানারকম ছদ্মবেশে প্রাণপ্রাত চেষ্টা হয়েছে, যাতে পুলিশের গতিবিধি আন্দাজ করতে না পারে শ্যামলের লোকেরা। কিন্তু লাভ হয়নি। 'খবর' হয়ে গেছে মোক্ষম সময়ে। পাখি উড়ে গেছে।

শ্যামল যে সময়ে ক্রমে ত্রাস হয়ে উঠছে রিষড়া-কোন্নগর-উত্তরপাড়া এলাকায়, তখন ওই

BanglaBook.org

এলাকায় কাজ করেছেন এমন এক পুলিশ অফিসারের বক্তব্য তুলে দিচ্ছি হুবহু, ...'ডিমওয়ালা, সবজিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ইস্ত্রিওয়ালা, পাড়ার চায়ের দোকান, মুদির দোকান, সর্বত্র সোর্স ছিল শ্যামলের। এটা রেইড-এর সময় আমরা ফিল করতে পারতাম। ধরুন রিষড়া রেলগেট পেরলাম সিভিল ড্রেসে। রিকশা করে। বা পায়ে হেঁটে। অদৃশ্য নজরদারি যে একটা চলছে, সেটা সেন্স করতে পারতাম স্থানীয় মানুষের চোখের ইশারায় বা ফিসফিসানিতে। শ্যামলের চ্যালাচামুন্ডাদের মুখে শুনেছি, নানারকম কোডনেম ছিল খবর দেওয়ার। "ছোটপাখি" মানে ওসি। "মেজোপাখি" মানে সিআই বা সার্কেল ইনস্পেকটর। আর "বড়পাখি" মানে এসডিপিও। রেইড হত, কিন্তু ফিরতাম খালি হাতে। এক একসময় এত হতাশ লাগত যে কী বলব! মনে হত এলাকার গাছগুলোও বোধহয় শ্যামলের সোর্স। না হলে এতটা সিক্রেসি মেইনটেইন করার পরেও প্রত্যেকবার খবর পেয়ে যায় কী করে?'

এই 'কী-করে'-র উত্তরেই উঠে আসে দ্বিতীয় কারণ। সোর্সের মধ্যেই ভূত। পুলিশরই একাংশ মনে করেন, ফোর্সের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরে নিজের লোক 'ফিট' করেছিল শ্যামল। অন্তর্ঘাত না হলে বারবার 'অপারেশন' ফেল করতে পারে না। আর রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের কথা তো আগে লিখেইছি। বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়ার পর 'নিরাপদ' আশ্রয়ের অভাব হত না শ্যামলের। কখনও কখনও আবার পুলিশের 'রেডার'-এর সম্পূর্ণ বাইরে চলে যেত দু'-একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে। মণিপুর, মেঘালয় বা মিজোরাম। এলাকা ঠান্ডা হলে ফিরে আসত কয়েক মাস পরে।

তিন নম্বর কারণ, এলাকায় নিজের একটা 'রবিনহুড' ইমেজ গড়ে তোলা। পাড়ার কোনও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ের বিয়েতে হয়তো টাকা জোগাড় হচ্ছে না লোক খাওয়ানোর। মেয়ের বাবা শ্যামলকে এসে ধরলেন। এলাকার কোনও ক্যাটারারকে ডেকে শ্যামল নিজস্ব ভঙ্গিতে হুকুম জারি করল, 'ভাল মেনু করবি। মাছ-মাংস রাখিস। আর যা বিল হবে, তার থার্টি পারসেন্টের বেশি নিবি না। কিন্তু তা বলে খাবারের কোয়ালিটি যদি খারাপ হয়েছে শুনি...।' কথা শেষ করার প্রয়োজনই হত না, বিয়ের ভোজ মিটে যেত নামমাত্র টাকায়। পাড়ার কোনও মেধাবী ছাত্রের কলকাতার ভাল কলেজে অ্যাডমিশনের টাকা জোগাড় হচ্ছে না। শ্যামলের দরবারে গিয়ে আর্জি জানালে মুশকিল আসান। স্থানীয় কোনও ব্যবসায়ীকে ফোন করে সামান্য চমকানিতেই কাজ হয়ে যেত। টাকা পৌঁছে যেত ছাত্রের পরিবারে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে কেউ ঝগড়া করে না। কোন্নগরে বাস করে কেউ শ্যামলের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়াত না।

একটা পরিত্রাতা ইমেজ তৈরি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তা বলে এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই যে শ্যামল আদতে দয়ালু প্রকৃতির এবং গরিবের দুঃখে বুক ফেটে যেত। নিজের রোজগার ছিল অঢেল। কিন্তু যা যা 'পরোপকার' করে পাড়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার জন্য একটা পয়সাও নিজের পকেট থেকে খরচ করত না। খোলাখুলিই বলত, 'লোকে জানছে, শ্যামলদার

BanglaBook.org

জন্য কাজটা হল। আমার ওটুকুই দরকার। আমার মাল খসছে কী অন্যের, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।'

স্ট্র্যাটেজি পরিষ্কার ছিল। স্থানীয় মানুষের কিছু উপকার করে কৃতজ্ঞতা কিনতে থাকো এলাকায়, যাতে 'শ্যামলদা'-র বিপদে-আপদে লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'বিপদ-আপদ' মানে পুলিশের 'রেইড', 'ঝাঁপিয়ে পড়া' মানে চোখকান খোলা রেখে পুলিশের গতিবিধির ব্যাপারে 'দাদা'-কে খবর দেওয়া। খবরের বিনিময়ে অনেককে মাসোহারা দিত শ্যামল, আগেই লিখেছি। কিন্তু এমনও অনেকে ছিল, যারা বিনে পয়সাতেই 'ইনফর্মার'-এর কাজ করত। পরোপকারে বিনিয়োগের ফসল সুদে-আসলে এভাবেই তুলেছিল শ্যামল।

কারণ নম্বর চার, নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস না করার প্রবণতা। যতই নেশার ঘোরে 'হুব্বা' হয়ে যাক, জুয়ার বোর্ডে যতই উপচে পড়ুক টাকার বান্ডিল, রাতটা কোথায়, কোন ঠেকে বা কার বাড়িতে কাটাবে, কেউ জানত না। কাউকে বলত না। দিনের বেলায়ও কোথাও যদি যাওয়ার থাকত কখনও, সময়টা নির্দিষ্ট করে জানাত না কোনও অবস্থাতেই। বলত, বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে যাব। বা চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে। এবং ওই সময়টায় হয়তো যেতই না আদৌ। যেত ওই সময়সীমার আগে-পরে।

সময়ের এই সামান্য হেরফেরেই পাকা খবর থাকা সত্ত্বেও মহেশতলার রেইডটায় এসডিপিও-র নাগাল থেকে বেরিয়ে গেছিল শ্যামল। শুরুতে বলেছি সেই ব্যর্থ রেইডের কথা। লিখেছি, খবরটা যে দিয়েছিল, এসডিপিও-র সেই সোর্সের দেহ দিনদশেক পর পাওয়া গিয়েছিল রিষড়া স্টেশনের কাছে। বাড়িতে ঢুকে মায়ের সামনে কুপিয়ে শ্যামল ভয়ংকরতম বদলা নিয়েছিল পুলিশকে খবর দেওয়ার। এবং রাতে মদের ঠেকে রসিয়ে রসিয়ে বিবরণ দিয়েছিল খুনের, 'আড়াআড়ি নামিয়ে দিয়েছি। চিরে গেছে পুরো। ঘাড় থেকে কোমর অবধি। আর মালটাকে কুপিয়েছি ওর মায়ের সামনে। পুরো পৈতে করে দিয়েছি বডিটাকে।'

কখনও 'পৈতে'। কখনও 'ফুটবল মাঠ'। কখনও 'বোটি কাবাব'। এক একরকম খুনের বর্ণনায় এক একরকম বিশেষণ ব্যবহার করত শ্যামল। টুকরো টুকরো করে কাটলে সেটা 'বোটি কাবাব'। পেট চিরে দিয়ে ভিতরে নুড়িপাথর আর ঘাস ভরে দিলে সেটা 'ফুটবল মাঠ'। মোট কত খুন করেছিল শ্যামল? সরকারি হিসেবেই যদি ধরি শুধু, ১৯৯৬-২০০০-এর মধ্যেই অন্তত কুড়িটা খুনের ঘটনায় সরাসরি যুক্ত ছিল। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আটের দশকের শেষ থেকে ধরলে, তা নিয়ে জল্পনাই করা যেতে পারে শুধু। তিরিশ? চল্লিশ? নাকি আরও অনেক বেশি?

পুলিশের নাগালের বাইরে থাকার নেপথ্যে পঞ্চম এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, শ্যামলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, দুরন্ত উপস্থিত বুদ্ধি এবং চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। বিভিন্ন সময়ে শ্যামলের টিমের যে ছেলেপুলেরা ধরা পড়ত, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ

BanglaBook.org

পুলিশকে বুঝিয়ে দিত, অন্যদের থেকে ঠিক কোথায় আলাদা ক্লাস থ্রি অবধি বিদ্যের 'অশিক্ষিত' শ্যামল।

টুকরো কিছু ঘটনার উল্লেখ থাক। সেবক সংঘের মাঠে ঠেক বসেছে। তখন শ্যামল কুড়ি-বাইশ। চাঁদনি রাত। এক সঙ্গী একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল দু'-তিন পেগ পেটে পড়ার পর, 'কী অ্যাটমোসফেয়ার মাইরি। মনেই হচ্ছে না এটা রিষড়া! তাজমহলে বসে মাল খাচ্ছি মনে হচ্ছে, বল?' শ্যামল শুনে সরলভাবেই প্রশ্ন করল, 'তাজমহল? এই বারটা আবার কোথায়? নতুন হল নাকি?' সঙ্গীরা হাসিতে ফেটে পড়ত, 'তাজমহলের নাম শুনিসনি? আরে বার নয় রে!' অপ্রতিভ দেখাত শ্যামলকে।

অথচ তাজমহলেরও নাম-না-শোনা এই শ্যামলই তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিত যখন-তখন। ওই সেবক সংঘ মাঠেরই একটা ঘটনায় যেমন। বেশ কয়েকটা হারিকেনের আলোয় চলছে খানাপিনা। হঠাৎই শ্যামল বলে উঠল, 'এই, আলো বন্ধ কর, পুলিশ আসছে।' অন্যরা অবাক। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। কিচ্ছু নেই। কী করে বুঝল পুলিশ আসছে? আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। আর তার ঠিক মিনিট দেড়েক পরে মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে পুলিশের গাড়ি বেরিয়ে গেল একটা। চলে যাওয়ার পর আবার যখন চালু হল মদ-মাংস, বাকিরা শ্যামলকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে বুঝলি?'

শ্যামল হাসল, 'এই জন্যই আমি আমার জায়গায়, আর তোরা তোদের জায়গায়। থানার জিপগুলো বেশিরভাগই দেখবি লজ্‌ঝড়ে। যত্ন নেই। তার উপর হেবি রাফ চালায়। তাই দেখবি হেডলাইটের পজিশন ঠিক থাকে না। উঁচুনিচু হয়ে যায়। অন্য গাড়িতে আলো সোজা রাস্তায় পড়ে। পুলিশের গাড়িতে দেখবি হেডলাইটের আলোটা একটু উপরে পড়ে। ইলেকট্রিকের তারে ঝিলিক মারে। আমি তারে ওই আলোর ঝিলিকটা দেখলাম। মানে পুলিশ।'

মোবাইলের যুগে যে টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অবস্থান জেনে নেওয়া যায়, বছরের পর বছর চোর-পুলিশ খেলতে খেলতে জেনে গিয়েছিল শ্যামল। জেনে গিয়েছিল, পুলিশ ফোনে আড়িও পাততে পারে নম্বর জানা থাকলেই। সেই প্রযুক্তি এসে গেছে। চূড়ান্ত সতর্ক থাকত ফোন নিয়ে। অন্তত হাফ ডজন মোবাইল সঙ্গে থাকত অষ্টপ্রহর। নিজের কাছে দুটো। বাকিগুলো সর্বক্ষণের সঙ্গীদের কাছে। পালটে পালটে ব্যবহার করত প্রত্যেকটা। একটা ফোন টানা দু'ঘণ্টার বেশি চালু রাখত না কখনওই। কোন ফোনটা যে কখন চলবে, কোনটা যে কখন বন্ধ হবে হঠাৎ, কখন যে ফের চালু হবে, কেউ জানত না। সবসময় মাথায় রাখত, হয়তো নম্বরগুলো জেনে গেছে পুলিশ। হয়তো প্ল্যান করছে রেইড-এর। হয়তো আড়ি পেতে শুনছে কথাবার্তা। শ্যামল তাই ফোনে কথা বলতও কম। আর বলার সময়ও এমন কিছু কথা ভাসিয়ে দিত ইচ্ছে করে, যাতে পুলিশ বিভ্রান্ত হয়। হয়তো আছে কোন্নগরে, রাতে কোনও একটা 'অপারেশন' করার কথা আছে রিষড়ায়। একটা ফোনে কাউকে বলল, 'রাতে

BanglaBook.org

হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির সামনে চলে আয়। বাকি কথা ওখানে হবে।' সঙ্গীরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে ক্রুর হাসত শ্যামল, 'একটু চুক্কি দিলাম আর কী! পুলিশ জাতটাকে বিশ্বাস নেই। যা বলছি, শুনছে হয়তো। শুনলে শোন না... যা ঘুরে মর হাওড়ায়। আমি এদিকে কাজটা সেরে নিই। নো রিস্ক।'

রিস্ক নিত না, এমন নয়। নিত, কিন্তু ভেবেচিন্তে। বাঘার সঙ্গে যখন সেয়ানে-সেয়ানে চলছে কোন্নগর-কানাইপুরে, একদিন দুপুরবেলা শ্যামল একা বাইক চালিয়ে বারুজীবী কলোনিতে ঢুকল। ঢুকল কানাইপুরের দিক থেকে। যেটা বাঘার এলাকা। রমেশ জিজ্ঞেস করল, 'এই রাস্তা দিয়ে এলি যে? এই ঝুঁকি নেয় কেউ? আর রাস্তা ছিল না? বাঘার এরিয়া দিয়েই আসতে হল? যদি বাঘার ছেলেরা দেখতে পেয়ে যেত? যদি ঘিরে নিত?'

শ্যামলের উত্তর সোজাসাপ্টা, 'আরে তোরাও যেমন! বাঘার পাড়া দিয়ে ঢোকাই তো সবচেয়ে সেফ রে! ওরা যদি আমাকে দেখেও ফেলত, ভাবতেও পারত না যে আমি একা ঢুকেছি। ভাবত, আশেপাশে ছেলে আছে অনেক। অ্যাটাক করতে এসেছি বোধহয়। ভয় পেয়ে যেত। বাঘাকে খবর দিত। গুলি-বোমা নিয়ে রেডি হতে ওদের সময় লাগত কিছুটা। তার মধ্যে এই দ্যাখ আমি আরামসে নিজের মহল্লায়। যাতায়াতের সময় রুট বদলাবি মাঝে মাঝে। একই রুটে গেলে ডেঞ্জার বেশি। নে নে... ঢাল একটা...।'

ফোনই শুধু ঘনঘন বদলাত না, বদলাত চেহারাও। কখনও শুধুই গোঁফ রাখত। কখনও গোঁফের সঙ্গে একমুখ দাড়ি। এবং তার উপর পাগড়ি চড়িয়ে পাক্কা পাঞ্জাবি। কখনও আবার গোঁফদাড়ি উড়িয়ে দিয়ে পরিপাটি ক্লিনশেভন। দূরপাল্লার ট্রেনে প্যাসেঞ্জার সেজে উঠে রেলডাকাতি করত যখন কেরিয়ারের শুরুর দিকে, তখন থেকেই ছদ্মবেশ ধরায় পটু। কখনও বিহারি সাজত, কখনও পাঞ্জাবি। সেই অনুযায়ী পোশাক-আশাক। চেহারার ছিরিছাঁদ পালটানোর এই অভ্যেস আগাগোড়া বজায় রেখেছিল শ্যামল। ঠিক এই মুহূর্তের মুখের চেহারাটা কেমন, রেইড করার সময় জানত না পুলিশ। দীর্ঘদিন অ্যারেস্ট না হওয়ায় সাম্প্রতিক কোনও ছবি ছিল না শ্যামলের। বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার হওয়া সঙ্গীদের থেকে চেহারার বিবরণ শুনে এবং সোর্সদের সঙ্গে কথা বলে একটা ধারণাই তৈরি ছিল শুধু।

নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে 'রিস্ক ফ্যাক্টর' শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে আনার চেষ্টা করত সবসময়। বাইক চালাত দুর্দান্ত। কেউ কখনও অন্যের বাইকের পিছনে বসতে দেখেনি। সে যতই নেশা হোক, 'পিলিয়ন রাইডিং' কখনও নয়। বলত, 'অন্য কেউ শালা কোথায় কখন গাড়ি ভিড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে কোনও?'

গুলি-বোমার ব্যাপারেও একই নীতি। এক শাগরেদের ভাষায়, শ্যামল লোহা আর ছিলামে দানা নিজে ভরত। হজমোলা নিজেই বানাত। ডেটলেও অন্য কাউকে হাত দিতে দিত না। বলত, 'নিজের মাল নিজে রেডি করব। অন্যের বানানো মাল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজেই যদি ফুটে যাই?'

BanglaBook.org

অন্ধকার জগতের ভাষা এগুলো। 'লোহা' মানে দেশি পিস্তল। মুঙ্গেরে বানানো পিস্তল, যার ম্যাগাজিন আছে গুলি ভরার, তার নাম 'ছিলাম'। 'দানা' কী, পাঠক হয়তো আন্দাজ করতে পারছেন। গুলি। 'ডেটল' মানে বোম বানাতে যে নাইট্রোগ্লিসারিন লাগে। আর 'হজমোলা'? শিশি বোমার কোডনেম।

সব বিষয়ে অবশ্য শ্যামল এতটা স্বাবলম্বী ছিল না। ব্যাঙ্কের চেকবইয়ে সই করা যেমন। শ্যামলের একেবারে ছোটবেলার এক বন্ধুর কথায়, 'যখন প্রথম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলল, সে এক কাণ্ড! ইংরেজি অক্ষর লিখতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাওয়ার অবস্থা। 'এস' আর 'এইচ' লিখতেই আধঘণ্টা কাটিয়ে দিল। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলল, এর থেকে তো ক্ষুর দিয়ে লেখা সোজা ছিল। ঘণ্টাদেড়েকের কসরতের পর কোনওভাবে সই করল চেকে। আর মকশোর কাগজটা রেখে দিল ওয়ালেটে। ওটা সবসময় সঙ্গে রাখত। বলত, 'না দেখে নিজের নাম ইংরেজিতে লেখ? পারবই না!'

এলাকা দখলে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফুলে ঢোল। পুলিশি রেইড থেকে বাঁচার নিরাপত্তা বলয় আরও নিশ্ছিদ্র। এর পরের ধাপে যা হয়ে থাকে সাধারণত, সেটাই ঘটল শ্যামলের ক্ষেত্রেও। প্রোমোটারির অন্দরমহলে পা রাখা। বালি-উত্তরপাড়া-রিষড়া-কোন্নগরে প্রচুর আবাসন তৈরি হচ্ছে তখন। যেখানে যা জমি খালি পড়ে ছিল, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। টাকা উড়ছে, শুধু লুফে নিতে হবে। শ্যামল ঠিক করল, খুনখারাপি-ঝামেলা অনেক হয়েছে। এবার 'ডন' থেকে 'ব্যবসায়ী' হওয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে লাখ পেরিয়ে কোটিতে খেলার।

প্রথম জমিটা দখল নেওয়ার সময় 'দাদাগিরি' অবশ্য করতেই হল। একটা প্লট পছন্দ হয়েছিল শ্যামল-রমেশের। কিনে ফ্ল্যাট বানিয়ে চড়া দরে বেচলে প্রচুর মুনাফা। কিন্তু যে দর 'অফার' করল শ্যামল, তাতে রাজি হচ্ছিলেন না জমির মালিক। বললেন, 'তোমরা জলের দরে চাইছ জমিটা। এ হয় না। আমি এর চেয়ে অনেক বেশি দাম পাব কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে।' শ্যামল সোজা পিস্তল বের করে পেটে ঠেকিয়ে দিল, 'বেঁচে থাকলে তবে তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। হয় জমিটা দিন, নয়তো মরে যান। আপনার চয়েস।' বেঁচে থাকাকেই বেছে নিলেন জমির মালিক। শ্যামলের প্রথম প্রজেক্টে ইট-বালি-সিমেন্ট পড়তে শুরু করল।

সেই শুরু, এবং বছরখানেকের মধ্যেই এলাকার প্রোমোটিংয়ে মৌরসিপাট্টা কায়েম করে নেওয়া। এখানেও নিয়ম বাঁধা। কোনও একটা জমিতে হয়তো কেউ ফ্ল্যাট বানাচ্ছে। প্রতি স্কোয়ারফুট পিছু ৫০ থেকে ৭০ টাকা বরাদ্দ থাকবে শ্যামলের জন্য। কারও দখলে হয়তো কোনও জমি আছে, কিন্তু জি প্লাস থ্রি বানানোর পয়সা নেই। শ্যামল টাকার জোগান দিত। শুধু,

BanglaBook.org

মাসে তিন শতাংশ সুদ। লোকেশন যদি খুব ভাল হয়, সুদের হার বেড়ে পাঁচ শতাংশ। এর উপর স্কোয়ারফুট পিছু ৫০ থেকে ৭০ টাকা তো রইলই।

আরও ছিল। ফ্ল্যাট কেউ শ্যামলের দেওয়া টাকাতেই বানাক বা নিজের পয়সায়, ইট-বালি-সিমেন্ট কিনতে হবে শ্যামলের এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের দোকান থেকে। যার ইমারতি সামগ্রীর ব্যবসা। স্কোয়ারফুটের মাপজোক যাতে ঠিকঠাক হয়, তার জন্য মাসমাইনের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করেছিল শ্যামল। ইঞ্জিনিয়ার সাইটে গিয়ে সব দেখেটেখে এসে রিপোর্ট দিলে তবেই শুরু হত টাকাপয়সার গল্প। হিসেবপত্রের জন্য অবশ্য মাইনে দিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট রাখার দরকার পড়েনি। শ্যামল নিজেই রাখত প্রতিটা পাইপয়সার হিসেব। একটা খাতায় যেভাবে লিখে রাখত পাওনাগন্ডার খুঁটিনাটি, দেখলে কে বলবে ক্লাস থ্রি-তেই পড়াশোনায় ফুলস্টপ!

টাকা আসতে লাগল বন্যার স্রোতের মতো। খুব নিম্নবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা কোনও সমাজবিরোধী যখন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে পড়ে, চোখে ঝিলমিল লেগে যায়। সমাজের উচ্চকোটির জীবনযাত্রাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেখে দেখার একটা মোহ তৈরি হয়। শ্যামল ব্যতিক্রম ছিল না। বিলাসবহুল গাড়িতে যাতায়াত বাড়ল শহরে। একাধিক ফ্ল্যাট ভাড়া নিল কলকাতায়। ভাড়া অবশ্য নিত খুব অল্পদিনের জন্য। তারপর ছেড়ে দিয়ে ফের অন্য এলাকায় অন্য ফ্ল্যাট। খুব ঘনিষ্ঠ দু'-একজন ছাড়া কেউ জানত না ফ্ল্যাটগুলোর ঠিকানা। যেখানে মাঝেমাঝে খানাপিনা নাচাগানার আসর বসাত শ্যামল। এক রাতের সুর আর সুরার আয়োজনে উড়ে যেত লক্ষ লক্ষ টাকা!

লাইফস্টাইলে আমূল পরিবর্তন হল। সেরা ব্র্যান্ডের পোশাক-আশাক গায়ে উঠতে লাগল রোজ। নিজের কুর্তা-পাজামা অর্ডার দিয়ে বানাতে শুরু করল কলকাতার সেরা ডিজাইনারদের দিয়ে। সঙ্গে যোগ হল যথেচ্ছ নারীসংসর্গের অভ্যেস, যেটা আগে ছিল না। প্রচুর টাকার বিনিময়ে টলিউড এমনকী বলিউডের নায়িকাদের সঙ্গে সময় কাটানো যায় কিনা, সেই খোঁজ করার জন্য মোটা টাকা দিয়ে এজেন্ট লাগিয়েছিল। বড়াই করে বন্ধুদের বলত, 'আমার পড়াশুনো হয়নি বলে তোরা ঠাট্টা করিস... তোরা তো কেউ বারো ক্লাস, কেউ গ্র্যাজুয়েট, পারবি টপ হিরোইনের সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে সময় কাটাতে?'

দুই মেয়ে ছিল শ্যামলের। যাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসত। মেয়েদের ভর্তি করেছিল কলকাতার অভিজাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। বলত, 'আমার তো বাওয়াল করেই লাইফটা খরচা হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েগুলো ইংলিশে কথা বলবে, ফরেন যাবে পড়তে, মিলিয়ে নিবি।' পাশাপাশি আক্ষেপও করত, 'মেয়েদুটোর তো বিয়ে হয়ে যাবে। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। আমার টাকাপয়সা আর ব্যবসার দেখভাল কে করবে? একটা যদি ছেলে থাকত!' ছেলের আশাতেই শ্যামল দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। মিতালি নামের এক তরুণীকে। তবে প্রথম স্ত্রী তাপসীর সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরেনি বিশেষ।

BanglaBook.org

চিড় বরং ধরেছিল শ্যামল-রমেশের সমীকরণে। নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু-র মতবিরোধে গ্যাংয়ের মধ্যে চাপা টেনশন জন্ম নিচ্ছিল। শ্যামলের মনোভাব ছিল, অনেক তো হল। এবার পুরো ফোকাসটা সিন্ডিকেট ব্যবসায় দেওয়া যাক। 'চমকানো-ধমকানো'র মেশিনারি তো আছেই, থাকবেও। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আর নিজেরা সরাসরি ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই। এমনিতেই পুলিশের অনেক কেসে নাম ঝুলছে। আর বাড়িয়ে কী লাভ? বরং বুদ্ধিমানের কাজ হল, একটা আপাত-ভদ্র 'ইমেজ' তৈরি করা। যাতে পরের বার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে দাঁড়ানো যায়। রাজনীতির একটা মোড়ক থাকলে কিছুটা সুবিধে তো পাওয়াই যায়।

রমেশ সহমত ছিল না এই গাঁধীগিরির তত্ত্বে। বরং বক্তব্য ছিল, সিন্ডিকেট আছে, থাকুক। যেমন চলছে চলুক। কিন্তু প্রোমোটিংয়ের কাজে যে কোনও সময় বাজারে মন্দা আসতেই পারে। তাই সিন্ডিকেটের পাশাপাশি হাওড়া-হুগলিতে লোহার ছাঁটের ব্যবসাটাও চালানো উচিত সমান তালে। তোলাবাজির পরিধিও আরও বাড়ানো দরকার। আর সেটা করতে হলে নিয়মিত 'অ্যাকশন' করতে হবে। এবং নিজেদেরও মাঝেমধ্যে সামনে থাকতে হবে। না হলে গ্যাং বা ব্যবসা, দুটোর উপর থেকেই নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা হবে ক্রমশ। কারণ, দুটোই যথেষ্ট বেড়েছে কলেবরে। এখন হঠাৎ করে পুরোপুরি 'ভদ্রলোক' সেজে গিয়ে লাভ নেই। আর রাজনীতিতে যোগ দিলেই তো আর একঝটকায় অতীত কীর্তি সব মুছে যাবে না। পুলিশও পিছু ছাড়বে না।

পিছু ছাড়ার প্রশ্নই ছিল না। সেই যে '৯১-এ শ্যামল ধরা পড়েছিল মুঘলসরাইয়ে জিআরপি-র হাতে, তারপর আর ধরা যায়নি। দীর্ঘ ব্যর্থতায় হতাশা আসেই। শ্যামলের ক্ষেত্রেও হতাশা বারবার গ্রাস করেছিল পুলিশকে। চেষ্টা কিন্তু তা বলে থেমে থাকেনি। জেলা পুলিশ এবং সিআইডি, দু'তরফেই। সিআইডি-র 'মনিটরিং সেলে' বিশেষ টিম তৈরি হয়েছিল শ্যামলের 'ট্র্যাকিংয়ে'। পুলিশ যে হাল ছাড়েনি, শ্যামল জানত বিলক্ষণ। তাই চালিয়ে যেত অহরহ সিম বদলানোর খেলা। নির্দিষ্টভাবে হদিশ পাওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হত পুলিশের পক্ষে। তবু লেগে থাকতে হত। কথা আছে না, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তদন্তের ক্ষেত্রে অন্য। ধৈর্যের জয় সর্বত্র। সবুর করা এবং মেওয়া ফলার অপেক্ষায় থাকো।

সরাসরি খুনখারাপিতে ২০০২-০৩-এর পর থেকে আর জড়াতে চাইত না শ্যামল। জড়াতে বাধ্য হল ২০০৫-এর ডিসেম্বরে। একটা সাইটের প্রজেক্ট প্ল্যান নিয়ে শ্যামলের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছিল না প্রোমোটারের। উপরমহলে কিছু যোগাযোগ ছিল এই প্রোমোটারের। অন্যায় দাবির কাছে অন্যদের মতো গলবস্ত্র হয়ে নতজানু হওয়া দূরে থাক, উলটে শ্যামলের লোকদের শাসিয়েছিলেন, 'তোদের দাদাকে বলে দিস, যা ইচ্ছে ডিমান্ড করবে আর আমি মেনে নেব, সেটা হবে না। চমকে লাভ নেই। তেমন হলে ফেলে রাখব জমিটা। প্রজেক্ট হবে না।'

একেবারে সরাসরি বিদ্রোহ খোদ হুব্বা শ্যামলের বিরুদ্ধে! পালটা চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেওয়া একরকম— 'যা পারিস করে নে... তোর জোরজুলুম মানব না।' মস্তানি আর তোলাবাজির

BanglaBook.org

দুনিয়ায় সবচেয়ে জরুরি বিনিয়োগ হল 'ভয়'। 'ভয়' পেয়েই অন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া। 'ভয়' পেয়েই নিঃশর্ত নতিস্বীকার। 'ভয়'-এর চাষ করেই মুনাফার ফসল তোলা। তা সেই 'ভয়'-ই যদি চলে যায়, যদি কেউ শ্যামলকে চোখ রাঙিয়েও পার পেয়ে যায়, তা হলে শ্যামলের অস্তিত্বই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্রোহের নিশান তোলার মাশুল দিতে হল ওই প্রোমোটারকে। শ্যামল নিজে অ্যাকশনে নামল। ২০০৫-এর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রজেক্টের সাইট ম্যানেজারকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মারল। এবং প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যে প্রোমোটারের পুরো ফ্যামিলি উজাড় করে দেওয়ার।

এই হুমকিটা যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, সত্যিই যে হাওড়া-নিবাসী প্রোমোটারের বাড়িতে ভয়ানক কোনও অ্যাকশনের প্ল্যান করছে শ্যামল, তার আঁচ পেল সিআইডি-র মনিটরিং সেল। কল-ইন্টারসেপশনে ধরা পড়ল শ্যামলের সঙ্গে এক সহযোগীর মিনিটদেড়েকের কথোপকথন। শ্যামলকে বলতে শোনা গেল, 'শালার বড্ড পুড়কি হয়েছে! দ্যাখ না কী করি! এক হপ্তার মধ্যে বাড়ির হাফ থেকে ফুল হাওয়া করে দেব পুরো।' বাড়ির 'হাফ থেকে ফুল'? এটা 'ডিকোড' করা কোনও সমস্যা নয়। 'হাফ থেকে ফুল', অর্থাৎ ছোট থেকে বড়, সবাইকে মেরে দেওয়ার প্ল্যান করছে!

একটা খুন হয়ে যাওয়ার পর তদন্তে নেমে অপরাধীকে খুঁজে বের করা এক জিনিস। রুটিন কাজ। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এক বা একাধিক খুন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, এটা জেনে যাওয়ার পর খুনগুলোকে প্রতিহত করা আরেক। রুটিন নয়। ঢের বেশি কঠিন, ঢের বেশি উদ্বেগের।

জরুরি বৈঠকে বসলেন ডিআইজি, সিআইডি (অপারেশনস), 'ক্রাইম ওয়ার্ক'-এ যাঁর তর্কাতীত দক্ষতা শুধু রাজ্যে নয়, দেশের পুলিশ মহলেও বহুচর্চিত। শ্যামলের মোবাইলের তিনটে সিমের কথা জানা ছিল অফিসারদের। কিন্তু আগে যেমন লিখেছি, কখন কোনটা অ্যাকটিভ থাকবে, কখন কোনটা ব্যবহার করবে, সেটা আন্দাজ করা ছিল শিবের অসাধ্য। কোনটা হয়তো সকাল ন'টায় চালু হল। সোয়া ন'টায় খুচরো দুটো ফোনের পর বন্ধ সারাদিনের জন্য। কোনটা আবার সারাদিন খোলা, কিন্তু অ্যাকটিভিটি নেই! কোনওটায় ফোন এলে শ্যামল নয়, তুলছে অন্য কেউ। পাশ থেকে হয়তো শ্যামলের গলা শোনা যাচ্ছে। টাওয়ার লোকেশন (টিএল) বদলাচ্ছে দিনে কম করে হলেও পাঁচবার। কখনও বেলুড়, কখনও বালি, কখনও ব্যান্ডেল, কখনও শ্রীরামপুর, কখনও আবার মধ্য কলকাতা। কোনও কোনওদিন আবার তিনটে ফোনই সারাদিন বন্ধ। কিন্তু মোবাইল ছাড়া কাটাচ্ছে কী করে? হতেই পারে, চতুর্থ কোনও সিমও আছে, যা অজানা এখনও পর্যন্ত।

চারটে কাজ করার আছে আপাতত। সোর্সদের নতুন করে অ্যাকটিভেট করা। এসপি হুগলিকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা। এসপি হাওড়াকে বলে ওই প্রোমোটারের বাড়ির আশেপাশে সাদা পোশাকের নজরদারির ব্যবস্থা করা। এবং শ্যামলের যে নম্বরগুলো জানা আছে, সেগুলো 'রাউন্ড দ্য ক্লক' মনিটর করা।

২১ ডিসেম্বরের বিকেলে 'কল মনিটরিং সেল' থেকে ফোন এল ডিআইজি-র কাছে।

BanglaBook.org

—স্যার, একটা দেড় মিনিটের কনভার্সেশন হল মিনিটদশেক আগে।

—কী?

—বলছে, কাল বাগুইআটি যাবে। বলল, 'পাগলি' ফিট করে রাখিস...

—কখন যাবে বলেছে?

—বলল, সেকেন্ড হাফে।

—এখন টিএল ?

—বেলুড়।

—যার সঙ্গে কথা হল, তার সাবস্ক্রাইবার ডিটেলস নিয়েছ?

—ইয়েস স্যার। তন্ময় বলে একজনের নাম দেখাচ্ছে। অ্যাড্রেস গুপ্তিপাড়া।

—নম্বরটা ট্র্যাক করেছ?

—হ্যাঁ স্যার, কনভার্সেশনের সময়ের লোকেশন ব্যান্ডেল। ওই ফোনটার পরেই সুইচড অফ। ট্র্যাক রাখছি স্যার।

—গুপ্তিপাড়ার ঠিকানাটা টেক্সট করো। রাইট নাউ।

গুপ্তিপাড়ার ওই ঠিকানায় যে তন্ময় বলে কেউ থাকে না, সেটা এসপি হুগলি খোঁজখবর নিয়ে ডিআইজি-কে জানিয়ে দিলেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। ভুল নাম দিয়ে, ভুল ঠিকানা দিয়ে সিমটা নেওয়া হয়েছে। ফোন আবার চালু হওয়া অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

দেড় মিনিটের কথা-চালাচালি থেকে কী জানা যাচ্ছে? আগামীকাল বাগুইআটি যেতে পারে। বলছে, সেকেন্ড হাফে যাবে। মানে, বিকেলে, সন্ধে বা রাতে। 'পাগলি' ফিট করে রাখতে বলেছে। এটাও অপরাধ দুনিয়ার ভাষা। 'পাগলি' অর্থাৎ মহিলা। যা দাঁড়াচ্ছে, কোনও মহিলার সঙ্গে নিভৃতে সময় কাটানোর জন্য কাল বাগুইআটি যেতে পারে। অবশ্য শ্যামলের যা মারাত্মক ধূর্ত স্বভাব, কে বলতে পারে, 'বাগুইআটি'-ও হয়তো কোডনেম! আসলে হয়তো যাবে অন্য কোথাও। ফোনে ইচ্ছে করে 'মিসলিড' করছে। যদি তা-ও হয়, ইনপুট যেখানে কয়েকদিনের মধ্যে একাধিক খুনের, চান্স নিতেই হবে। ধরে নিতে হবে, বাগুইআটিই।

বাছাই করা কিছু সোর্সকে জরুরি তলব করা হল সন্ধেতেই। কথা হল বিস্তারিত। কেষ্টপুর আর বাগুইআটির মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঠেকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এক প্রোমোটারের বাড়ি। গত বছর একটা সময় শ্যামলের নিয়মিত যাতায়াত ছিল এখানে। ফুর্তিটুর্তি হত রাতবিরেতে। বাগুইআটি যদি হয়, এখানেই যাওয়ার সম্ভাবনা নিরানব্বই শতাংশ।

বাড়িটা 'আইডেন্টিফাই' করা যাবে? সোর্সের উত্তর ইতিবাচক। ঠিক হল, সকাল থেকে শুরু হবে 'অপারেশন শ্যামল'। ভোরের দিকেই সোর্সকে নিয়ে একটা টহল দেখে আসবে ফ্ল্যাটটা। সাদা পোশাকের ফোর্স কীভাবে ছড়িয়ে থাকবে চারপাশে, সেই 'ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যান' করে রাখতে হবে।

'অপারেশন' কাল। কিন্তু রাত থেকেই 'টাওয়ার লোকেশন' মিনিটে মিনিটে মনিটর করতে

BanglaBook.org

হবে। ফিল্ডে চারটে টিম থাকবে সকাল থেকে। নেতৃত্বে থাকবেন ডিআইজি (অপারেশনস) স্বয়ং। সঙ্গে থাকবেন সিআইডি-র স্পেশ্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ। যিনি এসএস(সিআইডি) বলে পরিচিত রাজ্য পুলিশে। একটা টিম থাকবে উল্টোডাঙায়। একটা কেষ্টপুরে। বাগুইআটিতে স্ট্যাটিক টিম একটা। ডিআইজি থাকবেন এয়ারপোর্টের কাছে। দুটো গাড়ি নিয়ে। শ্যামলের ফোনের টিএল যেমন যেমন জানা যাবে, সেভাবে 'মুভ' করবে ফিল্ডে থাকা ইউনিট। মনিটরিং সেল প্রতি দশ মিনিট অন্তর যাদের জানাতে থাকবে শ্যামলের ফোন-অবস্থান।

২২ ডিসেম্বর, ২০০৫। সকাল থেকে শ্যামলের তিনটে সিমই বন্ধ। একটা চালু হল সোয়া দশটা নাগাদ। যাতে একটা ফোন এল সাড়ে দশটার সামান্য পরে। বালি এলাকার কোনও এক প্রোমোটারের ফোন। নিছক কাজের কথাই হল। সিমেন্ট-বালির ডেলিভারি সংক্রান্ত। ফোনটা অবশ্য শ্যামল ধরল না। ধরল অন্য একজন। যে ফোনের অন্য প্রান্তে থাকা প্রোমোটারকে শুরুতেই বলল, 'দাদাকে এখন দেওয়া যাবে না। ঘুমচ্ছে। যা বলার আমাকে বলুন।' পাশ থেকে একটা জড়ানো গলা শোনা গেল, 'কার ফোন রে?' এতদিনের ট্র্যাকিংয়ের অভিজ্ঞতায় গলাটা মনিটরিং সেলের সবার চেনা। শ্যামল।

টাওয়ার লোকেশন? ডানলপ সংলগ্ন এলাকা। সঙ্গে সঙ্গে সোর্সদের চট করে বাজিয়ে নেওয়া হল একবার। ডানলপ এলাকায় কোনও নতুন ডেরার সন্ধান জানা আছে? কোনও নতুন কাজে হাত দিয়েছে ওই অঞ্চলে? যতটুকু জানা গেল, মাসছয়েক আগে সিঁথিতে একটা সাইটে কিছু টাকা ঢেলেছিল শ্যামল। তখন যাওয়া-আসা ছিল মাসে দু'-একবার। কিন্তু 'ঠেক' বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছুর খোঁজ নেই।

একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই আপাতত। শ্যামল এখন ডানলপ এলাকায় আছে। বাকি দুটো ফোন অবশ্য এখনও বন্ধ। টাওয়ারের অবস্থান 'স্ট্যাটিক' থাকল দুপুর প্রায় দুটো অবধি। সেই সাড়ে দশটার পর থেকে ফোন এসেছে তিনটে। কথোপকথনে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ব্যবসাপাতির ফোন। যার মধ্যে শেষ ফোনটা শ্যামল নিজেই ধরেছে। এবং ছাড়ার আগে বলেছে, 'পরে কথা হবে, এখন বেরচ্ছি একটু।'

বেরল যে, সেটা বোঝা গেল আড়াইটের পর, যখন 'টাওয়ার লোকেশন' বদলাতে শুরু করল ফোনের। বেলঘরিয়া পেরিয়ে বরানগর। বরানগর পেরিয়ে টালা । ফোনের বদলাতে থাকা অবস্থান বুঝিয়ে দিল, হুব্বা শ্যামল এখন দক্ষিণমুখী। নাকি ভুল ভাবা হচ্ছে? শ্যামল আদৌ নয়, শ্যামলের কোনও সঙ্গী? ধন্দের কারণ, ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে দ্বিতীয় ফোনটা, যার অবস্থান দেখাচ্ছে ডানলপ সেক্টর। দুটো ফোনের কোনওটাতেই কথোপকথন হচ্ছে না কিছু।

দুটো সম্ভাবনা। এক, শ্যামল এখনও ডানলপ এলাকাতেই কোথাও আছে। দ্বিতীয় সিমটা ব্যবহার করছে। কোনও সঙ্গীর কাছে এখন প্রথম চালু হওয়া ফোনটা আছে, যে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে। দুই, শ্যামল ডানলপ থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রথম ফোনটা নিয়ে। এবং নর্থ টু

BanglaBook.org

সাউথ যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় সিমটা ব্যবহার করছে কোনও সঙ্গী, যে তখনও ডানলপেই রয়েছে। বেরয়নি শ্যামলের সঙ্গে।

বিভ্রান্তি দূর হল সোয়া তিনটে নাগাদ। যখন দ্বিতীয় ফোনের সিমও স্থিতাবস্থা কাটিয়ে বদলাতে শুরু করল পজিশন। এবং দক্ষিণে নয়, টিএল ক্রমে সরতে থাকল দক্ষিণেশ্বর পেরিয়ে বালির দিকে। দ্বিতীয় ফোনে একটা ইনকামিং কল এল। ফোনটা ধরে যে হ্যালো বলল, সে শ্যামল নয়। এ সেই লোক, যে সকালের ফোনে বলেছিল, 'দাদা এখন ঘুমচ্ছে।' যিনি ফোন করেছেন, তিনি বললেন, 'শ্যামলের সঙ্গে কথা ছিল।' উত্তর এল, 'দাদা একটু ব্যস্ত এখন। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলিয়ে দেব।' ফোনটা ডিসকানেক্ট হওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই দ্বিতীয় ফোন থেকে প্রথম ফোনে কল গেল।

—দাদা, 'পার্টি'-র ফোন ছিল, কথা বলতে চায়।

—পরশু সাইটে আসতে বল বারোটা নাগাদ।

ধন্দের জায়গা নেই আর। শ্যামল প্রথম ফোনটা ব্যবহার করছে। যে ফোনের টিএল জানাচ্ছে, শ্যামলের অবস্থান এখন মধ্যমগ্রামের কাছাকাছি। গত মিনিট পনেরো ধরে স্ট্যাটিক। বাগুইআটিতে থাকা টিমকে অ্যালার্ট করা হল।

মধ্যমগ্রামের কাছাকাছি কোথায় আছে? স্ট্যাটিক আছে কেন পনেরো মিনিট? গাড়িতে তেল ভরছে? কোনও ঠেক আছে ওই এরিয়ায়? নাকি লাঞ্চ করছে কোনও রেস্তোরাঁ বা বাবায়? ডিআইজি নিজে এসএস সিআইডি-র সঙ্গে ছিলেন এয়ারপোর্টের কাছাকাছি। পিছনের গাড়িতে ছিলেন ইনস্পেকটর হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও তিনজন অফিসার।

দুটো গাড়ি এয়ারপোর্ট থেকে মধ্যমগ্রাম অবধি চক্কর দিল পরের আধঘণ্টা। পেট্রল পাম্পগুলো দেখা হল। ঢুঁ মারা হল যশোর রোডের বিখ্যাত ধাবা 'শের-ই-পাঞ্জাব'-এও। যদি ভাগ্য ভাল হয়, যদি বাই চান্স চোখে পড়ে যায়। পড়ল না চোখে।

গাড়ির নম্বর জানা নেই। কী ধরনের গাড়িতে আছে, জানা নেই। সম্ভাব্য গন্তব্য সম্পর্কে একটা আন্দাজ আছে মাত্র। শুধু 'টাওয়ার লোকেশন' ফলো করে শ্যামলের মতো অত্যন্ত ধূর্ত ক্রিমিনালকে ধরা যে প্রায় দুঃসাধ্যের পর্যায়ে পড়ে, বেশ বুঝতে পারছিলেন ডিআইজি এবং তাঁর টিমের সদস্যরা। বাগুইআটির ওই ফ্ল্যাটে যদি আজ সত্যিই যায়, ধরা যাবে নিশ্চিত। কিন্তু যদি না যায়? এভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ফোনের অবস্থান 'ফলো' করে করে সম্ভব কখনও?

সোয়া চারটে নাগাদ ফের বদলাতে শুরু করল ফোন-গতিবিধি। মাইকেলনগর পেরিয়ে ঢুকল এয়ারপোর্ট সেক্টরে। এবার কি তা হলে বাগুইআটির ফ্ল্যাট? কিন্তু এটা কী হল? ভিআইপি রোড ধরে উত্তরের দিকে যেতে যেতে 'টাওয়ার লোকেশন' হঠাৎই পূর্বমুখী। রাজারহাটের দিকে যাচ্ছে। সোজা ভিআইপি রোড না ধরে রাজারহাটের ভিতর দিয়ে বাগুইআটি যাবে? ডিআইজি-র গাড়িও ঢুকল রাজারহাটের রাস্তায়। হল্ট করল চিনার পার্কের কাছাকাছি।

বাগুইআটির ধারেকাছেও যে আপাতত যাওয়ার পরিকল্পনা নেই শ্যামলের, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ফোন-অবস্থান জানিয়ে দিল, শ্যামল রাজারহাট-নিউটাউনের রাস্তা ধরে যাচ্ছে সল্টলেকের দিকে। এ তো মহা মুশকিল হল। বাগুইআটিতে যাওয়াটা ঝুঁকির হয়ে যাবে আজ, কোনওভাবে আন্দাজ করেছে? দুপুর-বিকেল-সন্ধে-রাত, কোনও না কোনও সময় বাগুইআটিতে আসবে, এই ধারণা নিয়েই 'অপারেশন'-টা প্ল্যান করা। অথচ সন্ধে হয়ে এল, ওদিকে যাওয়ার কোনও নামগন্ধ নেই।

সিআইডি-র গাড়ি যখন সল্টলেকের দিকে এগোচ্ছে, স্পেশ্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিজ্ঞেস করেই ফেললেন ডিআইজি-কে, 'স্যার, এভাবে আর কতক্ষণ? শ্যামল যা সেয়ানা জিনিস, হয়তো কোনও হিন্ট পেয়েছে কোথাও থেকে। তাই বাগুইআটির দিকটা মাড়াচ্ছেই না।'

—আর ঘণ্টাখানেক দেখব। তারপর ব্যাক। ধরো যদি বাগুইআটিতে রাতের দিকে যায়, টিম তো থাকছেই।

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের কাছে যখন গাড়ি থামালেন ডিআইজি, তখন ঘড়িতে সোয়া পাঁচটা। শ্যামলের ফোনের টিএল সল্টলেকে স্ট্যাটিক পাঁচটা থেকে। ঠিক পৌনে ছ'টায় একটা ইনকামিং কল এল শ্যামলের মোবাইলে। ফোনটা ধরল শ্যামলই।। ধরেই 'পরে করিস' বলে কেটে দিল ফোনটা। ফোনের অন্যদিকে যে-ই থাকুক, সুযোগই পেল না কিছু বলার।

সাড়ে ছ'টা বাজতে চলল। টিএল বদলাচ্ছে না। প্রায় দেড়ঘণ্ট. হয়ে গেল সল্টলেকেই থিতু। কোথায় আছে? এখানে কোনও ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে, যেমন করে থাকে মাঝেমধ্যে? যে মহিলার সঙ্গে সময় কাটানোর কথা বাগুইআটিতে, তাঁকে কোনওভাবে খবর পাঠিয়েছে সেই ফ্ল্যাটে আসতে? ফোনটা যেরকম অধৈর্যভাবে রেখে দিল, তাতে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, যেখানেই থাকুক, যা-ই করুক এখন, কোনও ডিস্টার্বেন্স চাইছে না।

কোথায় থাকতে পারে... কোথায় থাকতে পারে... ভাবতে ভাবতেই আচমকা একটা 'ব্রেনওয়েভ' ঝটকা দিল হিমাদ্রিকে। দেড়ঘণ্টা নট নড়নচড়ন, ফোন এলে কেটে দিচ্ছে... ফ্ল্যাট ছাড়া অন্য জায়গাও তো হতে পারে। সিটি সেন্টার তো বেশি দূরে নয়। তা হলে কি...? উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেন না হিমাদ্রি, 'স্যার, লোকেশন স্ট্যাটিক এতক্ষণ, সিনেমা দেখছে না তো?'

ডিআইজি চকিতে তাকান হিমাদ্রির দিকে। মুখ খোলেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর, 'পসিবল, কোয়ায়েট পসিবল। হতেই পারে। আর যদি না-ও হয়, ট্রাই নিতে ক্ষতি নেই। লেটস গিভ ইট আ শট।'

দুটো গাড়ি মিনিট তিনেকের মধ্যে ব্রেক কষল সিটি সেন্টারের ক্রসিং থেকে সামান্য দূরে। হিমাদ্রি এবং আরেকজন অফিসার পায়ে হেঁটে এগোলেন সিটি সেন্টারের দিকে। এবং যা জানার ছিল, জেনে নিয়ে ফিরে এলেন মিনিটদশেকের মধ্যে।

BanglaBook.org

তিনটে শো শুরু হয়েছে পাঁচটার আশেপাশে। একটা বাংলা ছবি। ঘরোয়া, পারিবারিক। ইংরেজি ছবিও চলছে একটা। পোস্টার দেখে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, সায়েন্স ফিকশন জাতীয়। তিন নম্বর ছবিটা হিন্দি। নাম 'KALYUG'। পোস্টারের ছবিই বলে দিচ্ছে, নাচগান-মারদাঙ্গা এবং সেক্সের ভরপুর সুড়সুড়ি সংবলিত বলিউডি মশলা ছবি। শ্যামল যদি সিনেমা দেখতে এসেই থাকে, ঘরোয়া পারিবারিক বা কল্পবিজ্ঞানের ছবি দেখে নিশ্চয়ই সময় 'নষ্ট' করছে না। দেখলে নির্ঘাত ওই 'কলিযুগ'-ই দেখছে!

—শো শেষ হবে ক'টায়?

—স্যার, হিন্দি ছবিটার ডিউরেশন দেখলাম দুই ঘণ্টা ছয় মিনিট। শুরু হয়েছে পাঁচটা দশে। অ্যাড-ট্যাড আর ইন্টারভ্যাল মিলিয়ে আরও পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরুন। সাড়ে সাতটার আশেপাশে 'কলিযুগ'-এর শো ভাঙবে। তার একটু আগে ইংরেজি ছবিটা শেষ হবে। আর বাংলাটা শেষ হবে ওই হিন্দিটার কাছাকাছি সময়েই। এখন পৌনে সাতটা। কিছুটা সময় আছে হাতে।

ডিআইজি ছক কষে নেন দ্রুত। যদি আইনক্সেই থাকে, আন-আর্মড অবস্থায় আছে। মাল্টিপ্লেক্সের সিনেমাহলে একটা দেশলাইকাঠিও অ্যালাও হয় না। আর যে ছবিই দেখুক না কেন, দোতলার হল থেকে বেরিয়ে নীচে নামার একটাই সিঁড়ি। ঠিক হল, সিঁড়ির শেষ ধাপের মুখে থাকবেন ডিআইজি স্বয়ং, এসএস সিআইডি, হিমাদ্রি এবং আরও দু'জন অফিসার। আরেকটা টিম থাকবে সিটি সেন্টারের মেন এন্ট্রির ঠিক বাইরে। যারা গাড়িতে অপেক্ষা করবে, ওয়ারলেসে কল পেলে দৌড়ে আসবে, যদি প্রয়োজন হয়। সোয়া সাতটার মধ্যে 'টেক পোস্ট', অর্থাৎ প্ল্যানমাফিক নিজের নিজের পজিশন নিয়ে নেওয়া।

শেষ মুহূর্তের ব্রিফিং সেরে নিলেন ডিআইজি, 'যদি পালানোর চেষ্টা করে, কেউ ফায়ার করবে না। জানি, প্রাইজ ক্যাচ, কিন্তু ফায়ারিং আন্ডার নো সার্কামস্ট্যান্সেস... আই রিপিট... আন্ডার নো সার্কামস্ট্যান্সেস... ভিড়ের মধ্যে পাবলিকের কোনও ইনজুরি হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে...।'

আর আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই বড়দিন। সান্টা ক্লজের লাল-সাদা কাটআউটে ভরে গেছে সিটি সেন্টার চত্বর। ভিড়ে ভিড়াক্কার শপিং মলে খুশির ফুলকি উড়ছে।

আইনক্সের ইভনিং শো ভেঙেছে। লোকজন নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। ওইভাবে সার দিয়ে নেমে আসা এত লোকের মাঝে একটা নির্দিষ্ট লোককে খুঁজে বের করা মুশকিল। মুখগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলোচ্ছিলেন হিমাদ্রি আর ডিআইজি।

মাঝবয়সি, বেঁটে, গাট্টাগোট্টা চেহারার জনাদশেক লোক নেমেছে গত দু'-তিন মিনিটে। যাদের দেখে সন্দেহ করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি, যাদের মুখের সঙ্গে ন্যূনতম মিলও নেই শ্যামলের। লোক নেমে আসছে ননস্টপ। নামছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। মিশে যাচ্ছে ভিড়ে। একটা অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের গ্রুপ ওই নামছে হইহই করতে করতে। ওদের ঠিক পিছনের ধাপে দাঁড়ানো বেঁটে লোকটার উপর চোখ আটকে যায় হিমাদ্রির। বেঁটে... স্বাস্থ্যবান... কালো

BanglaBook.org

ফুলস্লিভ শার্ট...মাথায় টুপি। টুপিটা অনেকটা নামানো বলে মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। লোকটার পাশেপাশেই নেমে আসছে লম্বা চেহারার আরেকজন। এর মাথাতেও টুপি।

বেঁটে লোকটা সিঁড়ির শেষ ধাপে প্রায়। সোর্সরা যা বলে শ্যামলের ইদানীংকার চেহারার ব্যাপারে, তার সঙ্গে তো অনেকটাই মিলছে। একটু মোটা। ফোলাফোলা মুখ। কিন্তু সোর্সরা তো এটাও বলে যে শ্যামলের পুরুষ্টু গোঁফ আছে। এর তো গোঁফ নেই। তা হলে?

শিয়োর হওয়া যাচ্ছে না। কী করবেন এখন? সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন হিমাদ্রি। লোকটা মাটিতে পা রাখামাত্র হিমাদ্রি একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠেন, 'কী শ্যামলদা, ভাল আছেন?' সঙ্গে সঙ্গে টুপি-পরা বেঁটে লোকটা রিফ্লেক্স অ্যাকশনে মুখ ফেরায়, 'কে?' পাশে থাকা ছিপছিপে লোকটাও থমকে যায় হঠাৎ।

ব্যস, ওই 'কে'-টাই যথেষ্ট ছিল। ডিআইজি সিআইডি নিমেষে হাত চেপে ধরেছেন লোকটার। হিমাদ্রি একটানে মাথা থেকে খুলে নিয়েছেন টুপি। চেহারা পরিষ্কার এবার। গোঁফ থাকুক না থাকুক, এ শ্যামল। প্রায় দেড় দশক ধরে পুলিশকে নাকের জলে-চোখের জলে করে দেওয়া হুব্বা শ্যামল। সঙ্গীটিও অচেনা নয়। বাপি, বেনারসি বাপি। 'কলিযুগ' দেখেই বেরচ্ছিল।

ওয়ারলেসে 'কল' পেয়ে চটজলদি দৌড়ে এসেছে বাইরে থাকা টিম । ডিআইজি পিস্তল ঠেকিয়ে দিয়েছেন শ্যামলের গলায়। হিমাদ্রিও কোমরে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্র বার করে সোজা তাক করেছেন বাপির দিকে। কলার ধরে টানতে টানতে যখন দু'জনকে বাইরে নিয়ে আসছে সিআইডি-র টিম, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সিটি সেন্টারে। কী ঘটছে এটা? সিঁড়ি থেকে নামার পর দুটো লোককে ঘিরে ধরল কয়েকজন। তারপর রিভলভার ঠেকিয়ে ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলছে। চোখের সামনে কিডন্যাপিং? শ্যামল আর তার সঙ্গীকে তুলে দুটো গাড়ি যখন বেরিয়ে যাচ্ছে হুউশ, ততক্ষণে হইচই শুনে ছুটে এসেছেন সিকিউরিটি ম্যানেজার। মোবাইলে ডায়াল করছেন বিধাননগর (দক্ষিণ) থানার নম্বর।

'কিডন্যাপিং'-এর বার্তা পেয়ে থানার টহলদারি গাড়ি এসে পৌঁছনোর আগেই ডিআইজি ফোন করে জানিয়ে দিলেন উত্তর ২৪ পরগনার এসপি-কে, 'উই হ্যাভ জাস্ট পিকড আপ হুব্বা শ্যামল ফ্রম সিটি সেন্টার। ওখানে একটু প্যানিক হতে পারে, দেখে নাও তাড়াতাড়ি।' এসপি সঙ্গে সঙ্গেই ফোনে জানালেন ওসি বিধাননগর (দক্ষিণ)-কে। আতঙ্কের পরিবেশ কাটাতে সিটি সেন্টারের 'পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম' থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোষণা শুরু হল, 'অযথা আতঙ্কিত হবেন না। কোনও কিডন্যাপিং এখানে হয়নি। সিআইডি রেইড করে দু'জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গেছে।'

দ্রুত খবর ছড়াল, 'সল্টলেকে সিনেমা দেখতে এসে সিআইডি-র জালে হুগলির ত্রাস হুব্বা শ্যামল।' পরের দিন সব কাগজে প্রথম পাতায় জায়গা পেল 'অপারেশন হুব্বা'। ইন্ডিয়ান

BanglaBook.org

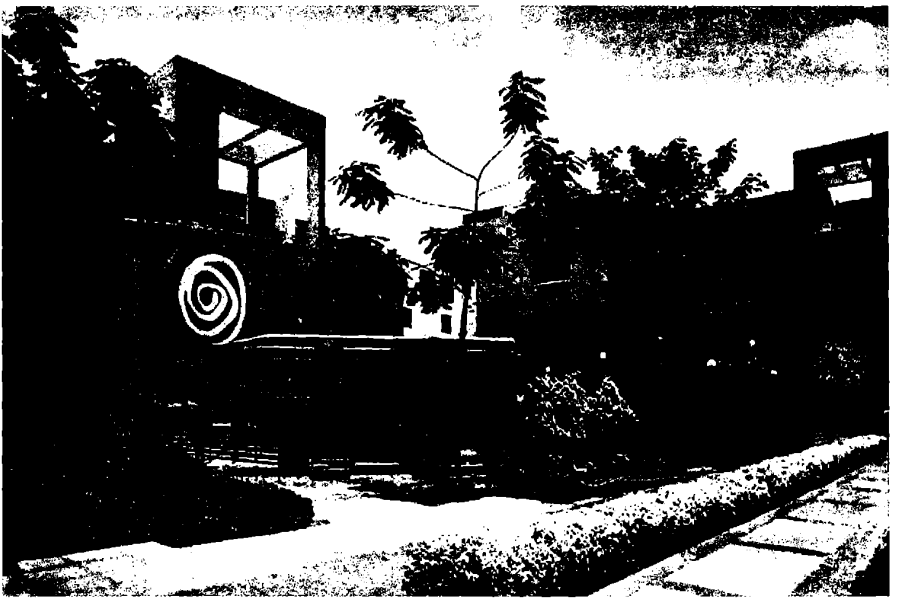

সল্টলেকের সিটি সেন্টার-১, যেখান থেকে ধরা পড়েছিল শ্যামল

এক্সপ্রেস-এর কলকাতা সংস্করণে শ্যামল-গ্রেফতারের খবরের হেডিংটা তুলে দেওয়ার লোভ সামলানো কঠিন, ' "Dawood Ibrahim of Hooghly" arrested by CID'.

পুরনো মামলা অনেক ঝুলছিল শ্যামলের নামে। তবু এক বছরের বেশি দীর্ঘস্থায়ী হল না শ্যামলের কারাবাস। জামিনে বেরিয়ে গেল। কী করে? বেশিরভাগই ছিল খুনের মামলা। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আর থাকলেও কারও ঘাড়ে মাথা ছিল না শ্যামলের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মুখ খোলার। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে কিছু সাক্ষী তবু জোগাড় করা গিয়েছিল কয়েকটা মামলায়। চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল শ্যামলকে 'ফেরার' দেখিয়ে। কিন্তু বিচারপর্ব যখন শুরু হল, সাক্ষীরা 'hostile' হয়ে গেল। পুলিশের কাছে দেওয়া আগের বয়ান অস্বীকার করল (আইনি পরিভাষায় বিরূপ সাক্ষ্যদান)। কেন করল, অনুমেয় অনায়াসে। 'হুব্বা শ্যামল'— এই পাঁচ অক্ষরের রোষে পড়ার ভয়ে। কে আর সাধ করে হাঁড়িকাঠে মাথা দিতে চায়? শ্যামল না হয় ধরা পড়েছে। কিন্তু গ্যাংয়ের বাকিরা তো বাইরে আছে। কেউ 'দাদা'-র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সাহস দেখিয়েছে জানলে ছেড়ে দেবে তারা?

কোনও মামলায় 'বিরূপ সাক্ষ্য, কোনওটায় সাক্ষীরই অভাব, আবার কোনওটায় 'শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া' (Test Identification Parade)-য় অভিযুক্তকে চিনতে সাক্ষীর অস্বীকার করা। দোষী সাব্যস্ত করা দুরূহ হচ্ছিল ক্রমশ। নামীদামি আইনজীবীদের পিছনে শ্যামল টাকাও খরচ করছিল দেদার। পুলিশের ব্যর্থতাই, আটকে রাখা গেল না বেশিদিন। জামিনে মুক্ত হয়ে ফের হুগলির

BanglaBook.org

মাটিতে পা রাখল শ্যামল। টিমের ছেলেদের বলল, 'ভালই হল। একেবারে ফ্রেশ হয়ে এলাম। এবার বাওয়াল কম, ব্যবসা বেশি।'

কী বেশি, কী কম, সেটা পরের ব্যাপার। তারও আগে শ্যামল আবিষ্কার করল, জেলে থাকার এই এক বছরে ব্যবসার অঙ্ক বদলে গেছে অনেক। শ্যামলের অনুপস্থিতির সুযোগে সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নিজের দখলে নিয়ে ফেলেছে রমেশ। শ্যামল লক্ষ করছিল, বছরখানেক আগেও টিমের যারা 'শ্যামলদা' অন্ত প্রাণ ছিল, তাদের অনেকেই জার্সিবদল করেছে। যাদের কাছে এখন রমেশই শেষ কথা।

গ্যাং ভাগ হয়ে যায়নি। শ্যামল-রমেশ কাজ করছিল একসঙ্গেই। কিন্তু কোথাও একটা তাল কেটে গিয়েছিল। ২০০৭-১০, এই সময়টায় সম্পর্কের ফাটল নানা মতবিরোধে ক্রমশ আরও চওড়া হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদটাই যা হয়নি। তবে মনকষাকষি যতই হোক, শ্যামলের একটা ন্যূনতম বিশ্বাসের জায়গা অটুট ছিল রমেশের প্রতি। বলত, 'এখনও যদি বলি, এই প্রজেক্টটায় হাত দেওয়া ঠিক হবে না, রমেশ মেনে নেবে। অমত থাকলেও মেনে নেবে। মুখের উপর না বলার হিম্মত হবে না।'

এই 'বিশ্বাস'-টাই কাল হয়েছিল শ্যামলের। সময়টা ২০১১-র জুন। শ্রীরামপুরের কাছে একটা জমি দেখতে গিয়েছিল শ্যামল-রমেশ। জমি জরিপের পর্ব মিটে যাওয়ার পর রমেশ বলেছিল শ্যামলকে, 'দুপুরের খাওয়াটা আমার ওখানে খেয়ে যা।' রিষড়ার দাসপাড়ায় রমেশের ফ্ল্যাট ছিল একটা। রমেশেরই গাড়িতে চড়ে দু'জনে রওনা দেয় দাসপাড়ায়। শ্যামলের সঙ্গীরা বলেছিল, 'দাদা, আমরাও যাই সঙ্গে?'

নিজের বিপদ-আপদ সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকা শ্যামল সেদিন আত্মঘাতী আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে ফেলেছিল। বারণ করেছিল সঙ্গীদের, 'ধুর, যাচ্ছি তো রমেশের বাড়িতে। তোরা চলে যা। কী আর হবে? ম্যাক্সিমাম মেরে দেবে।' তারপর বহু বছরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী রমেশের দিকে তাকিয়ে চোখ মেরেছিল। ইয়ারকির ঢংয়ে বলেছিল, 'কী রে রমেশ, মেরে দিবি নাকি একা পেয়ে?' উত্তরে রমেশও হেসে উঠেছিল হো হো করে। বলেছিল, 'হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম মেরে দেব। কী আর হবে?'

কী যে হবে, সেটার আঁচ রমেশের ফ্ল্যাটে পা রাখা মাত্রই পেয়েছিল শ্যামল। একসময়ের বিশ্বস্ততম সঙ্গীরা হাতে ছুরি-পিস্তল নিয়ে বসে। নেপু, জিতেন্দর, চিকুয়া... আরও কয়েকজন। শ্যামল ঢুকতেই যারা নিমেষের মধ্যে ঘিরে নিয়েছিল। কোমরে যে নাইন এমএম-টা গোঁজা থাকত সবসময়, সেটা ছোঁয়ারই সুযোগ পায়নি শ্যামল। রমেশ বলেছিল, 'দাখ শ্যামল, যে ভাবে চলছে, একসঙ্গে ব্যবসা চালানো আর সম্ভব নয়। আলাদা হয়ে গেলে হয় তুই আমাকে ফুটিয়ে দিবি, নয়তো আমি তোকে খালাস করে দেব। তাই ভাবলাম...' বাক্যটা শেষ করেনি রমেশ। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পাঁচটা শব্দ খরচ করেছিল নেপুর উদ্দেশে, 'আমি বেরলাম... তোরা দেখে নে।'

BanglaBook.org

নির্দেশ পালন করেছিল নেপু-জিতেন্দররা। 'দেখে নিয়েছিল', যা দেখার। তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর বৈদ্যবাটি খালে ভেসে উঠেছিল হুব্বা শ্যামলের দেহ।

শ্যামলের যদি বিচার হত আদালতে, দোষী সাব্যস্ত হলে কী হতে পারত সম্ভাব্য পরিণতি? যাবজ্জীবন কারাবাস বা ফাঁসি। টাকার তো অভাব ছিল না। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতই। উচ্চ থেকে উচ্চতর কোর্ট অবধি গড়াত মামলা। গড়িয়ে যেত বছরের পর বছর।

সব অন্যায়ের শাস্তিবিধান বাস্তবের আদালতে নির্ধারিত হয় না। কিছু অপরাধের, কিছু অপরাধীর বিচার হয় হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট পেরিয়ে 'সর্বোচ্চ' আদালতে। কর্মফলের হিসেবনিকেশ সুদে-আসলে মিটিয়ে দেওয়া হয় সেখানে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিভাইন জাস্টিস'। হুব্বা শ্যামলের মৃত্যু যেমন। বৈদ্যবাটি খাল থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছিল, লিখেছি। কী অবস্থায় উদ্ধার, বলা হয়নি। বডির কাঁধ থেকে কোমর, আড়াআড়ি চেরা ছিল ধারালো অস্ত্রের টানে।

পৈতে করে দিয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হাতে মাত্র ৯৬ ঘণ্টা

—একটা জিনিস বোঝো। এটা পার্সোনাল ইগোর ব্যাপার নয়। আমি জানি, তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছ। কিন্তু এটাও তো বুঝতে হবে যে গভর্নমেন্ট কেসটা নিয়ে প্রেশারে আছে। অলমোস্ট সেভেন্টি টু আওয়ার্স হয়ে গেল মার্ডারটার পর। স্টিল ক্লুলেস!

—কিন্তু স্যার...উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট...

—বললাম তো...আই নো দ্যাট, বাট ইয়োর বেস্ট মে নট অলওয়েজ বি গুড এনাফ। যা বলছি শোনো। আমাকে এটা নিয়ে কথা শুনতে হচ্ছে। খুব বেশি অপেক্ষা করা যাবে না আর। তুমি পরিষ্কার করে বলো আর কতদিন লাগতে পারে?

—এধরনের কেসে তো ওইভাবে টাইমলাইন বলা মুশকিল স্যার।

—টু... কিন্তু ওই যে বললাম, আর খুব বেশি সময় দিতে পারব না। ম্যাক্সিমাম চার-পাঁচ দিন... তার মধ্যে হল তো হল... না হলে সিআইডি উইল টেক ওভার।

—রাইট স্যার।

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর মেজাজটা তেতো হয়ে যায় এসপি-র। এই ভয়টাই পাচ্ছিলেন গত রাত্রে। মিডিয়া যা হইচই শুরু করেছে, কেসটা সিআইডি-কে না দিয়ে দেয়। সাতসকালে মোবাইলে খোদ ডিজি-র নম্বর ভেসে উঠতেই প্রমাদ গনেছিলেন। এবং যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হল। সময় বেঁধে দেওয়া হল। পারলে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সল্‌ভ করো। না হলে ছেড়ে দাও। সিআইডি দেখবে।

লালবাজারের যেমন ডিডি, অর্থাৎ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তেমন সিআইডি (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)। কোনও জটিল কেস যদি দ্রুত সমাধান করতে ব্যর্থ হয় থানা, কলকাতায় সেটা অবধারিত চলে যায় ডিডি-র হাতে। কখনও কখনও ঘটনা ঘটার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। আর রাজ্য পুলিশের এলাকায় হলে একই ভাবে জেলা পুলিশের কেসের তদন্তের দায়িত্ব পড়ে সিআইডি-র উপর। স্বাভাবিক এবং প্রচলিত প্রথা। থানার হাজারটা কাজ থাকে। কেসের তদন্ত তার মধ্যে একটা। কিন্তু ডিডি বা সিআইডি-র মূল কাজই হল ঘোরালো মামলার তদন্ত। ডিজি যেমন বললেন, পার্সোনাল ইগোর ব্যাপার নেই এখানে।

BanglaBook.org

ভুল। কে বলল নেই? ইগোর ব্যাপার আছে। সে কলকাতা পুলিশ হোক বা রাজ্য, একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যাপার থাকেই থানা বনাম ডিডি বা সিআইডি-র। যাদের কাছে কোনও কেস চলে গেলে থানার মনে হয়ই, আমরা পারলাম না, তাই ওদের দিল। সূক্ষ্মভাবে হলেও এই 'আমরা-ওরা'-টা আছেই।

এসপি-রও ঠিক সেটাই মনে হয় ডিজি-র সঙ্গে মিনিটখানেকের ফোনটা শেষ হওয়ার পর। তিনদিনেও পারিনি যখন, ধরে নেওয়া হচ্ছে, 'আমরা' পারব না। 'ওরা' পারবে।

সিনেমায় হলে কী হত এসব ক্ষেত্রে? পুলিশ অফিসারকে চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেওয়া হত কেসের কিনারার জন্য। এবং 'কী হইতে কী হইয়া' যেত, অলৌকিক দক্ষতায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই ঠিক ধরে ফেলত পুলিশ।

এটা সিনেমা নয়। এসপি ভাবতে থাকেন, হাতে চার-পাঁচ দিন মাত্র সময়। তার মধ্যে হবে আদৌ? সবে তিনদিন হয়েছে। হ্যাঁ, বলার মতো কোনও 'লিড' নেই এখনও। কিন্তু মরিয়া চেষ্টা চলছে দিনরাত। ডিজি সাহেব ঠান্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু আজ ফোনে যথেষ্ট অধৈর্য শোনাচ্ছিল। ওঁর দিক থেকেও ভাবার চেষ্টা করেন পুলিশ সুপার। এই দু'দিনেই যা লেখালেখি আর প্রচার হচ্ছে কেসটা নিয়ে, রাজ্যের পুলিশপ্রধান হিসেবে নিশ্চয়ই প্রবল চাপে আছেন। সিআইডি-কে কেসটা দিলেই যে কোনও জাদুদণ্ডে দু'দিনের মধ্যে কিনারা হয়ে যাবে মামলার, এমনটা ডিজি-ও নিশ্চয়ই আশা করেন না। কিন্তু সিআইডি-র মতো 'স্পেশ্যালাইজড ইনভেস্টিগেটিং ইউনিট'-কে দায়িত্ব দিলে চাপমুক্তি হয় সাময়িক। সরকার কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ঘটনাটা, সেটা প্রমাণিত হয়। জনসমক্ষে বার্তা যায় একটা।

ডিজি বললেন, চার-পাঁচ দিন। অঙ্কের হিসেবে কত? ৯৬ থেকে ১২০ ঘণ্টা। বেশ্যা তা-ই সই। আরেকবার মিস্টার গুপ্তার বাড়ি যাওয়া দরকার। আজই। এবং এখনই। বলে রাখা দরকার ওসি আর এসডিপিও (সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার)-কে। ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুমের নম্বর ডায়াল করেন পুলিশ সুপার, 'এসপি বলছি...।'

বারাসতের এসপি বাংলো থেকে গাড়ি রওনা দিল সকাল সাড়ে আটটায়। গন্তব্য, বাগুইআটি। গাড়ি যখন মধ্যমগ্রাম পেরচ্ছে, পুলিশ সুপার ফ্ল্যাশব্যাকে গুছিয়ে নেন ঘটনাক্রম। গত দু'দিন ধরে কেসটা নিজে মনিটর করছেন। মাথায় গেঁথে আছে সব। কিন্তু তাতে আর লাভ কী হবে? ডিজি-র কথাটা কানে বেজেই চলেছে, 'সিআইডি উইল টেক ওভার।'

১১ ফেব্রুয়ারির সাতসকালে ঘোলা থানায় ফোনে খবরটা এসেছিল। উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়া মহকুমার এই থানাটা খুব বেশিদিন হল তৈরি হয়নি। কয়েক বছর আগে খড়দা

BanglaBook.org

থানা ভেঙে এই ঘোলা থানার পত্তন।

কারণও ছিল নতুন থানা তৈরির। আয়তনের নিরিখে একটা বিশাল এলাকা ছিল খড়দা থানার অন্তর্গত। বিটি রোডের দু'ধারের ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা তো ছিলই। সঙ্গে ছিল সোদপুর-পানিহাটি মোড় থেকে পূর্বদিকে চলে যাওয়া রাস্তাটাও। ঘোলা হয়ে বারাসতমুখী যে রাস্তার সংলগ্ন ছিল বিলকান্দা-তালবান্দা-নিউ ব্যারাকপুরের বিস্তৃত অঞ্চল। যেখানে বেআইনি মদের ভাটির রমরমা, মস্তানদের দাপাদাপি, খুনজখম-মারামারি ব্যস্তসমস্ত রাখত খড়দা থানাকে। মূলত আইনশৃঙ্খলাজনিত সুবিধার্থেই খড়দাকে দ্বিখণ্ডিত করে ঘোলাকে দেওয়া হয়েছিল নতুন থানার মর্যাদা।

ঘোলা থানার ডিউটি অফিসারকে সোয়া ছ'টা নাগাদ যিনি ফোনটা করেছিলেন, তিনি উদ্বিগ্ন গলায় শুধু এটুকু বলেছিলেন, 'মুড়াগাছা থেকে বলছি। এখানে পুকুরপাড়ে একটা বড় বস্তা পড়ে আছে। নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। মনে হচ্ছে বস্তায় মুড়ে কেউ কিছু ফেলে রেখে গেছে। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে বস্তাটা থেকে। থানা থেকে কেউ এলে ভাল হয়। এখানে লোক জমে গেছে।'

লোক যে সত্যিই জমেছে বিস্তর, মুড়াগাছায় গিয়ে টের পেলেন ঘোলা থানার অফিসাররা। থানা থেকে বেশি দূরে নয় মুড়াগাছা। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই। হঠাৎ চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটার আভাসে-ইঙ্গিতে যেমন হয় আধা-শহর আধা-গ্রামীণ এলাকায়, পুকুরের ধারে ভিড়-জমানো কৌতূহলী মুখগুলোয় চাপা উত্তেজনা। পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে! কী আছে ওই বস্তায়, জানা যাবে এবার।

জানার পর উত্তেজনা বদলে গেল আতঙ্কে। বস্তা থেকে বেরল হাফহাতা গোলাপি রঙের শার্ট আর কালো ট্রাউজার পরিহিত এক পুরুষের লাশ। দেখে মনে হয়, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সর্বাঙ্গ নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। গলাতেও দড়ির প্যাঁচ। ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে চোখ। শ্বাসরোধ করে খুন। মুখটা থেঁতলে গেছে ভোঁতা কিছুর আঘাতে। পোশাকের অনেকটা লাল হয়ে গেছে রক্তে। বুকের উপর পড়ে আছে লাল রঙের একটা ব্লাউজ। আর একটা রুমাল। ছোট, ত্রিকোণ। মহিলারা সাধারণত যেমন ব্যবহার করেন।

খুনটা যে এই পুকুরপাড়ে হয়নি, হয়েছে অন্য কোথাও, এবং খুনি বা খুনিরা বডিটা বস্তাবন্দি করে এখানে ফেলে গেছে, সেটা বুঝতে গোয়েন্দা হওয়ার দরকার হয় না। কে বা কারা করেছে, খুনটা আদতে হয়েছে কবে-কোথায়-কখন, মৃতের পরিচয়ই বা কী, সেসব পরে ভাবার। প্রাথমিক কাজগুলো আগে সারল ঘোলা থানার পুলিশ। দেহের ছবি তোলা, বডি তুলে থানায় নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া এবং ঘটনাটা থানার বড়বাবুকে জানানো।

মৃত অজ্ঞাতপরিচয় থাকলেন না বেশিক্ষণ। হাতে ঘড়ি বা আংটি ছিল না। হয় পরেননি, নয় যে বা যারা খুনটা করেছে, সে বা তারা খুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু ট্রাউজারের পিছনের পকেটে রাখা মানিব্যাগটা নিয়ে যায়নি। টাকাপয়সা ছিল না ওতে, বা থাকলেও নিয়ে গেছে খুনি বা খুনিরা।

BanglaBook.org

রাকেশ গুপ্তা

ব্যাগে শুধু পড়ে ছিল ভিজিটিং কার্ডটা। যা জানিয়ে দিল নিহতের পরিচয়।

রাকেশ গুপ্তা, কোম্পানি সেক্রেটারি। নিউটাউনের এক নামি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। মোবাইল নম্বর আর মেইল আইডি দেওয়া আছে কার্ডে। দ্রুত যোগাযোগ করা হল ওই কোম্পানির অফিসে। পাওয়া গেল বাড়ির ঠিকানা। ল্যান্ডলাইন নম্বর।

বাগুইআটির ভিআইপি এনক্লেভ-এর বাসিন্দা ছিলেন রাকেশ। ভিআইপি রোড ধরে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে রাস্তার উপরেই পুরনো এবং পরিচিত আবাসন। খবর দেওয়া হল বাড়িতে। ঘোলা থানায় ছুটে এলেন রাকেশের আত্মীয়-বন্ধুরা। এলেন অফিসের সহকর্মীরাও। দেহ শনাক্ত হল। দায়ের হল খুন এবং প্রমাণ লোপাটের মামলা। ঘোলা থানা। কেস নম্বর ২০, তারিখ ১১/২/২০০৮। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায়।

খবর পাওয়ামাত্র ওসি আর অ্যাডিশনাল ওসি তো বটেই, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে থানায় চলে এসেছিলেন এসডিপিও বেলঘরিয়া, অ্যাডিশনাল এসপি, ব্যারাকপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার স্বয়ং। খুঁটিয়ে দেখেছিলেন বডি।

পোস্টমর্টেমে দ্রুত পাঠানো হয়েছিল দেহ। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাক্তার কী লিখবেন, জানাই ছিল। 'Death due to asphyxia caused by ligature strangulation...।' যেটা জানা ঢের বেশি জরুরি ছিল, সেটা খুনের সম্ভাব্য সময়। ডাক্তার বললেন, রাকেশের মৃত্যু ঘটেছে দেহ আবিষ্কারের অন্তত চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ, খুনটা সম্ভবত হয়েছে আগের দিন, মানে ১০ ফেব্রুয়ারির দুপুর থেকে সন্ধের মধ্যে।

সাধারণ বুদ্ধিতে এটা বোঝাই যাচ্ছিল, এই খুনে এক নয়, একাধিকের যুক্ত থাকার সম্ভাবনা নিরানব্বই শতাংশ। বছর চল্লিশের রাকেশ যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ছিলেন। তাঁকে এভাবে মেরে দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তাবন্দি করে ফেলে আসা সম্ভব কোনও একজনের পক্ষে? তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নেওয়া গেল, খুনটা একজনই করেছে। এবং সে যথেষ্ট শক্তিশালী। তা হলেও খুনের পরে লাশ সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করতে আরও এক বা একাধিকের সাহায্য লেগেছিল নিশ্চিত।

পুলিশ সুপার যখন সহকর্মী অফিসারদের নিয়ে পৌঁছলেন বাগুইআটির ভিআইপি এনক্লেভে

BanglaBook.org

বাগুইআটির সেই আবাসন

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। টিভি মারফত খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে ততক্ষণে। আবাসিকরা ভিড় জমিয়েছেন রাকেশের একতলার ফ্ল্যাটের সামনে। গেটের বাইরে কৌতূহলী জটলা দানা বাঁধছে ক্রমশ। প্রেসের গাড়ি এসে থামছে একে একে।

ছিমছাম টু-বেডরুম ফ্ল্যাট। সচ্ছলতার যতটা ছাপ আছে ঘরে, বৈভবের ততটা নয়। রাকেশ গুপ্তা এই ফ্ল্যাটে থাকতেন সাত বছর হল। স্ত্রী কবিতা এবং আট বছরের মেয়ে দিয়াকে নিয়ে। কবিতা এখন সন্তানসম্ভবা। দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাব্য জন্মক্ষণ মাস তিনেকের মধ্যেই। রাকেশের বাবা বেঁচে নেই। মা আছেন। এই আবাসনেই পাশের ব্লকের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। রাকেশরা দুই ভাই-বোন। বোন দীপিকার বিয়ে হয়েছে হায়দরাবাদে।

ফ্ল্যাটটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নেহাতই মাঝারি সাইজের। তার মধ্যেই পাড়াপ্রতিবেশী-আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের থিকথিকে ভিড়। যে ভিড়টা পুলিশ ঢুকতেই রাতারাতি আরও বেড়ে গেল কিছুটা। ওই ভিড়ভাট্টা আর কান্নাকাটির মধ্যে রাকেশের স্ত্রী-র সঙ্গে তাই দা কথা বলার সুযোগই ছিল না। তা ছাড়া স্বামীর এভাবে খুন হওয়ার খবর পেয়েছেন সবে কয়েক ঘণ্টা হল। এখন পুলিশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় থাকবেন, আশা করাটাই অমানবিক। এসপি ঠিক

BanglaBook.org

করলেন, শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পর রাতের দিকে এসে কথা বলবেন। প্রাথমিক তথ্যগুলো বরং জেনে নেওয়া যাক আত্মীয়দের থেকে।

প্রাথমিক তথ্য বলতে? ১০ ফেব্রুয়ারি রবিবার ছিল। অফিস যাওয়ার কোনও ব্যাপার ছিল না রাকেশের। দুপুর সোয়া একটা নাগাদ ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছিলেন মা-কে এয়ারপোর্টে ছেড়ে আসতে। মা সপ্তাহখানেকের জন্য হায়দরাবাদ যাচ্ছিলেন মেয়ের কাছে। দুপুর দুটোর একটু পরে স্ত্রী-র মোবাইলে ফোন করে রাকেশ জানান, 'আমার কিছু কাজ আছে। ফিরতে একটু দেরি হবে।'

আর বাড়ি ফেরেননি রাকেশ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, সন্ধে গড়িয়ে রাত আটটা বেজে যাওয়ার পর উদ্বিগ্ন কবিতা ফোন করেছিলেন রাকেশকে। ফোন 'সুইচড অফ' ছিল। কবিতা আতঙ্কিত হয়ে যোগাযোগ করেছিলেন আত্মীয়দের সঙ্গে, রাকেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে। রাকেশের দুই খুড়তুতো ভাই বাগুইআটি ফাঁড়িতে রাতেই 'মিসিং ডায়েরি' করেছিলেন। যে 'মিসিং ডায়েরি' মূল্যহীন হয়ে যায় পরের দিন মুড়াগাছায় রাকেশের দেহ উদ্ধারের পর। প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া গেল আরও কিছু। রাকেশ ডানহাতে ঘড়ি পরতেন। গলায় থাকত রুপোর চেন। ডানহাতে আংটি পরতেন দুটো। চোখে চশমা উঠেছিল কলেজে পড়ার সময়েই। অথচ উদ্ধার হওয়া দেহে চশমা-ঘড়ি-চেন-আংটি, কিছুই নেই।

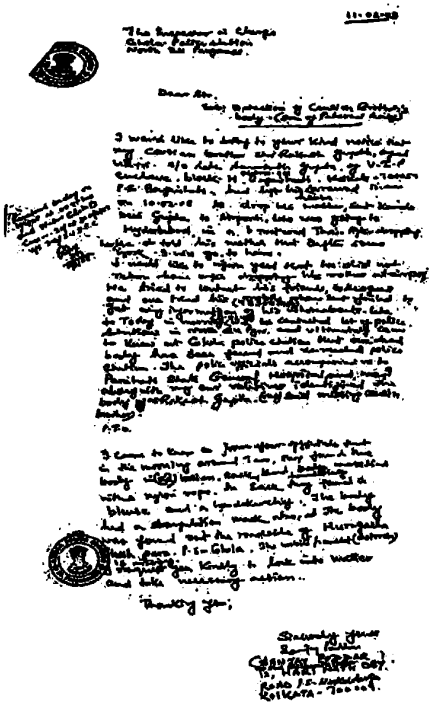

এফআইআর-এর প্রতিলিপি

বারাসতের অফিসে ফিরে পুলিশ সুপার এই মামলার তদন্তে গঠন করলেন একটা 'কোর টিম'। যাতে থাকলেন এই কেসের তদন্তকারী অফিসার সাব-ইনস্পেকটর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ঘোলা থানার অ্যাডিশনাল ওসি সমীর ভট্টাচার্য, ওসি তপনকুমার বিশ্বাস, নিউ ব্যারাকপুর ফাঁড়ির সাব-ইনস্পেকটর সুবীর চক্রবর্তী, জগদ্দল থানার ওসি সুবীর চ্যাটার্জি এবং জেলার বাছাই করা চারজন সাব-ইনস্পেকটর, 'ক্রাইম ওয়ার্ক'-এ যাঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ঠিক হল, এই টিমের কাজকর্মের তদারকিতে থাকবেন অ্যাডিশনাল এসপি, ব্যারাকপুর। যাঁকে সাহায্য করবেন এসডিপিও ব্যারাকপুর

BanglaBook.org

আর এসডিপিও বেলঘরিয়া। সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে পুলিশ সুপার স্বয়ং, যিনি প্রতি সন্ধেয় বসবেন টিমের সঙ্গে। দৈনিক সান্ধ্য-বৈঠকে কাটাছেঁড়া করা হবে তদন্তের অগ্রগতি।

কীভাবে এগোনো হবে, সেটা ছকে নেওয়া হল। তৈরি হল আশু করণীয়ের তালিকা। কে কোনটা করবে, ভাগ করে দেওয়া হল দায়িত্ব।

এক, রাকেশের মোবাইলের সিডিআর (কল ডিটেলস রেকর্ড) অবিলম্বে জোগাড় করা। এবং অন্তত গত এক মাসের রেকর্ড চেক করা। দিন ধরে ধরে। অফিস এবং বাড়ির লোকজন ছাড়া বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কাদের সঙ্গে তুলনায় বেশি যোগাযোগ ছিল, জানতে হবে। তৈরি করতে হবে 'ফ্রিকোয়েন্ট কলার্স'-দের লিস্ট। ঘটনার দিন এয়ারপোর্টে মা-কে ছেড়ে বেরনোর পর স্ত্রী-কে ফোন করেছিলেন। সেই ফোনের কতক্ষণ পর থেকে মোবাইল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? বন্ধ হওয়ার মুহূর্তের 'টাওয়ার লোকেশন'? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী খুনটা হয়েছে রবিবার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে। প্রকাশ্যে কেউ দিনের বেলায় খুন করে না এভাবে। খুনটা নিশ্চিতভাবে কোনও ঘরের মধ্যে হয়েছে এবং রাতের অন্ধকারে বডি পাচার করা হয়েছে খুনের জায়গা থেকে মুড়াগাছায়। কোন এলাকায় খুন? টাওয়ার লোকেশন থেকে একটা আভাস অন্তত পাওয়া যেতে পারে।

দুই, রাকেশের পেশাগত জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাই। একেবারে খুঁটিনাটি পর্যায়ে। অফিসে ওঁর ঊর্ধ্বতন, অধস্তন... সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। জানতে হবে, কোনও গোলমাল চলছিল কিনা অফিসে? কোনও পেশাগত চাপে ছিলেন? থাকলে কী বা কেমন সেই চাপ? অফিসে কোনও সহকর্মিণীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল? এমন ঘনিষ্ঠতা কোনও, যা নিয়ে অফিসে গসিপ, আড়ালে-আবডালে আলোচনা ?

তিন, তথ্য চাই ব্যক্তি রাকেশ সম্পর্কেও। এত জিনিস থাকতে মৃতদেহের উপর লাল ব্লাউজ় কেন? লেডিজ় রুমাল কেন? কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাকেশ? যা কারও বা কাদের তুমুল ক্রোধ বা ঈর্ষার কারণ হয়েছিল? সেই থেকে খুন? পাড়াপ্রতিবেশী আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে রাকেশের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে যতটা সম্ভব খবর নিতে হবে। কোনও তথ্যই ফেলে দেওয়ার নয়, তদন্তের এই গোড়ার শর্তটা মাথায় রেখে।

চার, এত জায়গা থাকতে মুড়াগাছার পুকুরপাড়ে বডি ফেলে আসা কেন? জায়গাটা আগে থেকে ঠিক করা ছিল? সম্ভবত তাই। এবং যদি তা-ই হয়, তা হলে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের এক বা একাধিকের জড়িত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। যার বা যাদের এলাকার ভূগোল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। সুতরাং ঘোলা-খড়দা-টিটাগড়-ব্যারাকপুর—স্থানীয় সমস্ত দাগি দুষ্কৃতীর গত আটচল্লিশ ঘণ্টার গতিবিধি সম্পর্কে খবর চাই। এমন পুরনো পাপী কেউ আছে, যাকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না গতকাল থেকে? যার যেখানে যা সোর্স রয়েছে, পত্রপাঠ মাঠে নামাতে হবে।

পাঁচ, যথাসম্ভব দ্রুত 'ডিটেকশন' চাই। বারো ঘণ্টাও হয়নি বডি উদ্ধার হয়েছে, এর মধ্যেই

BanglaBook.org

মার্ডারটা নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। সেটা যে আরও বাড়বে তাড়াতাড়ি কিনারা না হলে, সেটা আন্দাজ করার জন্য কোনও পুরস্কার নেই।

হইচই যে এর মধ্যেই বেড়েছে অনেকটাই, সেটা এসপি টের পেলেন রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ফের বাগুইআটি গিয়ে। যখন ঢুকছেন, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের একডজন 'বুম' নিমেষে ধেয়ে এল মুখের দিকে। পাশ কাটিয়ে ঢুকলেন কোনওমতে। ফ্ল্যাটে তখনও লোকভরতি। ময়নাতদন্ত-পর্ব চুকতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে সন্ধেয়। রাকেশের মা এবং বোন পরেরদিন সকালেই ফ্লাইট ধরে হায়দরাবাদ থেকে ফিরে আসছেন কলকাতায়।

মিসেস গুপ্তার সঙ্গে আধঘণ্টা একান্তে কথা বলা গেল বিস্তর অনুরোধ-উপরোধের পর। মহিলা নিশ্চুপ বসেছিলেন বিছানায়। প্রাথমিক সমবেদনা জানানোর পর যা কিছু প্রশ্ন করলেন এসপি, হয় মাথা হেলিয়ে, নয় দু'-একটা শব্দে উত্তর দিলেন কবিতা। কাউকে সন্দেহ হয়?—না। রাকেশের কোনও শত্রু ছিল?—না। এবং শেষ পর্যন্ত যাবতীয় দ্বিধা কাটিয়ে, 'আপনাদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল?'একটাই শব্দ খরচ করলেন সদ্য স্বামীহারা মহিলা, 'ভাল।'

এসপি খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন মিসেস গুপ্তাকে। শোকের নানারকম চেহারা হয়। হয় উদ্বেল, নয় সংযত, অথবা দুটোর মাঝামাঝি। বা অন্য কোনও প্রকাশ। শোক তো শোকই। নির্দিষ্ট বিশেষণে বাঁধা যায় কখনও?

যদি যেত, মিসেস গুপ্তাকে 'সংযত'-র গোত্রে ফেলা যেত দ্বিধাহীন। বাহ্যত অন্তত শোকতাপের আকুলতা নেই তেমন। অবশ্য 'শোকে পাথর হয়ে যাওয়া' বলেও তো কথা আছে বাংলায়। ভিতরের উথালপাথাল বাইরে আসে না সবার। আধঘণ্টার বাক্যালাপের পর তবু মনে হয় এসপি-র, ভদ্রমহিলাকে একটু যেন বেশিই নিরুত্তাপ লাগছে। নাকি ভুল ভাবছেন? মহিলা শোকে পাথর হয়ে গেছেন এবং বাহ্যিক প্রকাশটা তাই উচ্চকিত নয়?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ভিআইপি এনক্লেভ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময়ও ফের হামলে পড়ল মিডিয়া। বক্তব্য চাই এসপি-র। 'তদন্ত সবে শুরু হয়েছে, সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে' জাতীয় একটা গতানুগতিক 'কোট' দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন পুলিশ সুপার।

নামকরা বাণিজ্যিক সংস্থার পদস্থ কর্তার নৃশংস খুন। বস্তাবন্দি অবস্থায় দড়ি-বাঁধা দেহ উদ্ধার। দেহের উপর ব্লাউজ এবং মহিলাদের ব্যবহার করা রুমাল। এটা তেমন খবর নয়, প্রথম দু'-এক দিন হইচইয়ের পর যা স্বাভাবিক গতিতে চলে যাবে প্রথম পাতা থেকে ভিতরের পাতায়। প্রাইম টাইম থেকে সরে যাবে চ্যানেলের আর পাঁচটা খবরের ভিড়ে। এই খুনে রহস্য আর জল্পনা হাঁটছে হাত-ধরাধরি করে। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মিডিয়ার অণুবীক্ষণের নীচে থাকবেই পুলিশের প্রতিটি নড়াচড়া, খুনের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে হাজার তত্ত্ব উড়তে থাকবে হাওয়ায়।

ঠিক এখানেই চ্যালেঞ্জ বর্তমান প্রজন্মের তদন্তকারীদের। মিডিয়ার গোয়েন্দাগিরি সামলে

BanglaBook.org

নিজেদের গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাওয়া। শুধু তদন্ত করা এবং কেসের সমাধানই যথেষ্ট নয়। কী লাইনে তদন্ত এগোচ্ছে, তার আঁচ যাতে মিডিয়া না পায়, কাগজে পড়ে বা চ্যানেলে দেখে যাতে সাবধান না হয়ে যায় সম্ভাব্য অপরাধীরা, সেটাও নিশ্চিত করা। কাজটা যে আজকের যুগে কী প্রাণান্তকর কঠিন, সেটা তদন্তকারী অফিসার মাত্রেই জানেন।

সোমবারে তৈরি 'করণীয়'-র তালিকার কতটা কী এগোল, খতিয়ে দেখতে 'কোর টিম'-এর সঙ্গে মঙ্গলবার সান্ধ্য-মিটিংয়ে বসলেন এসপি।

রাকেশের সিডিআর বলছে, মোবাইল বন্ধ করেছিলেন তিনটে সতেরো মিনিটে। তখন টাওয়ার লোকেশন ছিল বিমানবন্দর থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে মাইকেলনগরের কাছে। স্ত্রী-কে ফোন করেছিলেন দুটো দশে, বলেছিলেন, ফিরতে দেরি হবে। তার ঘণ্টাখানেক পর থেকে ফোন বন্ধ। নিজেই সুইচ অফ করেছিলেন? না কি অন্য কেউ বাধ্য করেছিল? আগে থেকে কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল? জিজ্ঞাসাচিহ্ন একাধিক। উত্তর এখনও অধরা।

রাকেশের গত এক মাসের কল ডিটেলস থেকে এমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, যা তদন্তে নির্দিষ্ট দিশা দেখাতে পারে। বন্ধুবান্ধব যাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের অধিকাংশেরই 'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক' হয়ে গেছে প্রাথমিক। দেখা হয়েছে সবার রবি-সোমের টাওয়ার লোকেশন। সন্দেহ করার মতো কিছু? নাহ! রাকেশের শনি-রবির ফোন-তালিকা দেখা হয়েছে বিশেষ মনোযোগে। কিন্তু সবই রুটিন ফোন, অফিস-বাড়ি-বন্ধু। এসএমএস-ও রুটিনের পর্যায়েই।

বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ দু'জনের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের সঙ্গে প্রায় রোজই ফোন বা মেসেজ-চালাচালি হত রাকেশের। অরুণ কাটিয়াল আর সঞ্জীব সুরেকা। অরুণ থাকেন লেকটাউনে, সঞ্জীব দমদমে। দু'জনেই রাকেশের বহুদিনের বন্ধু সেই কলেজজীবন থেকে। দু'জনেই দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন থানায়। ছিলেন শেষকৃত্য পর্যন্ত। অরুণ-সঞ্জীব দু'জনেরই সুখী দাম্পত্য জীবন। পারিবারিক কোনও জটিলতার আভাস মেলেনি এখনও পর্যন্ত। খোঁজখবর অব্যাহত আছে।

সঞ্জীবের থেকে মাসখানেক আগে রাজারহাট এলাকায় একটা ফ্ল্যাট বুক করার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ধার করেছিলেন রাকেশ। ওই অ্যাডভান্স বুকিং গত মাসে বাতিল করে টাকা তুলে নিয়েছিলেন। তবে সঞ্জীবকে এখনও ধারের টাকা ফেরত দেননি। অনেকদিনের বন্ধু, রাকেশকে তাগাদাও দেননি সঞ্জীব। রাকেশ বন্ধুকে বলেছিলেন, ফ্ল্যাট নয়, ভাল জমির খোঁজে আছেন। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত কোনও ঝামেলায় ফেঁসে গেছিলেন কি না, জানা যায়নি এখনও। আরও খোঁজ নেওয়া দরকার। রাকেশ আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছলই ছিলেন। মাসে মাইনে পেতেন পঁয়ষট্টি হাজারের কাছাকাছি। ধার-টার যদি কিছু থেকেও থাকে, সেটা শোধ করাটা গুরুতর সমস্যা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম।

অফিসে কোনও ঝামেলা? যতটুকু খোঁজখবর করা গেছে আপাতত, সেখানেও কোনও

BanglaBook.org

'লিড' নেই। এই কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন বছরখানেক হল। অমায়িক ব্যবহারের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন সহকর্মীদের মধ্যে। পরিশ্রমী এবং দক্ষ আধিকারিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন কোম্পানিতে।

কর্মক্ষেত্রে কোনও মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের আভাস? মহিলা কর্মী অনেকেই আছেন সংস্থায়। রাকেশের পেশাগত সংস্রব ছিল মূলত পিএ অরুণিমার সঙ্গে। অরুণিমা সপ্রতিভ, সুন্দরী, কথাবার্তায় চৌকস। কিন্তু নানাভাবে খোঁজ নিয়েও রাকেশের সঙ্গে অরুণিমার কাজ-বহির্ভূত কোনও সম্পর্কের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনও সহকর্মীর সঙ্গেও না। অন্তত এখনও পর্যন্ত।

রাকেশের অফিসের ডেস্কটপটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। অফিসিয়াল ল্যাপটপও শনিবার রেখে গিয়েছিলেন অফিসে। দুটোই পাঠানো হয়েছিল প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞদের কাছে। যদি 'ডিলিট' করে দেওয়া কোনও ফাইল-ফোল্ডারের খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় আর? 'হার্ড ডিস্ক' ঘাঁটাঘাঁটি করেও কিচ্ছু পাওয়া যায়নি বলার মতো।

পাড়া-প্রতিবেশী? আবাসনের বাসিন্দারা? ওঁরা কী বলছেন, কী ভাবছেন? এখনও অনেকের সঙ্গে কথা বলা বাকি। তবে নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলা হয়েছে, সবাই একটা ব্যাপারে একমত। রাকেশ অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কারও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। কারও সঙ্গে সামান্যতম ঝগড়াঝাঁটিও কখনও হয়েছে বলে কেউ শোনেননি।

স্থানীয় সোর্স লাগানো হয়েছিল সোমবার বিকেলেই। মূলত বলা হয়েছিল রাকেশের ব্যক্তিজীবন নিয়ে খোঁজ নিতে। পাড়ায় কোনও চর্চা হত কিনা রাকেশকে নিয়ে, হলে কী নিয়ে চর্চা, এইসব। সোর্সরা যা খবর পেয়েছে এ পর্যন্ত, মিলে যাচ্ছে পাড়াপ্রতিবেশীদের ধারণার সঙ্গে। রাকেশ গুপ্তা অজাতশত্রু ছিলেন।

আর রাকেশের স্ত্রী কবিতা? তাঁর ব্যক্তিজীবন? কল ডিটেলস রেকর্ড থেকে অন্তত অন্য কোনও সম্পর্কের ন্যূনতম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। সুখী দম্পতি হিসেবেই পাড়ায় এবং বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন ওঁরা। বাহ্যিক সুখী দাম্পত্যের আড়ালে কোনও টানাপোড়েন ছিল? থাকলেও আভাস-ইঙ্গিত পাননি পরিচিতরা। বা পরিচিতদের মধ্যে কেউ কিছু জানলেও লুকিয়ে যাচ্ছেন। রাকেশের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণ-সঞ্জীবের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল কবিতার? সোর্স বলছে, কল রেকর্ডসও বলছে, 'ভাবীজি-ভাইয়া'-র স্বাভাবিক সম্পর্ক। 'ডাল মে কুছ কালা'-র ইঙ্গিত নেই।

ব্যারাকপুর-বেলঘরিয়ার দাগি অপরাধীদের তালিকা তৈরি করে খোঁজখবর হয়েছে বিস্তারিত। কেউ জেলে, কেউ জামিনে বাইরে। যারা বাইরে, তারা দিব্যি আছে এলাকায়। এবং শনি থেকে সোমের গতিবিধি সন্দেহের উদ্রেক করছে না।

অতঃকিম? পেশাগত ঝামেলার আঁচ নেই। ধারদেনার সমস্যা নেই। দাম্পত্য অশান্তির

BanglaBook.org

ইঙ্গিত নেই। পরকীয়ার খোঁজ নেই। স্থানীয় অপরাধজগতের রাঘববোয়ালদের জড়িত থাকার আভাস নেই। এবং এত 'নেই'-এর শেষে তদন্তকারীদের হাতেও পেনসিল ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই।

রাত হয়ে গেছে অনেক। অফিসারদের ছেড়ে দেন এসপি। উঠতে উঠতে ওসি ঘোলা বলেন, 'আরও লোক লাগিয়েছি স্যার। দেখা যাক। মিডিয়া যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব মার্ডার বোধহয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিটেক্ট হয়ে যায়!'

এসপি হাসেন, 'শোনো তপন, মিডিয়া কী করছে, কতটা ''সেনশনালাইজ'' করছে, সেটা নিয়ে বেশি ভেবে লাভ নেই। ওটা হাতে নেই আমাদের। আমার চিন্তা হচ্ছে অন্য ব্যাপারে...'

ব্যারাকপুর এবং বেলঘরিয়ার এসডিপিও-রা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠেন, 'কী স্যার?'

—বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের একটা হাই-লেভেল ডেলিগেশন মার্ডারটা নিয়ে আজ ডেপুটেশন দিয়ে এসেছে রাইটার্সে... শিল্পক্ষেত্রে কর্মরতদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে.. এইসব আর কী... গভর্নমেন্ট কেসটা না সিআইডি-কে দিয়ে দেয়...

'কিন্তু স্যার...', হতাশ দেখায় বেলঘরিয়ার এসডিপিও-কে।

থামিয়ে দেন পুলিশ সুপার। তরুণ এসডিপিও-র পিঠে হাত রাখেন, 'বাড়ি যাও, কাল ভাবা যাবে আবার।'

রাতে শোওয়ার আগে একটু বই পড়া বরাবরের অভ্যেস এসপি-র। কিন্তু আজ ইচ্ছে করছে না। কেসটা ঘুরছে মাথার মধ্যে। তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করছেন। এবং যত ভাবছেন, তত মাথায় ঘুরেফিরে আসছে রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েকটা লাইন। কয়েকটা শব্দ।

'I kept six honest serving men.
They taught me all I knew.
Their names were what and why
And when
And how and where and who....'

অপরাধের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই কিপলিং-এর এই বহুচর্চিত কবিতার, যার ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। কিন্তু লাইনগুলো এখন কী যে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে এই মামলার তদন্তে! হোয়াট, হোয়াই, হোয়েন, হাউ, হোয়ার, হু'। কী? কেন? কখন? কীভাবে? কোথায়? কে?

'কী?'— জানা আছে।

'কেন?'—মোটিভ অমিল। রাকেশের মানিব্যাগে যা টাকা ছিল, আততায়ীরা নিয়ে গেছে ধরে নেওয়া গেল। ছুটির দিনে মা-কে ছাড়তে এয়ারপোর্ট গেছিলেন। কত টাকা সঙ্গে থাকতে পারে? খুব বেশি ধরলেও হাজার দুই-তিন। আরও একটু বাড়িয়ে ভাবলে টেনেটুনে পাঁচ। লাখখানেক ক্যাশ তো আর সঙ্গে থাকার কথা নয়। রাকেশের চেন-ঘড়ি-আংটি পাওয়া যায়নি। ওগুলো

BanglaBook.org

বেচেই বা কত টাকা হতে পারে? যতই হোক, তার জন্য বড়জোর ছিনতাই হয়। এভাবে খুন হয়। সুতরাং 'মার্ডার ফর গেইন' হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। তা হলে? ঘুরেফিরে আটকে যাওয়া সেই মোটিভেই।

'কখন?'—উত্তর পাওয়া গেছে।

'কীভাবে?'—ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জানিয়েছে।

'কোথায়?'— উত্তর মেলেনি এখনও।

'কে?' বা 'কারা?'—'কেন'-র রহস্যই এখনও ভেদ করা গেল না, 'কে বা কারা' তো পরের ব্যাপার। নতুন করে সব শুরু করতে হবে।

নতুন করে শুরুই শুধু নয়, শেষও যে করতে হবে দুঃসাধ্য দ্রুততায়, পরের দিন সকালেই বুঝে গেলেন এসপি। যাঁকে রাখঢাকহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন ডিজি, 'খুব বেশি সময় দিতে পারব না আর...ম্যাক্সিমাম চার-পাঁচ দিন.. তার মধ্যে হল তো হল...নয়তো সিআইডি উইল টেক ওভার।'

পুলিশ সুপারের গাড়ি বাংলো থেকে বেরল সাড়ে আটটা নাগাদ। গন্তব্য, ভিআইপি এনক্লেভ। মিসেস গুপ্তার সঙ্গে আরেকবার খোলাখুলি কথা বলা দরকার।

আত্মীয়দের আনাগোনা এখনও লেগেই আছে গুপ্তা-পরিবারে। দাদার মৃত্যুর খবর পেয়েই সোমবার সন্ধেতেই মা-কে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন বোন দীপিকা। সংসারটা মূলত দীপিকাই সামলাচ্ছেন এখন। উপায় কী আর? ছেলের অকালমৃত্যুতে মা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। জ্ঞান হারাচ্ছেন যখন-তখন। কবিতাও সারাদিন নিজের ঘরে শুয়ে থাকছেন নিস্তব্ধ। মেয়ে দিয়া ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা প্রায় বলছেনই না।

ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুমের একটা সোফায় বসেছিলেন পুলিশ সুপার। রাকেশের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের খুব বেশি দেরি নেই আর। শ্রাদ্ধের পরের দিন আবাসনে আয়োজিত হবে স্মরণসভা। সেই সভার জন্য দাদার ছবির একটা কোলাজ তৈরি করছেন বোন দীপিকা, পুরনো ফ্যামিলি অ্যালবাম ঘেঁটে।

চা-বিস্কুট এসেছে। খুচরো কথার মধ্যে দীপিকা ছবিগুলো দেখাতে থাকেন এসপি-কে। 'এইটা ভাইয়ার কোলে আমি, ছোটবেলায় রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে। এইটা ভাইয়ার ফিফটিন্থ বার্থডের। এটা কলেজের এক্সকারশনে বন্ধুদের সঙ্গে ভাইজ্যাগে। আর এটা ভাইয়ার বিয়ের দিন আমার সঙ্গে...' গলা বুজে আসে দীপিকার। মাথা নিচু করে ফেলেন।

'আর এটা?'

BanglaBook.org

ফ্রেমের ডানদিকের একটা ছবিতে চোখ আটকে গেছে এসপি-র। একটা বই হাতে নিয়ে কিছু একটা পড়ছেন রাকেশ। দাঁড়ানো অবস্থায়, সামনে মাইক্রোফোন।

দীপিকা মুখ তোলেন, 'এটা মুশায়েরার।'

—মুশায়েরা?

—হ্যাঁ, দাদা কবিতা লিখত তো! ডাকও পেত ঘরোয়া কবিতা পাঠের আসরে। অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চা করত।

—তাই? আপনার দাদা তো বেশ গুণী মানুষ ছিলেন। ওঁর লেখা কবিতাগুলো নিয়ে একটা বই বের করার কথা ভেবে দেখতে পারেন কিন্তু।

ফের গলা ধরে আসে দীপিকার, 'হ্যাঁ, এটা ভাল বলেছেন। দাদারও ইচ্ছে ছিল একটা বই বেরোক।'

—আপনাদের কাছে ওঁর লেখাগুলো নেই?

এতক্ষণ এক ভদ্রলোক কথোপকথন শুনছিলেন পাশের সোফায় বসে। দেহ উদ্ধারের দিন যখন এসেছিলেন এই ফ্ল্যাটে, তখনও এঁকে দেখেছিলেন এসপি। নিজেই পরিচয় দেন ভদ্রলোক, 'স্যার, আমি রঞ্জিত। রঞ্জিত পোদ্দার। আমার কাছে আছে রাকেশের রিসেন্ট বেশ কিছু লেখা। আমিও একটু-আধটু লেখার চেষ্টা করি। রাকেশ আর আমি ঠিক করেছিলাম, পরের বইমেলায় কবিতার বই বার করব দু'জনে। আমি কিছু লিখলে সবার আগে ওকে পড়তে দিতাম। রাকেশও যখন কিছু লিখত, আমাকে দিয়ে বলত, ''কেমন হয়েছে?'' '

—বেশ তো, সময় নিয়ে বের করে ফেলুন বইটা।

—হ্যাঁ স্যার...

—আচ্ছা, ওঁর লেখাগুলো একটু দেখা যেতে পারে?

—হ্যাঁ, হোয়াই নট? রিসেন্ট লেখাগুলো আমার বাড়িতেই আছে। কিন্তু হাউ উইল দ্যাট হেল্প?

—না না, ইনভেসটিগেশনের জন্য নয়। এমনি দেখতাম। সাহিত্য আমারও পছন্দের বিষয়। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে...

কথা শেষ হওয়ার আগেই রঞ্জিত বলে ওঠেন, 'না স্যার, আপত্তি কিসের? আমার বাড়ি কাছেই, উল্টোডাঙায়। কাউকে যদি কাইন্ডলি পাঠিয়ে দেন, তার হাতে দিয়ে দেব লেখাগুলো। কিন্তু হিন্দি কবিতা... মানে আপনি...'

এসপি মৃদু হাসেন, 'আমি বাঙালি, কিন্তু হিন্দি মোটামুটি পড়তে পারি।'

যে জন্য সকাল-সকাল ছুটে আসা বাগুইআটির এই ফ্ল্যাটে, সেটা হল। মিসেস গুপ্তার সঙ্গে একান্তে মিনিট পনেরো কথা। হুঁ-হাঁ আর হ্যাঁ-না-তেই উত্তর সীমাবদ্ধ রাখলেন মহিলা। নতুন তথ্য পাওয়া গেল না কিছু। মরিয়া পুলিশ সুপার শেষ চেষ্টা করলেন আন্দাজে ঢিল ছুড়ে, 'ম্যাডাম, আমরা যা খবর পাচ্ছি, মিস্টার গুপ্তার একটা এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার ছিল...

BanglaBook.org

আপনি জানতেন কিছু?' কবিতা স্থিরচোখে তাকালেন, 'বিশ্বাস করি না। আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।' কী আর বলার থাকে এরপর?

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রঞ্জিত পোদ্দারকে দেখিয়ে ওসি ঘোলাকে নির্দেশ দিলেন এসপি, 'ইনি উল্টোডাঙায় থাকেন। ঠিকানা নিয়ে নাও, লোক পাঠাও এখনই। উনি কিছু কাগজ দেবেন। ওগুলো আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল।'

কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছে না, তদন্ত যখন সর্বার্থেই ক্লুলেস, কেস যখন চলে যেতেই বসেছে সিআইডি-র কাছে, কী লিখতেন রাকেশ, সেটাই না হয় পড়ে দেখা যাক। কবিতা থেকে কবিমনের গতিপ্রকৃতির সন্ধান মেলে যদি!

সাদা কাগজে লেখা রাকেশের কবিতাগুলো পুলিশ সুপারের অফিসে পৌঁছল দুপুর আড়াইটের সামান্য পরে। হোঁচট খেতে খেতে কিছু শব্দ আর বাক্য পড়তে পারা এক, কবিতার রসাস্বাদন আরেক। লেখাগুলো উলটে-পালটে দেখতে গিয়ে এসপি বুঝে গেলেন, এর মর্মোদ্ধার তাঁর কম্মো নয়।

অরিজিৎকে ফোনে ধরলেন পুলিশ সুপার। অরিজিৎ, এসপি-র কলেজজীবনের সহপাঠী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ান।

'এই অরিজিৎ, শোন না, একটা কাজ করে দিতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে কতক্ষণ থাকবি?... কিছু হিন্দি কবিতা পাঠাব তোর কাছে। তোদের হিন্দি ডিপার্টমেন্টের কোনও প্রোফেসরকে পাঠাতে পারবি ওগুলো? তারপর সেই প্রোফেসরের সঙ্গে একবার কথা বলব। আর ইংরেজির কাউকে বলে লেখাগুলো অনুবাদ করে দিতে বল প্লিজ। হাতে সময় বেশি নেই। আজ রাতের মধ্যে হলে ভাল, না হলে লেটেস্ট কাল সকাল। করে দে ভাই।'

অরিজিৎ একটু অবাকই হন শুনে। তারপর রসিকতা করেন হালকা, 'তা হলে চাকরিটা ছেড়েই দিচ্ছিস ফাইনালি? লেখার হাত তো তোর বরাবরই ভাল। লেখালিখি শুরু করবি নাকি পাকাপাকি? খুব ভাল। গুড ডিসিশন। চোর-ডাকাত ছেড়ে যখন কবিতায় মন দিয়েছিস...'

এসপি হাসেন, 'আরে ধুর, এই লেট থার্টিজ-এ আর কে চাকরি দেবে নতুন করে? দরকার আছে বলে বলছি। চাপে আছি রে একটু...'

অরিজিৎ বললেন, 'ঠিক আছে। এখনই পাঠা। দেখছি।'

সে-রাতে হয়ে উঠল না। কিন্তু পরের দিন, বৃহস্পতিবার সকাল ন'টার মধ্যে এসপি-র বারাসতের বাংলোয় পৌঁছে গেল রাকেশ গুপ্তার সাম্প্রতিক হিন্দি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।

দীর্ঘ কবিতা নয়। ষোলো থেকে আঠারো লাইন গড়ে। অনুবাদগুলো প্রত্যেকটাই পড়লেন

BanglaBook.org

এসপি। একবার নয়, দু'-তিনবার করে। ভদ্রলোক আহামরি কিছু লিখতেন না। প্রেমের কবিতা প্রত্যেকটাই। নির্দিষ্ট কাউকে ভেবে, কাউকে উদ্দেশ করে লেখা? অবশ্য তা-ই বা হতে হবে কেন ? নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দিষ্ট হতেই হবে, এমন নিয়ম আছে নাকি প্রেমের কবিতায়?

কিন্তু তা হলে খটকা লাগছে কেন? কেন মনে হচ্ছে, কোথাও একটা যোগসূত্র লুকিয়ে আছে শব্দগুলোয় ? আবার পড়তে থাকেন এসপি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন। এবং পড়তে পড়তেই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি!' তা হলে কি...?

অরিজিৎকে ফোনে ধরেন এসপি, 'তোর ওই হিন্দি প্রোফেসরের নম্বরটা টেক্সট কর তো শিগগির। আর ওঁর নামটা বল।'

এসএমএস-এ নম্বরটা আসতেই মোবাইলের বোতাম টেপেন পুলিশ সুপার। হিন্দির অধ্যাপকের সঙ্গে কথোপকথন হয় এরকম।

—ভেরি সরি ত্রিপাঠীজি... বিরক্ত করছি একটু। কবিতাগুলোর অনুবাদ পড়লাম। একটা বিষয়ে আপনার মতামত জানা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে । তাই আপনাকে বিরক্ত করা...

—না না, বিরক্ত কিসের? বলুন না।

—কবিতাগুলো পড়ে আমার একটা জিনিস স্ট্রাইক করছে। আপনারও সেটা মাথায় এসেছে কিনা, সেটাই জাস্ট...

—বলুন না..

—দেখুন, কবিতাগুলো তো প্রেমের। কিন্তু শব্দের প্রয়োগ বলুন বা উপমার ব্যবহার... আমি স্পেসিফিকসে যাচ্ছি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই কবিতা কোনও নারীকে উদ্দেশ করে কোনও পুরুষ লিখতে পারে না।

— হুঁ...

—আমার মনে হচ্ছে, এই কবিতা কোনও পুরুষ কবি শুধুমাত্র কোনও পুরুষকে উদ্দেশ করেই লিখতে পারেন। নির্দিষ্ট কেউ না-ই হতে পারে। কিন্তু এটা পুরুষের প্রতি পুরুষের প্রেমের কবিতা। সমকামের কবিতা। পুরুষের শরীরী বর্ণনা এত ডিটেলে... প্রায় প্রতিটা কবিতায়... আর উপমাগুলোও...

উত্তর আসে মোবাইলের অন্য প্রান্ত থেকে, 'এসপি সাহেব, ইউ আর রাইট। পড়ে আমারও মনে হয়েছে এটা। খুব ডিস্টিঙ্কটলি মনে হয়েছে। অলমোস্ট আনমিস্টেকেবল।'

—থ্যাঙ্কস আ লট ত্রিপাঠীজি... এটাই জানার ছিল।

ফোনটা রেখে দিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসেন এসপি। রাকেশ গুপ্তার মেয়ে আছে আট বছরের। দ্বিতীয় সন্তান আগতপ্রায়। সেই লোক এমন কবিতা লিখতেন, যার ছত্রে ছত্রে সমকামের ঘোষণা? রাকেশ কি তা হলে উভকামী ছিলেন? এই উভকামিতার কথা কোনওভাবে জেনে গিয়েছিলেন বলেই কি ততটা শোকসন্তপ্ত দেখায়নি রাকেশের স্ত্রী-কে?

BanglaBook.org

যদি ধরেই নেওয়া যায় যে রাকেশ উভকামী ছিলেন, তাতেই বা তদন্ত এগচ্ছে কোথায়? রাকেশের চরিত্রের একটা সম্ভাব্য দিকের ব্যাপারে আভাস পাওয়া গেছে মাত্র। 'সূত্র' কোনওভাবেই এখনও বলা যায় না একে। তদন্তকারী টিমকে এসপি জানালেন ব্যাপারটা, 'মিস্টার গুপ্তা প্রবাবলি বাইসেক্সুয়াল ছিলেন... খোঁজখবর করার সময় এই অ্যাঙ্গলটা মাথায় রেখো।'

সোম, মঙ্গল, বুধ পেরিয়ে বৃহস্পতি শেষ হতে চলল। ব্রেক-থ্রু হল না এখনও। এই সপ্তাহের মধ্যে না হলে আগামী সোমবার জেলা পুলিশের থেকে কেস ডায়েরি চেয়ে নেওয়া হবে ভবানী ভবনে সিআইডি-র সদর দফতরে, বুঝতে পারছিলেন এসপি। একটু হতাশই লাগছিল।

হতাশা কাটার সামান্য সম্ভাবনা দেখা দিল শুক্রবার বিকেলে, আইসি জগদ্দল সুবীর চ্যাটার্জির ফোনে। উত্তেজিত শোনাচ্ছে সুবীরকে, 'স্যার, আপনি বললেন না গুপ্তাসাহেব বাইসেক্সুয়াল ছিলেন হয়তো। ওঁর কোম্পানির অফিসে আমি সোমবার বিকেল থেকেই দু'জনকে ফিট করে রেখেছিলাম। এরা রাকেশের অর্ডারলির কাজ করত বেসিক্যালি। এই চা-টা দেওয়া, ভিজিটর হ্যান্ডল করা.. এসব আর কী! এ ক'দিন ফিমেল অ্যাঙ্গলেই কনসেনট্রেট করছিলাম... আজ অন্য অ্যাঙ্গলে খোঁজ নিলাম... অনেকক্ষণ কথা বললাম..'

—হুঁ... কী পেলেন?

—ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার! এরা বলছে একটা পঁচিশ-তিরিশ বছরের লোক গত তিন মাস ধরে মাসে অন্তত দু'বার রাকেশের চেম্বারে আসত। দুপুর বারোটা থেকে সোয়া বারোটার মধ্যে আসত। মিনিট দশ-পনেরো ঘরে থাকত। তারপর চলে যেত।

—সে তো একটা কর্পোরেট অফিসে একজন সিনিয়র এগজিকিউটিভের কাছে কত লোকই আসে। তাতে কী প্রমাণ হল?

—ঠিক স্যার, কিন্তু সঙ্গে আরও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছে। বলছে, যতক্ষণ এই লোকটা ঘরে থাকত, সাহেব নাকি বাইরে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিতেন। অর্ডারলিকে বলেও দিতেন, যাতে ভিতরে কেউ না আসে। এটা নাকি কখনও অন্য কোনও ভিজিটরের ক্ষেত্রে করতেন না।

এসপি-কে এখনও নিরুত্তাপ শোনায়, 'তাতেই বা কী এমন গুরুতর প্রমাণ হচ্ছে?'

—বলছি স্যার। গুপ্তাজি-র লাস্ট তিন মাসের ভিজিটর্স লিস্ট স্ক্যান করেছি গত ঘণ্টা দুয়েক ধরে। এই লোকটার আইডেন্টিটি এস্ট্যাব্লিশ করা গেছে স্যার। এর নাম চন্দন। চন্দন বসু। বনগাঁয় বাড়ি, ক্রিমিনাল হিস্ট্রি আছে স্যার...'

—কী হিস্ট্রি?

—আইসি বনগাঁ-কে ফোন করে নামটা দিয়েছিলাম স্যার। এসডিপিও বনগাঁ সাহেবকেও বলেছিলাম। এই কিছুক্ষণ আগে আইসি বনগাঁ ফোন করেছিলেন স্যার। থানার 'অ্যারেস্ট

BanglaBook.org

রেজিস্টার'-এ নাম আছে এই চন্দনের। মাস ছয়েক আগে একে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ অ্যারেস্ট করেছিল। ব্লু ফিল্মের অনেক সিডি সিজ় হয়েছিল সেই কেসে।'

এসপি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন এবার। কথা বলতে বলতেই পায়চারি করছেন দ্রুত। স্নায়ুতে উত্তেজনার লাবডুব টের পাচ্ছেন দিব্যি। রাকেশের উভকামী হওয়ায় আভাস কবিতায়, স্বামীর মৃত্যুর খবরেও স্ত্রী-র আপাত-নিরুত্তাপ থাকা, ব্লু ফিল্মের ব্যবসায় গ্রেফতার হওয়া যুবকের সঙ্গে মাসে দু'বার করে রাকেশের অফিস-বৈঠক....বিন্দুগুলো যোগ করলে সমাধান-রেখার একটা অবয়ব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

সুবীর প্রশ্ন করেন, 'এই চন্দনটাকে তুলে নিই স্যার?'

—না, ডোন্ট রাশ। আগে ছেলেটার ফোন নম্বরটা নিয়ে নাও বনগাঁ থানা থেকে। পেয়ে যাবে অ্যারেস্ট রেজিস্টারে। রবিবার ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুর থেকে সোমবার সকাল অবধি টাওয়ার লোকেশন নিয়ে জানাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কোন সার্ভিস প্রোভাইডারের ফোন ইউজ় করে সেটা জানাও কুইকলি। আমি বলে দিচ্ছি ওদের টপ লেভেলে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পেয়ে যাবে সিডিআর।

ঘণ্টাখানেক পেরনোর আগেই সুবীর ফোন করলেন আবার। এবং যে চূড়ান্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে 'স্যার!' বলে কথা শুরু করলেন, পুলিশ সুপার বুঝে গেলেন, সমাধান আসন্ন।

'স্যার, খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে! রবিবার দুপুর দুটো থেকে সোয়া তিনটে পর্যন্ত মাইকেলনগর, তারপর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত নিউ ব্যারাকপুর সেক্টরে স্ট্যাটিক। রাত দেড়টায় মুড়াগাছার কাছাকাছি!'

এসপি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন, 'এবার তুলে নাও চন্দনকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বাড়িতে দুম করে রেইড করতে যেয়ো না। যদি না থাকে, তা হলে আসবেই না আর রেইড হওয়ার পর। হাওয়া হয়ে যাবে। আগে জেনে নাও, কোথায় আছে বা কোথায় থাকতে পারে। লোকাল ছেলে। খবর পাওয়াটা কঠিন হবে না। আমি এসডিপিও বনগাঁ-কে বলে দিচ্ছি। রেডি হয়ে টিম নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ো। সিভিল গাড়িতে। সিভিল ড্রেসে। কুইক!'

ওসি-র সোর্স নেটওয়ার্ক শক্তপোক্ত হলে একটা মহকুমা শহরে কারও অবস্থান ট্র্যাক করা কঠিন ব্যাপার নয় কিছু। দ্রুত জানা গেল, চন্দন বাড়িতে নেই। আছে শ্বশুরবাড়িতে, গোবরডাঙ্গায়। চন্দনকে গ্রেফতার করে পুলিশ যখন বারাসত রওনা দিল, তখন রাত সাড়ে ন'টা পেরিয়ে প্রায় পৌনে দশ।

'না স্যার আমি কিছু করিনি' বা 'আমি কিছু জানি না' জাতীয় বাক্যবন্ধ ব্যবহারের সুযোগই পেল না বছর তিরিশের চন্দন। কলার চেপে ধরে তাকে প্রথম প্রশ্নটাই করা হয়েছিল, 'রাকেশ গুপ্তা বলে কাউকে চিনিস?' এবং হতচকিত চন্দন 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছু বলার আগেই ঝটিতি প্রশ্ন নম্বর দুই, 'গুপ্তাসাহেবেকে কোথায় নিয়ে গেছিলি মাইকেলনগর থেকে? রাত দেড়টায় মুড়াগাছায়

BanglaBook.org

কী করছিলি?' চন্দন ততক্ষণে থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। কথা বেরচ্ছে না মুখ দিয়ে। ধেয়ে এল তিন নম্বর প্রশ্ন, 'আমরা পুরোটাই জানি। শুধু তোর মুখ থেকে শুনতে চাই। একটা মিথ্যে বললে চামড়া গুটিয়ে দেব। এবং শুকোব তোর বাড়ির উঠোনেই। কে কে ছিলি, কেন মারলি, শুরু থেকে বল।'

এসপি-র পা জড়িয়ে ধরে এবার কেঁদে ফেলল চন্দন, 'বলছি স্যার। কিছু মালকড়ি সালটে নেওয়ার প্ল্যান ছিল। জানে মেরে দেওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু গুপ্তা স্যার এমন চিল্লামিল্লি করলেন যে না মারলে ফেঁসে যেতাম।'

রাকেশ গুপ্তা হত্যা রহস্যের যবনিকা পতন। চন্দন শুরু করল একেবারে গোড়া থেকেই। মাস চারেক আগে যখন রাকেশ গুপ্তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সল্টলেকে।

'আমি বন্ধুদের সঙ্গে সল্টলেকের সিটি সেন্টারে সিনেমা দেখে বেরচ্ছিলাম। সন্ধে হয়ে গেছে তখন। গুপ্তা স্যারও সিটি সেন্টারে এসেছিলেন। বেরচ্ছিলেন গাড়ি নিয়ে। সঙ্গে ওঁর মিসেস ছিলেন। ওঁর গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। উনি নেমে বনেট খুলে ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছিলেন। বৃষ্টি পড়ছিল। আমি গাড়ি সারাইয়ের টুকটাক কাজ শিখেছিলাম বারো ক্লাসের পর। দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলাম, কী হয়েছে, দেখব একটু স্যার? মিনিট কুড়ি নাড়াঘাঁটা করে গাড়িটা স্টার্ট করিয়ে দিয়েছিলাম। স্টার্ট নেওয়ার সময় পিছন থেকে ঠেলেও দিয়েছিলাম গাড়িটা।

গুপ্তা স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন। টাকা দিতে চেয়েছিলেন। নিইনি। জানতে চেয়েছিলেন, কী করি, কোথায় থাকি। বলেছিলাম, তেমন কিছু করি না বলার মতো, বেকারই ধরতে পারেন। উনি ভিজিটিং কার্ড বার করে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "একদিন অফিসে এসো, কী করা যায় দেখি।" সেই ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ।'

—তা গেলি ওঁর অফিসে?

—দিন পনেরো পরে গেলাম। বড় চাকুরে, একটা কিছু ব্যবসাপাতিতে যদি হেল্প করেন একটু ভালভাবে থাকতে পারব। বেকার ছেলে স্যার। পড়াশুনো ওই বারো ক্লাস অবধি। গ্যারেজে সারাইয়ের টুকটাক শিখেছিলাম। বাকি এদিক-সেদিক সাপ্লাইয়ের কাজ করতাম। খুব কম ইনকাম। তার মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছিলাম বছর দুই আগে। টাকার খুব দরকার ছিল।

—সাপ্লাইয়ের কাজ ছাড়া আর কী করিস?

—ক্যাসেট আর সিডি-র দোকানে পার্ট টাইম কাজ করি। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকার কাজ।

—আর?

চন্দন একটু চুপ করে থেকে ফের বলতে শুরু করে।

—বনগাঁয় কয়েকটা জায়গা আছে স্যার, যেখানে লুকিয়ে ব্লু ফিল্ম শো চলে রাতের দিকে সেখানে অপারেটরের কাজ করি মাঝে মাঝে। কোথায় এইসব সিডি পাওয়া যায়, কোথায় চটি বই পাওয়া যায়, সব জানি। হেব্বি ডিমান্ড এসব সিডি-র। সেগুলো ডেলিভারির কাজও করতাম।

BanglaBook.org

শো যারা চালাত, তারা যেমন যেমন বলত, যেখান থেকে যা সিডি আনতে বলত, আনতাম। পুলিশ আমাকে ধরেওছিল কিছুদিন আগে। কেস দিয়েছিল। সাতদিন জেলে ছিলাম। আমি স্যার একটু ভাল পথে রোজকারের রাস্তা খুঁজছিলাম।

— হুঁ...

—প্রথম দিন গুপ্তা স্যারের দেখা পেলাম না। অফিসে ছিলেন না। দিনসাতেক পরে আবার গেলাম। হাতজোড় করে বললাম, একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দিন না স্যার। উনি চা খাওয়ালেন। কতদূর পড়াশুনা করেছি, কী কাজ করি, সব খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। আমি যখন বললাম, ক্যাসেট আর সিডি -র দোকানে পার্টটাইম কাজ করি, উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, কী ধরনের সিডি?

— তুই কী বললি?

—আমি স্যার প্রথমে বুঝতে পারিনি উনি ঠিক কী বলতে চাইছেন। বললাম, সিনেমার সিডি। তখন উনি আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কী ধরনের সিনেমা? ফিল্‌ম তো অনেক রকমের হয় । বড়দের ফিল্‌ম, ছোটদের ফিল্‌ম...'

গুপ্তা স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারলাম, উনি কী বলতে চাইছেন। আমি সাহস করে বলে ফেললাম, 'যেমন চাইবেন, তেমন এনে দিতে পারি স্যার। যেমন বলবেন। থ্রি এক্স আছে স্যার।

গুপ্তা স্যার একটু হাসলেন। হেসে বললেন, 'থ্রি এক্স-ও অনেক রকমের হয়।' আমি আবার একটু থমকে গেলাম। চুপ করে আছি দেখে উনি বললেন, 'আদমি-অওরত ছাড়াও থ্রি এক্স হয়। আদমি-আদমি হয়। অওরত-অওরত হয়।' এবার ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। গুপ্তা স্যার 'আদমি-আদমি' র ক্যাসেট পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইছেন। মার্কেটে আমরা যাকে 'হোমো-সিডি' বলি ।

এরপর একদম খোলাখুলি কথা হল। গুপ্তা স্যার বললেন, 'তুমি আমাকে ক্যাসেট-সিডি এনে দেবে। অফিসেই আসবে। অফিসের ল্যান্ডলাইনে ফোন করে আমার পিএ-র থেকে টাইম চাইবে। কী জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট জানতে চাইলে বলবে, সাহেব সাপ্লাইয়ের কাজে ডেকেছেন। দিন আর সময় পিএ বলে দেবে। ভাল সিডি হলে ভাল টাকা দেব। আর তোমার অন্য কোনও কাজের ব্যাপারটাও দেখছি আমি।'

—বেশ... তারপর?

—আমি ওঁকে এ পর্যন্ত ছ'বার সিডি দিয়েছি। উনি প্রথমবার দু হাজার টাকা দিয়েছিলেন। পরের বার থেকে তিন। আমার মাসে চার-পাঁচ হাজার বাড়তি রোজগার হচ্ছিল। আমি ওতেই খুশি ছিলাম, কিন্তু শিবু বলল, 'কী পাতি চার-পাঁচ হাজারে খেলছিস...বড় দাঁও মারার কথা ভাব।'

BanglaBook.org

—শিবু?

—শিবু আমার অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। এখন খড়দায় থাকে। একটা কারখানায় কাজ করে। মাঝে মাঝে আমরা ব্যারাকপুর স্টেশনে আড্ডা দিই শনি-রবিবার। আড্ডায় গুপ্তা স্যারের কথা বলতে শিবু লাফিয়ে উঠেছিল, 'তুই কি গাধা নাকি! এটা মাসে চার-পাঁচ হাজারের কেসই না। মিনিমাম চার-পাঁচ লাখ!' আমি বললাম, মানে?

শিবু বলল, মালটা এত বড় চাকরি করে। নিজের ফ্ল্যাট ভিআইপি রোডের উপর। ওকে একটা টোপ দে। বল, একটা দারুণ সিডি আছে, কিন্তু ভাড়া দেওয়া যাবে না। কোনও একটা জায়গায় গিয়ে দেখতে হবে। আমি বললাম, কিন্তু যদি না আসে? শিবু হাসল। বলল, আরে আসবে আসবে, ওর বাপ আসবে... ঠিক আসবে। তুই লোভ দেখাবি, বলবি, রিয়েল সিনও থাকবে। আমি বললাম, রিয়েল সিন মানে? শিবু বলল, আরে গাধা, বলবি পার্টনার রেডি থাকবে তোর স্যারের জন্য। মাথায় ঢুকল? আমি বললাম, সে না হয় এল, তারপর?

শিবু বলল, 'তারপর তো সোজা। বলব, লাখ চারেক ছাড়ুন, না হলে আপনার কীর্তি ফাঁস করে দেব। বাড়িতে আর অফিসে সবাই জানবে, বউ প্রেগন্যান্ট, একটা বাচ্চা মেয়েও আছে আর আপনি মাসে মাসে হোমো-সিডি আনিয়ে দেখছেন। দেখবি সুড়সুড় করে মাল খসাতে রাজি হয়ে যাবে। দু'-একটা আরও ছেলেপুলে লাগবে কাজটায়। ভাব একবার, যদি চারজন-ও হয়, পার হেড লাখখানেক। যদি দু'লাখ পাওয়া যায়, তা হলেও পঞ্চাশ হাজার!'

শিবুর কথা শুনে মাথাটা ঘুরে গেল আমার। এক লাখ পার হেড? মাসে সাকুল্যে আট-দশ হাজার রোজগার হয় এদিক-ওদিক করে। তা-ও সব মাসে নয়। সেখানে একেবারে লাখখানেক পেয়ে গেলে তো নিজের একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবা যাবে অন্তত। রাজি হয়ে গেলাম শিবুর কথায়।

আইসি ঘোলা আর থাকতে পারেন না, 'তুই যেভাবে বলছিস, মনে হচ্ছে ভাজা মাছ উলটে খেতে জানিস না। সবই শিবুর প্ল্যান। সবই শিবু বুঝিয়েছে, শিবু করিয়েছে। শিবু ধরা পড়লে ঠিক উলটো বলবে বলবে, পুরোটাই তোর প্ল্যান।'

—না স্যার... বিশ্বাস করুন! শিবুই আমাকে...

—হয়েছে হয়েছে... বাকিটা বল...

—শিবু আর আমি ভাবতে বসলাম, কোথায় আনা যায় গুপ্তা স্যারকে? একটা বাড়ির ব্যবস্থা তো করতে হবে। কে করবে, কোথায় করবে? শিবু আমাকে বলল বাসুদার হেল্প লাগবে। 'বাসুদা' নিউ ব্যারাকপুর এলাকার নামকরা মস্তান ছিল একসময়। আমি আর শিবু গেলাম বাসুদার কাছে। বাসুদা ফুটিয়ে দিল আমাদের। বলল, 'কোনও ঝামেলার মধ্যে আমি থাকি না আর, তোরা তো জানিসই।'

শিবু দমল না। বাসুদার বোন ফুলমণিকে চিনত আগে থেকে। গিয়ে ধরল একটু পরে। বলল,

BanglaBook.org

দিদি, একটা কিছু ব্যবস্থা করো। আমাদের ছোট একটা কাজ আছে। কোনও বাওয়াল হবে না। তোমাকে হাজার পাঁচেক দেব কাজ হয়ে গেলে। ফুলমণি মধ্যমগ্রাম বাজারে সবজি বিক্রি করে। টানাটানির সংসার। বলল, দাঁড়া, দেখছি। তোরা কাল আয়।

পরের দিন আবার গেলাম। ফুলমণি বলল, 'ব্যবস্থা হয়েছে। নিউ ব্যারাকপুরে দাদার একটা পুরনো দোতলা বাড়ি আছে। বছরের অর্ধেক সময় খালি থাকে। মাঝে মাঝে আমি গিয়ে ঝাড়পোঁছ করে আসি। ওই বাড়িটার চাবি নিয়ে রাখব আমি। তোদের আজ বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি চল।' বাড়ি দেখে এলাম।

—তারপর?

—যেমনটা প্ল্যান ছিল তেমনটাই হল। শিবু ঠিকই ধরেছিল। গত শনিবার ওঁর অফিসে গিয়ে সিডি আর 'রিয়েল সিন'-এর কথা বলতে গুপ্তাজি রাজি হয়ে গেলেন। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ মাইকেলনগরে আসতে বললাম। উনি বললেন, আড়াইটের আগে হবে না। ওই আড়াইটে নাগাদই ট্যাক্সি করে এলেন। আমি নিয়ে গেলাম বাসুদার বাড়িটায়। মাইকেলনগর মোড় থেকে হেঁটে মিনিট পনেরো-কুড়ি বড়জোর। ঢুকে দেখলাম, শিবুর সঙ্গে আর একটা ছেলে আছে। শিবু আলাপ করাল। বলল, নাম জিৎ। খড়দার ছেলে। আর ছিল লক্ষ্মী।

—লক্ষ্মী আবার কে?

—স্যার, ঘোলা এলাকাতেই থাকে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া। একসঙ্গে থাকে না। শিবুর সঙ্গে আগে অনেকবার দেখেছি। ওদের মধ্যে রিলেশন আছে একটা।

—বলতে থাক...

—ঘরটা খুব নোংরা অবস্থায় ছিল। তিন-চারটে খালি বিয়ারের বোতল মেঝেতে পড়ে ছিল। খাটের উপর বেশ কয়েকটা সিডি আর কয়েকটা হিন্দি চটি বই ছিল। গুপ্তাস্যার বুঝলাম হকচকিয়ে গেছেন। অভ্যেস নেই তো এইসব জায়গায় আসার। শিবু বলল, 'বসুন স্যার, বসুন। আপনার একটু অসুবিধে হবে এখানে। কিন্তু এসব কাজ তো খুব ভদ্র জায়গায় করা মুশকিল, বোঝেনই তো...'

গুপ্তাজি বসলেন না। ওঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, খুব অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এখানে প্রোজেক্টর কোথায়? সিডি-টা দেখব কী করে?'

শিবু বলল, 'ওসব আধঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে। ততক্ষণ আপনি এই বইগুলো দেখতে পারেন, হেব্বি হেব্বি ছবি আছে।' তারপর জিৎ বলে ছেলেটাকে বলল, 'সাহেবকে ঢেলে দে না একটা।'

জিৎ বলল, 'বিয়ার খাবেন একটু স্যার? আপনার অনারে আজ ইংলিশ মালও আছে। হুইস্কি চলবে? একটু নেশাটা ধরুক, তারপর "রিয়েল সিন" হবে।'

গুপ্তা স্যার রেগে গেলেন। সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চন্দন, হোয়াট ইজ দিস? আমি এখানে মদ খেতে আসিনি। এসব কী? তুমি আমার সিডিগুলো দাও, আমি দেখে নেক্সট উইক ফেরত দিয়ে দেব।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'স্যার, প্রোজেক্টর এসে যাবে একটু পরেই। আপনি একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আর এই সিডিগুলো বাইরে দেওয়া যাবে না, আপনাকে তো বলেছিলাম আগে!'

উনি এবার আরও খচে গেলেন, 'আমি এখানে আর অপেক্ষা করতে পারব না। তোমার কথায় এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে, আমি চলে যাচ্ছি।'

গুপ্তা স্যার দরজার দিকে এগনো মাত্রই মেঝেতে বসা শিবু লাফ দিয়ে উঠল। সঙ্গে জিৎ-ও। দেখলাম, শিবু কোমরে গোঁজা ছুরি বার করেছে। লক্ষ্মী ছুটে দরজা আটকে দাঁড়াল। আর নিমেষের মধ্যে গুপ্তা স্যারের হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিল জিৎ। আমাকে দিয়ে বলল, 'ফোনটা সুইচ অফ কর।'

গুপ্তা স্যার তখন ভয় পেয়ে গেছেন। আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'মুঝে যানে দো।'

শিবু বলল, 'স্যার, আপনাকে আমরা আটকে রাখব বলে আনিনি, আপনি শুধু পাঁচ লাখ টাকা আমাদের দেবেন সাতদিনের মধ্যে, ব্যস।'

গুপ্তা স্যার একটু সামলে উঠেছেন তখন। বললেন, 'টাকা! কিসের টাকা! এক পয়সাও দেব না।'

শিবুর উত্তর রেডিই ছিল, 'দিতে তো হবেই স্যার। না হলে আপনার মানইজ্জত সব মায়ের ভোগে যাবে। বাড়িতে বউ আছে...মেয়ে আছে... আরেকটা বাচ্চা হবে আর আপনি হোমো সিডির ডেলিভারি নিচ্ছেন মাসে মাসে, এটা পাড়ায়-অফিসে জানাজানি হলে লাইফ বিলা হয়ে যাবে স্যার... একটু ভেবে দেখুন... মাত্র তো লাখ পাঁচেক।'

গুপ্তা স্যার আবার খার খেয়ে গেলেন, চিল্লামিল্লি শুরু করলেন, 'দেব না! শুনে রাখো, দেব না! একটা পয়সাও না! তোমরা যেখানে ইচ্ছে যা খুশি বলতে পারো। লোকে তোমাদের মতো পেটি ক্রিমিনালদের বিশ্বাস করবে নাকি আমাকে, সেটা আমিও দেখব। তোমাদের ধারণা নেই তোমরা কাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছ। অনেক মন্ত্রী, অনেক বড় অফিসারদের আমি পারসোন্যালি চিনি, তোমাদের সবক'টার মুখ চিনে রাখছি। এই জায়গাটাও আমার মনে থাকবে। সবাইকে জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। চন্দন, তোমাকে সারাজীবন আফশোস করতে হবে এটার জন্য...'

শিবু এক পা পিছিয়ে গেল। চোখাচোখি হল আমার আর জিতের সঙ্গে। আমরা বুঝে গেলাম, গুপ্তা স্যার ঠিকই বলছেন। আমরা পাতি চ্যাংড়া। পুলিশ কেস খেয়েছি আগে। আর উনি বড় অফিসার। অনেক জানাশুনো। ঠিকই তো, আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? আর উনি সিডি নিয়েছেন, দেখেছেন, আবার নিয়েছেন, কোনও প্রমাণ তো নেই এসবের! উনি এখন যদি পুলিশে কমপ্লেন করেন, আমরা ওঁকে কিডন্যাপ করে এখানে আটকে রেখে টাকা চেয়েছি, আমাদের জিন্দগি পুরো বরবাদ। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখলে আমরা ফিনিশ হয়ে যেতাম স্যার!

—সে তো এখনও ফিনিশই হবি! বাকি জীবনটা জেলেই কাটাবি! যাক গে... তারপর?

BanglaBook.org

—চোখে চোখে কথা হয়ে গেল আমাদের। শিবু লক্ষ্মীকে বলল, 'ভিতরের ঘরে দড়ি আছে, চট করে!.... এই চন্দন... মুখটা চেপে ধর শিগগির...।' আমি আর জিৎ মিলে মুখ চেপে ধরে খাটের উপর ফেলে দিলাম গুপ্তা স্যারকে। উনি হাত-পা নাড়িয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। শিবু ছুরিটা গলার কাছে ধরল, উনি ভয়ে স্থির হয়ে গেলেন।

লক্ষ্মী ততক্ষণে নাইলনের দড়ি নিয়ে এসেছে একগোছা। শিবু আমাকে বলল, 'দড়িটা দিয়ে ফাঁস দে গলায়, না হলে আমরা ফিনিশ হয়ে যাব।' আমার হাত-পা কাঁপছিল স্যার। এমন হবে ভাবিনি তো আগে, মাথা কাজ করছিল না। শিবু ছুরি চালিয়ে দিল গুপ্তা স্যারের বুকে। আমি আর জিৎ মিলে দড়ির ফাঁস দিলাম গলায়। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল একটু পরেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

—হুঁ...

—আমরা চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। শিবু-আমি-জিৎ-লক্ষ্মী আমরা চারজনই ঘামছিলাম। কী করতে কী হয়ে গেল! এখন উপায়? সবসুদ্ধ তো সেই জেলেই যেতে হবে।

শিবুই প্ল্যান বাতলাল একটা। বলল, 'বাঁচার একটাই রাস্তা এখন। বেশি রাতের দিকে বডিটা খালাস করে দিতে হবে।'

—কীভাবে খালাস করলি?

খালাস-পর্বের সারসংক্ষেপ এই।

—সন্ধের পর শিবু বেরিয়ে গিয়ে একটা বস্তা জোগাড় করে আনল। দড়িও আনল বাড়তি। বডি পাওয়া গেলেও যাতে চট করে চেনা না যায়, তাই একটা থান ইট দিয়ে রাকেশের মুখটা থেঁতলে দিল জিৎ। তারপর বেরিয়ে গেল গাড়ির খোঁজে, যাতে নিয়ে যাওয়া হবে বডি।

...কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? লক্ষ্মী বলল, মুড়াগাছার পুকুরপাড়ের কথা। জিৎ একটা ম্যাটাডোর জোগাড় করে আনল রাত সাড়ে দশটায়। শিবু লক্ষ্মীকে বলল, একটা ব্লাউজ আর লেডিজ রুমাল আনতে। নাইলনের দড়ি দিয়ে বডিটাকে বাঁধার পর ব্লাউজ আর রুমালটা রাখলাম বডির উপর। বডি পাওয়া গেলে যাতে পুলিশ ভাবে, মেয়ে-কেসে উনি ফেঁসে গেছিলেন। এরপর বডি বস্তাবন্দি করা, বস্তাকে নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর রাত একটার পর ম্যাটাডোরে চাপিয়ে মুড়াগাছায় বস্তা ফেলে আসা।'

চন্দনের বয়ান শেষ হওয়া মাত্রই স্থির হয়ে গেল পরবর্তী করণীয়। চন্দনকে নিয়ে একটা টিম বেরল নিউ ব্যারাকপুরের সেই বাড়িতে, যেখানে রাকেশকে মারা হয়েছিল। খাটে এবং মেঝেতে রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে এখনও। পড়ে আছে বিয়ার আর হুইস্কির বোতল। চশমার ভাঙা টুকরো। পড়ে রয়েছে নাইলনের দড়ি কয়েকগাছা। হিন্দি বই কয়েকটা, অশ্লীল ছবি ভরতি। সিডিগুলো কোথায়? চন্দন জানাল, 'বনগাঁর বাড়িতে আছে।'

অন্য আরেকটা টিম ততক্ষণে খড়দা থানায় পৌঁছে গেছে। অ্যারেস্ট রেজিস্টার থেকে জানা

BanglaBook.org

হয়ে গেছে, মিঠুন ওরফে জিৎ ঘোষ নামে এক যুবক কয়েকমাস আগে ছিঁচকে চুরির কেসে অ্যারেস্ট হয়েছিল। ভোরের মধ্যেই খড়দা থানার হাজতে ঠাঁই হল জিতের। বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটা দামি ঘড়ি আর সোনার আংটি।

বাকি ছিল লক্ষ্মী আর শিবু। লক্ষ্মীকে থানার স্থানীয় সোর্সরা সবাই চিনত। পাওয়া গেল বাড়িতেই। একটা গলার চেন উদ্ধার হল বাড়ি থেকে। শিবুকে পাওয়া গেল না ভোররাতের 'রেইড'-এ। গত দু'-তিনদিন ধরে বাড়িতে নেই। মোবাইল নম্বরও সুইচ্‌ড অফ সেই থেকেই। শেষ টাওয়ার লোকেশন, হাওড়া স্টেশন চত্বর। শহরের বাইরে পালিয়েছে কিছু আঁচ করে?

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ ডিজি-কে ফোনে ধরলেন পুলিশ সুপার।

—স্যার, ওই মার্ডারটা... ডিটেকটেড স্যার... থ্রি আউট অফ ফোর অ্যারেস্টেড...কনফেসও করেছে।

—ইজ ইট? আমি তো ভাবছিলাম আজ আবার তোমাকে ফোন করব প্রোগ্রেস জানতে। হোয়াটস্ দ্য স্টোরি? কারা করল? কেন করল? উইমেন? অর ওয়েলথ?

—নাইদার স্যার। বাইসেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড ব্ল্যাকমেল।

ডিজি একটু থমকে যান শুনে। পুলিশ সুপার পুরোটা বলেন। বাক্যালাপ শেষে উচ্ছ্বসিত শোনায় রাজ্যের পুলিশ প্রধানকে, 'হার্টিয়েস্ট কনগ্র্যাচুলেশনস! প্রাউড অফ ইয়োর টিম!'

ফোনটা রেখে একটা লম্বা শ্বাস নেন এসপি। ভাগ্যিস সেদিন রাকেশের বোন দাদার ছবির কোলাজ বানাচ্ছিলেন, ভাগ্যিস চোখ পড়েছিল রাকেশের কবিতাপাঠের ছবিতে!

প্রমাণ সংহত করে যত দ্রুত সম্ভব চার্জশিট জমা দেওয়ার জরুরি দায়িত্বটা আইসি ঘোলা তপনকুমার বিশ্বাসকে দিয়েছিলেন পুলিশ সুপার। কিনারা-পরবর্তী অধ্যায়ে তপনই ছিলেন মামলার তদন্তকারী অফিসার।

নিউ ব্যারাকপুরের যে বাড়িতে খুন হন রাকেশ, তার পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক পরীক্ষা হয়েছিল। খাটে আর মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তের নমুনা যে মানবদেহের, প্রমাণিত হয়েছিল। এবং সেই নমুনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল পোস্টমর্টেম পর্বে সংগৃহীত রাকেশের 'ব্লাড স্যাম্পল', মিলে গিয়েছিল গ্রুপ। যে চশমার ভাঙা টুকরো পাওয়া গিয়েছিল ঘরে, তা যে রাকেশেরই, চিহ্নিত করেছিলেন আত্মীয়বন্ধুরা। জিতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়ি-আংটি এবং লক্ষ্মীর বাড়ির তল্লাশিতে পাওয়া চেনও যে রাকেশরই, শনাক্ত হয়েছিল অনায়াসে। ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া বিয়ার-হুইস্কির বোতলে আঙুলের ছাপ মিলেছিল শিবু-চন্দন-জিতের। চন্দনের বনগাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় একডজন সমকাম-বিষয়ক সিডি।

যে ম্যাটাডোরে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাকেশের দেহ, সেটা চিহ্নিত করে বাজেয়াপ্ত করা গিয়েছিল সহজেই। দেহ পাচারের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ম্যাটাডোর-চালকের সাক্ষ্য। যিনি 'টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন' প্যারেডে চিনিয়ে দিয়েছিলেন চার

BanglaBook.org

অভিযুক্তকে। সর্বোপরি, ফৌজদারি বিধির ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দিতে নিজেদের অপরাধ কবুল করেছিল চন্দন-জিৎ-লক্ষ্মী।

শিবু কিছুটা বেগ দিয়েছিল পুলিশকে। ধরা যায়নি তাড়াতাড়ি। শিবুকে 'ফেরার' দেখিয়েই চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন তপন। প্রায় বছরখানেক চোর-পুলিশ খেলার পর ধরা পড়েছিল শিবু।

বিচারপর্ব শেষ হয়েছিল দ্রুত। রায় বেরিয়েছিল ২০১০-এর ৩০ এপ্রিল। শিবু-জিৎ-চন্দন-লক্ষ্মী, চারজনের জন্যই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বরাদ্দ করেছিলেন বারাসত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক। চক্রী-চতুষ্টয় এখনও সংশোধনাগারেই।

সামাজিক চাপ বড় বিষম বস্তু। সামাজিক নির্মাণও। রাকেশ গুপ্তা এই চাপের শিকার হয়েছিলেন। এই নির্মাণেরই বলি হয়েছিলেন শেষ বিচারে। ভদ্রলোকের লেখা কবিতাগুলোয় স্পষ্ট বেরিয়ে আসে ওঁর সমকামী সত্তা। সামাজিক নির্মাণের ব্যাকরণে যে সত্তাকে প্রথম জীবনে নিজে চিনতে পারেননি, বা পারলেও সেই সত্তাকে তার প্রাপ্য দিতে পারেননি। সেই সত্তাকে স্বীকার করে যখন তাতে সাড়া দিতে চেয়েছিলেন, দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়েছিল সামাজিক চাপ।

শরীরে-মনে কী চূড়ান্ত টানাপোড়েনই না সহ্য করতে হয়েছিল ভদ্রলোককে! বাহ্যত সুখী দাম্পত্যজীবন স্ত্রী-কন্যা নিয়ে। পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত। নিজে আদপে যা, সেটা সমাজ-সংসারে গোপন রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা একদিকে, অন্যদিকে নিজের জৈবিক চাহিদার তাড়নায় দগ্ধ হতে থাকা নিরন্তর। এবং শেষমেশ প্রাণ দেওয়া এই সংঘাতের যূপকাষ্ঠে।

কী মর্মান্তিক ট্র্যাপিজ-জীবন! মৃত্যুই বোধহয় ছিল একমাত্র পরিত্রাণ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গন্ধটা সন্দেহজনক

—এই... থামাও এবার...

না থামিয়ে উপায়ও ছিল না অবশ্য। ড্রাইভার ব্রেক কষতে বাধ্য হলেন গন্তব্যের অন্তত দেড়শো মিটার আগে। ভিড় বলে ভিড়! সকাল পৌনে আটটা থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। পুরো কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলটাই যেন রাস্তায় নেমে এসেছে। পুলিশ সুপার হাঁটতে শুরু করেন গাড়ি থেকে নেমে। স্থানীয় বীজপুর থানার অফিসাররা তো বটেই, স্পটে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন এসডিপিও ব্যারাকপুর। এসে গিয়েছেন অ্যাডিশনাল এসপি ব্যারাকপুরও।

উগ্র জনতার বিক্ষোভ উগ্রতর হয় এসপি-কে দেখে। একাধিক দাবি ছিটকে আসতে থাকে ভিড়ের মধ্যে থেকে। 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি না দিলে রেকেড উঠবে না! আজকের মধ্যেই বীজপুর থানার আইসি (ইনস্পেকটর-ইন-চার্জ)-কে বদলি করতে হবে! থানার দুশো মিটারের মধ্যে এই ঘটনা কীভাবে ঘটল, এসপি-কে প্রকাশ্যে তার জবাবদিহি করতে হবে, নয়তো বডি তুলতে দেওয়া হবে না!...' ইত্যাদি।

অস্বাভাবিক কিছু নয়। যা ঘটেছে, যেভাবে ঘটেছে, এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে না পড়লেই বরং অবাক হওয়ার ছিল। এসব ক্ষেত্রে যা প্রাথমিক করণীয়, সেটাই করলেন পুলিশ সুপার। জনতার বক্তব্য প্রায় আধঘণ্টা ধরে শুনলেন ধৈর্য ধরে। অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে উঠে আসবে, এমন গালিগালাজ... পুলিশের চোদ্দোপুরুষের বাপ-বাপান্ত... শুনলেন মাথায় বরফ চাপিয়ে। জানতেন, ক্ষোভের বাষ্পটা যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে, তত দ্রুত বডিটা তুলে পোস্টমর্টেম পাঠানো যাবে। শুরু করা যাবে তদন্তের কাজ।

এসপি প্রতিশ্রুতি দিলেন, থানার টহলদারি ব্যবস্থা রাত থেকেই ঢেলে সাজানোর। নিশ্চয়তা দিলেন, মামলার তদন্তে পদস্থ আধিকারিকদের নেতৃত্বে আজই গঠন করা হবে 'সিট' (স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম)। অবরোধ উঠল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কথা-চালাচালির পর। রাস্তা একটু ফাঁকা হওয়ার পর এগোতে পারলেন পুলিশ সুপার। 'বডি' অবধি যেতেই পারেননি এতক্ষণ।

বছর চল্লিশের মহিলার দেহটা গলিতে পড়ে আছে নিথর। আটপৌরে শাড়ি পরনে। মাথা

BanglaBook.org

চন্দনা দাস

চুরমার হয়ে গেছে আঘাতের তীব্রতায়। অস্ত্রের আঘাত নয়। অনেক উঁচু থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ার আঘাত। মৃত্যু যে এসেছে মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সেটা বুঝতে অন্তত ময়নাতদন্তের প্রয়োজন হয় না। শরীরের অন্য কোথাও কোনও আঘাতের আভাস নেই।

রক্তাক্ত দেহটা যখন পুলিশ গাড়িতে তুলছে, মিডিয়া ছবি তুলছে খচখচ, জনতার ভিড়কে কোনওক্রমে ঠেকিয়ে রাখছে পুলিশি ব্যারিকেড, এসপি-র মনে পড়ে যায় সেই মাঝবয়সি ভদ্রলোকের কথা। যিনি একটু আগেই বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলছিলেন, 'শুনুন সাহেব, আমি জন্মেছি এই পাড়ায়। এমন ঘটনা এই এলাকায় কখনও ঘটেনি। আপনার পুলিশ আছে কী করতে?'

সত্যি বলতে, ভদ্রলোক একটু কমিয়েই বলেছেন। এই কাঁচড়াপাড়ায় কেন, রাজ্যেই এমন ঘটনা অদূর বা সুদূর অতীতে ঘটেছে আর?

বীজপুর থানা। কেস নম্বর ৩২/২০০৮। তারিখ, ২১ ফেব্রুয়ারি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায়। ডাকাতি এবং তার সঙ্গে খুনও।

কাঁচড়াপাড়া বাজারের একেবারে কেন্দ্রস্থলেই বিমল দাসের চারতলা বাড়ি। পঁয়তাল্লিশ বছরের বিমল পেশায় স্বর্ণব্যবসায়ী। এই বাড়িটা কিনেছেন তা প্রায় সাত-আট মাস হল। খোলনলচে বদলে দিয়ে বাড়িটা সাজাচ্ছেন নতুন করে। মাসখানেক ধরে মিস্ত্রিদের নিত্য যাওয়া-আসা। দিনভর ছুতোরের ঠুকঠাক।

একতলায় 'বি দাস অ্যান্ড সন্স' নামে সোনার দোকান। দোকানের একেবারে লাগোয়াই ওয়ার্কশপ, যেখানে কারিগররা কাজ করে। দোকানের শেষ প্রান্তে একটা দরজা। যেটা খুললে উপরে উঠে যাওয়ার সিঁড়ি। দোকানের মধ্যে দিয়ে ছাড়া উপরে যাওয়ার রাস্তা নেই আপাতত।

বাড়ির লোক বলতে বিমল নিজে, স্ত্রী চন্দনা আর দুই ছেলেমেয়ে। দু'তলা আর তিনতলায় এখন কেউ থাকে না। ওখানে কাঠের কাজ চলছে। কাজ চলছে আসবাবপত্র পালিশেরও। চারতলায় সপরিবারে থাকেন বিমল। তিনটে ঘর। সঙ্গে ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং। একটা ঘরে বিমল

BanglaBook.org

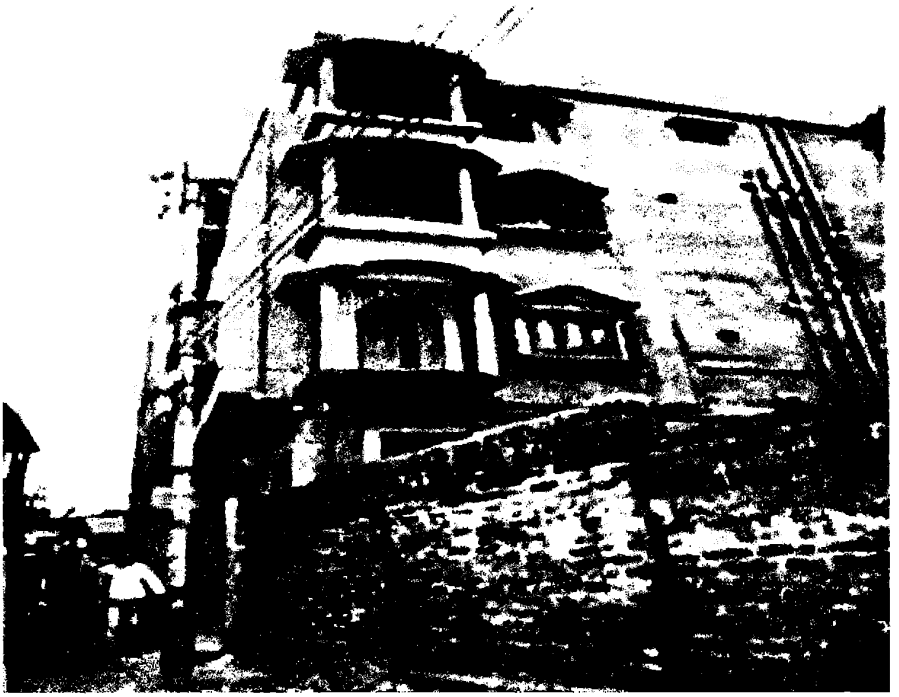

বিমল দাসের সেই চারতলা বাড়ি

আর চন্দনার সঙ্গে শোয় আট বছরের ছেলে বিদ্যুৎ। অন্য একটা ঘরে থাকে আঠারো বছরের মেয়ে অনিন্দিতা। একটা ঘর খালিই পড়ে থাকে। আত্মীয়স্বজন এসে পড়লে ব্যবহার হয় কদাচিৎ। চারতলাটাও যে পুরোপুরি তৈরি, এমন নয়। এখনও অসম্পূর্ণই। বিমলদের থাকার অংশটার পাশে অনেকটা জায়গা এখনও খোলা ছাদ। ঘরে ঢোকার দরজাটা ছাদ-সংলগ্ন। দরজার স মনে কোলাপসিবল গেট।

শোয়ার ঘরের লাগোয়া বারান্দাতেও এখনও গ্রিল বসানো হয়নি। স্রেফ ঢালাই হয়েছে। ভারা বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজ করছে দিনরাত। বিমলের ভাবাই আছে, দু'তলা-তিনতলাটা তৈরি হয়ে গেলে নীচে নেমে আসবেন সপরিবার। ওয়ার্কশপটা প্রয়োজনে চারতলায় তুলে আনবেন।

দোকান আর বাড়ি মিলিয়ে কুড়িজন কর্মচারী। যারা বাড়ির কাজকর্ম করে, তারা কেউ স্থায়ী নয়। রোজকার কাজ করে চলে যায়। কর্মচারীরাও রাত সাড়ে আটটা-ন'টার মধ্যে দোকান বন্ধ হয়ে গেলে যে যার বাড়ি চলে যায়। শুধু বহুদিনের পুরনো কর্মচারী কাম ম্যানেজার নিরঞ্জন পাল প্রায় প্রতি রাতই ওয়ার্কশপের ঘরে কাটান। ২০ ফেব্রুয়ারির রাতে রোজকার মতোই দোকানের

BanglaBook.org

ঝাঁপ পড়ার পর নিরঞ্জন সব তালা বন্ধ করে চাবির গোছা বিমলকে চারতলায় দিয়ে আসেন সোয়া ন'টা নাগাদ। তারপর এসে শুয়ে পড়েন ওয়ার্কশপে। আরেকজন কর্মচারী, অভিজিৎ ভৌমিকও সে-রাতে ওয়ার্কশপে থেকে গিয়েছিলেন কাজের চাপ বেশি থাকায়।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে বিমলদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গিয়েছিল। স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে বিমল শুয়ে পড়েছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে, মেয়ে তাই নিজের ঘরে রাত জেগে পড়াশুনো করছিল। এর পরের ঘটনাক্রম? থাকুক বিমলের নিজের বয়ানে।

'আমার ঘুম ভেঙে গেছিল কুকুরের চিৎকারে। একটানা ঘেউঘেউ করেই চলেছিল কুকুরগুলো। বিছানা থেকে উঠলাম। ভাবলাম, একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। ঘরের আর ছাদের দিকের আলো জ্বালিয়ে ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথরুমে গেলাম। বেরিয়ে দেওয়াল-ঘড়িটা দেখলাম। সাড়ে তিনটে বাজে। ছাদের দিকের কোলাপসিবল গেটের কাছে কেমন যেন একটা খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে শুনতে পেলাম। কারা যেন ফিসফাস কথাবার্তাও বলছে। সন্দেহ হল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারতেই দেখি, গেটের সামনে চার-পাঁচজন লোক। হাতে পিস্তল-বন্দুক। শাবল দিয়ে কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙার চেষ্টা করছে! আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। "ডাকাত! ডাকাত!" বলে চিৎকার করে ঘুম ভাঙালাম চন্দনার। ছেলেও উঠে পড়ল হইহল্লায়। আমি চন্দনাকে বললাম শোয়ার ঘরের বারান্দা দিয়ে "ডাকাত! ডাকাত!" চিৎকার করতে, যাতে পাড়াপ্রতিবেশী শুনতে পায়। চন্দনা ব্যালকনির দিকের দরজা খুলে বেরতেই দেখলাম বারান্দাতেও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। ওদের হাতেও পিস্তল। চন্দনা আঁতকে উঠে "ডাকাত" বলে চিৎকার করতেই ওরা চন্দনার মুখ চেপে ধরল।

'চন্দনা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমি ভয়ে স্ট্যাচু হয়ে গেছিলাম। ছেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল। তারপর যা ঘটল, দেখে আমরা কথা হারিয়ে ফেললাম। ধস্তাধস্তির মধ্যে ওদের একজন চন্দনাকে বারান্দার ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে উপর থেকে নীচে ঠেলে ফেলে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল পুরোটা। চন্দনা আমাদের চোখের সামনে চারতলা থেকে পড়ে গেল।

'বারান্দায় দাঁড়ানো ওই তিনজন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকে মূল দরজাটা খুলে দিল। ততক্ষণে বাইরের কোলাপসিবল গেটের তালা ডাকাতরা ভেঙে ফেলেছে। আরও চার-পাঁচজন খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক বা পিস্তল... যে কোনও একটা আর্মস ছিল। একজনের বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে গুলি-লাগানো বেল্ট ছিল। চম্বলের ডাকাতদের যেমন থাকে সিনেমায়, অনেকটা সেরকমই।

'ঘরে যে ক'জন ছিল, তাদের তিন-চারজনের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। বাকিদের মুখ খোলা। ওদের মধ্যে একজন আমার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বলল, "দুকান কি চাবি দো জলদি... নেহি তো জান সে মার ডালুঙ্গা।" ওদের বেশিরভাগই জড়ানো হিন্দিতে কথা বলছিল। দু'-একজন অবশ্য স্পষ্ট বাংলা বলছিল।

BanglaBook.org

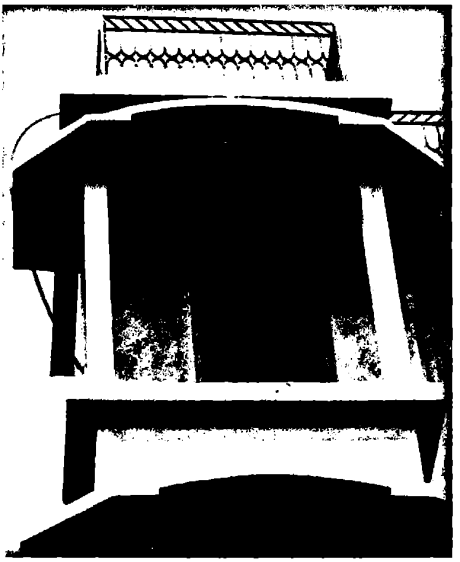

এই সেই বারান্দা

'ডাকাতরা আমাকে আর ছেলেকে বন্দুক ঠেকিয়ে নীচে নিয়ে গেল। ওয়ার্কশপের ঘরের সামনে এনে বলল ঘরটা খুলে দিতে। আমি ওয়ার্কশপের দরজায় ধাক্কা দিয়ে নিরঞ্জনকে ডাকাডাকি করলাম। নিরঞ্জন ভিতরে আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলল। ডাকাতরা ঢুকে পড়ে ওয়ার্কশপ তছনছ করা শুরু করল। অনেকটা সময় থাকল ভিতরে। ওখানে যা গয়নাগাটি ছিল, নিয়ে নিল।

'এরপর আমাকে নিয়ে দোকানের শাটারের কাছে এল। সেখানে এসে দেখি, আরও তিন-চারজন ডাকাত আগে থেকেই মজুত। এবং তারা শাটার ভেঙে ফেলেছে। ভাঙা শাটারের নীচ দিয়ে ডাকাতরা আমাকে আর ছেলেকে নিয়ে দোকানে ঢুকল। আমাকে আলো জ্বালতে বলল দোকানের। আমি জ্বেলে দিই। এরপর আমাকে একজন পরিষ্কার বাংলায় বলল, "শালা সিন্দুকের চাবি চিনিয়ে দে, না হলে তোর সামনেই ছেলেকে গুলি করে মারব।"

'ওরা যা বলছিল, আমি যন্ত্রের মতো করে যাচ্ছিলাম। সিন্দুকের চাবি দেখিয়ে দিলাম। ওরা সিন্দুক আর শোকেসের ড্রয়ার খুলে সমস্ত সোনা এবং রুপোর গয়না বের করে পলিথিনের ব্যাগে ভরে নিল। কিচ্ছু বাদ রাখল না। অন্তত ঘণ্টাখানেক ধরে সব হাঁটকাল। তারপর দোকানের বাইরে নিয়ে এসে আমাদের শাসাল একবার। স্টেশনের দিকে তারপর চলে গেল পায়ে হেঁটে। ভোর হয়ে গেছে তখন। আমি, নিরঞ্জন আর অভিজিৎ ছুটলাম বাড়ির পিছনদিকে। দেখলাম, বাড়ির পিছন দিকের গলিতে রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দনা পড়ে আছে।

'দেখে যা মনে হয়েছিল, ওদের বেশিরভাগের বয়স পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের কাছাকাছি হবে। আমি কয়েকজন ডাকাতকে ভালভাবে দেখেছি, যাদের মুখ ঢাকা ছিল না। একজনের অবশ্য বয়স তুলনায় কমের দিকে ছিল। মুখটা বেশ বাচ্চা-বাচ্চা। একজন ছিল চৌকোমুখের। আরেকজনের চোখদুটো মনে আছে। যেন কোটরে ঢোকা। একটা লোক সামান্য ভারী চেহারার ছিল। বেঁটে। চুল পাতলা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এ বারান্দায় ছিল। এর মুখটা স্পষ্ট মনে আছে। এই লোকটাই চন্দনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। একেই দলটার লিডার মনে হয়েছিল। বাকিদের সঙ্গে ধমকে কথা বলছিল।'

BanglaBook.org

নিরঞ্জন আর অভিজিতের বয়ানও হুবহুই মিলে গেল বিমলের সঙ্গে। বিদ্যুতের সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই ছিল না। আট বছরের ছেলে। চোখের সামনে মা-কে বারান্দা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে দেখেছে ডাকাতদের। প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছে। কেঁদেই চলেছে দিদির কোলে মাথা রেখে। 'দিদি'কে জিজ্ঞেস করা হল, 'রাত্রে কিছু টের পাওনি?'

—না... প্রায় রাত দুটো অবধি পড়াশুনো করে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার কানে আসেনি কিছু।

দোকান আর ওয়ার্কশপ একরকম ফাঁকাই করে দিয়ে গেছে ডাকাতরা। কত টাকার গয়না লুঠ হয়েছে? এফআইআর-এ বিমল যা লিস্ট দিয়েছেন, কমপক্ষে লাখ বিশেক টাকার মাল তো গেছেই। শোয়ার ঘরের টেবিলে পড়ে থাকা চন্দনার মোবাইল ফোনটাও নিয়ে গেছে ডাকাতরা। বিমলের ফোনটা বেঁচে গেছে। অত গয়নাগাটি লুঠের ফাঁকে ডাকাতরা বিমলের ফোনটা নেওয়ার কথা খেয়াল করেনি সম্ভবত।

কীভাবে চারতলায় উঠেছিল ডাকাতরা, সেটা স্পষ্ট। বাড়ির পিছনের দিকে বাঁশের ভারা বাঁধা ছিল মাসদেড়েক ধরে। ডাকাতরা ছাদে উঠেছিল সেখান দিয়েই। উঠে একটা দল ছাদের খোলা অংশ দিয়ে চলে গিয়েছিল শোয়ার ঘরের লাগোয়া বারান্দায়। আরেক দল চারতলার কোলাপসিবল গেট ভাঙার চেষ্টা করছিল। বিমলের বয়ান অনুযায়ী, সবাই উপরে ওঠেনি। একতলায় দোকানের শাটার ভাঙার কাজে হাত লাগিয়েছিল আরও জনাচারেক।

ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে দেখে আরও বোঝা গেল, চন্দনাদেবীর দেহ বাড়ির পিছনের যে গলিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল, আদতে সেখানে তিনি পড়েননি। পড়েছিলেন বড় রাস্তার উপর। সেখানে রক্তের দাগ ছিল জমাট বেঁধে। বেরিয়ে এসেছিল ঘিলুর কিছু অংশ। পালিয়ে যাওয়ার সময় দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে ডাকাতরাই গলিতে রেখে গিয়েছিল। রাস্তার রক্তের রেখায় সে গতিপথ স্পষ্ট।

ফরেনসিক টিম পৌঁছে গেছে। চারতলা বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি জরিপ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিস্তারিত সিজ়ার লিস্ট তৈরির। জেলা পুলিশের 'এভিডেন্স রিকভারি ভ্যান'-ও এসে গেছে। কিন্তু 'এভিডেন্স' অক্ষত থাকলে তবে না 'রিকভারি'? ঘটনাস্থলের পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক পরীক্ষার আগেই যদি শ'খানেক বাইরের লোক সেখানে চলাফেরা করে যত্রতত্র, জিনিসপত্র ছুঁয়ে দেখে ইচ্ছেমতো, অপরাধীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফুটপ্রিন্ট পাওয়ার সম্ভাবনার বারোটা বেজে যায়। বহু লোকের হাত-পায়ের ছাপে তালগোল পাকিয়ে যায় সব। ঠিক যেমনটা হল বাড়ির ফরেনসিক পরীক্ষার সময়।

পুরো বাড়িটায় স্থানীয় কৌতূহলী জনতা যেমন খুশি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়িয়েছে ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর। দোকানের শোকেস বা ওয়ার্কশপের মেশিনে অসংখ্য হাত পড়েছে অসংখ্যবার। নষ্ট হয়ে গেছে নির্দিষ্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট চিহ্নিত করে সংগ্রহ করার সুযোগ। তন্নতন্ন

BanglaBook.org

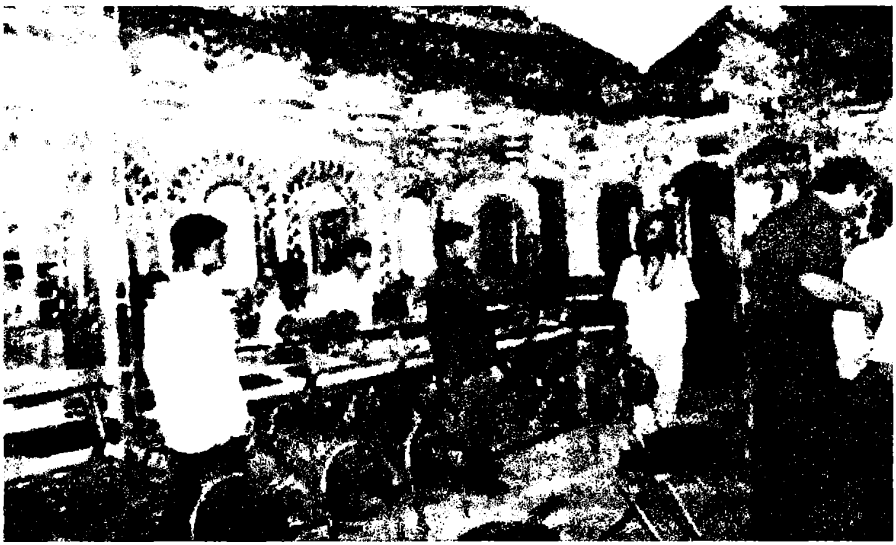

ঘটনার পরের দিন বিমলের সোনার দোকানে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা

করে খুঁজে সম্ভাব্য অপরাধীদের হাতের আর পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া গেল চারতলার ফ্রিজে, আলমারিতে। কিছু সংগ্রহ করা হল দোকানের শোকেসের একেবারে উপরের দিকের র‍্যাকগুলো থেকে, যেখানে ঘটনা-পরবর্তী ভিড়ের হাত পৌঁছয়নি।

চারতলার কোলাপসিবল গেট আর নীচে দোকানের ভাঙা শাটার থেকে সংগৃহীত হল 'tool marks'। সহজ ভাষায় বলি। ধরুন, একটা হাতুড়ি দিয়ে কোনও কিছুর উপর আঘাত করা হল। ধরুন, তালা ভাঙার জন্যই হাতুড়ি-পেটা। ভেঙে যাওয়া তালার উপর একটা দাগ থেকে যাবেই হাতুড়ির। বিজ্ঞানের একেবারে স্বাভাবিক নিয়ম। যা দিয়ে কোনও কিছুর উপর আঘাত করা হয়, তার একটা চিহ্ন থেকেই যায় লক্ষ্যবস্তুর উপর। সেই দাগ বা চিহ্নই হল 'টুল মার্কস'। যা থেকে ফরেনসিক পরীক্ষায় আন্দাজ করা যায়, ঠিক কী জাতীয় বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। সুবিধে হয় তদন্তে। সুবিধে হয় কিনারা-উত্তর পর্যায়ে অভিযুক্তের দোষ প্রমাণে।

সিজ়ার লিস্ট তৈরি করা হল সময় নিয়ে। লম্বা তালিকা। যার মধ্যে তিনটে জিনিস বিশেষ উল্লেখের দাবি করে।

এক, চারতলায় ফ্রিজের উপর পড়ে থাকা একটা তেলের শিশি। যার উপরে হিন্দি লেবেলে লেখা 'হিমতাজ'। লেবেলে বাকি যা কিছু লেখা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের নাম-টাম পড়া গেল না কিছু। শুধু হিন্দিতে 'উত্তরপ্রদেশ' শব্দটা ছাড়া। শিশি খুলতেই একটা

BanglaBook.org

উৎকট গন্ধ ছিটকে এল। বীজপুর থানার যে অফিসাররা তৈরি করছিলেন সিজ়ার লিস্ট, তাঁদের একজন বলেই ফেললেন, 'এ জিনিস লোকে গায়ে-মাথায় মাখে কী করে? গন্ধেই তো ভূত পালানোর জোগাড়!'

এই ব্র্যান্ডের তেল ব্যবহার করেননি কস্মিনকালেও, জানালেন বিমল। এমন কি হতে পারে, বাড়িতে যে মিস্ত্রিরা কাজ করছে, শিশিটা তাদের কারও? বিমল বললেন, 'কোনও চান্স নেই। চারতলায় মিস্ত্রিরা কাজ করে ঘরের বাইরে। ছাদের অংশে মূলত। ভিতরে ঢোকার দরকার প্রায় পড়েই না।' আর ঢুকলেও তেলের শিশি নিয়ে ঢুকবেই বা কেন, আর ঢুকলেও ফেলেই বা রেখে যাবে কেন? এই শিশি ছিল না কাল রাতে ফ্রিজের উপর, বিমল বললেন একশো শতাংশ নিশ্চিত ভঙ্গিতে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই, তেলের শিশি ডাকাতরাই সঙ্গে এনেছিল নির্ঘাত। ফেলে গেছে তাড়াহুড়োয়।

দুই, ওয়ার্কশপের এককোণে পড়ে থাকা দুটো শাবল। একটা পলিথিনের ব্যাগ। নিশ্চিত, ডাকাতদেরই ফেলে যাওয়া। শাবল দুটোয় পাওয়া গেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট।

তিন, দোকানের একটা আলমারির পাশে পড়ে থাকা একটা ভাঁজ করা কাগজ। ভাঁজ খুলে দেখা গেল, ওটা আসলে ম্যাপ। কাঁচা হাতে পেনসিলে আঁকা। কিসের ম্যাপ? বিমলের চারতলা বাড়ির। কোন তলায় কোথায় কী, ম্যাপে চোখ বোলালে জলবৎ তরলং।

ও হ্যাঁ, বলা হয়নি, ব্যারাকপুরের পুলিশ ট্রেনিং কলেজ থেকে সকালেই তলব করা হয়েছিল ডগ-স্কোয়াড-এর পিঙ্কিকে। পিঙ্কি ঘুরেছিল পুরো চত্বরটা। শুঁকে দেখেছিল ডাকাতদের ফেলে যাওয়া পলিথিন ব্যাগ আর 'হিমতাজ' তেলের শিশি। বাড়ির সামনের যে রাস্তাটা সোজা চলে যাচ্ছে কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের দিকে, পিঙ্কি ছুটেছিল সেদিকে। স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে থমকে গিয়েছিল। ডাকাতরা যে রেলপথেই পালিয়েছে, সেটা এমনিতেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল। পিঙ্কির গতিবিধি সেই আন্দাজকে আরও জোরালো করেছিল।

ডাকাতিতে বাধা দিতে গিয়ে গৃহবধূ খুন। শুধু খুন নয়, চারতলা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নৃশংসতম খুন। স্থানীয় থানা থেকে মাত্র দুশো মিটার দূরত্বে! শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্যে। মিডিয়ার দৈনন্দিন হইহই তো ছেড়েই দিলাম, পুলিশের উপর উত্তুঙ্গ চাপ তৈরি হচ্ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির তরফেও। ঘটনার দ্রুত সমাধানের দাবি নিয়ে থানা ঘেরাও, এসপি-র অফিসে ডেপুটেশন, এলাকায় ব্যবসায়ী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া, 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে একজোট হন' জাতীয় লিফলেট বিলি করা—কিছুই বাকি ছিল না।

অ্যাডিশনাল এসপি আর এসডিপিও-র নেতৃত্বে জেলার বাছাই করা অফিসারদের নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেও সামলানো যাচ্ছিল না ওই বহুমুখী চাপ। যা হট্টগোল চলছিল চন্দনা-হত্যা নিয়ে, আঁচ পৌঁছেছিল রাইটার্সেও। ঘটনার পরোত্তর ঘণ্টার মধ্যে জারি হয়েছিল আইসি বীজপুরের বদলির আদেশ। নতুন আইসি হিসেবে ২৫ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নিয়েছিলেন

BanglaBook.org

নৃশংসতার ভোর

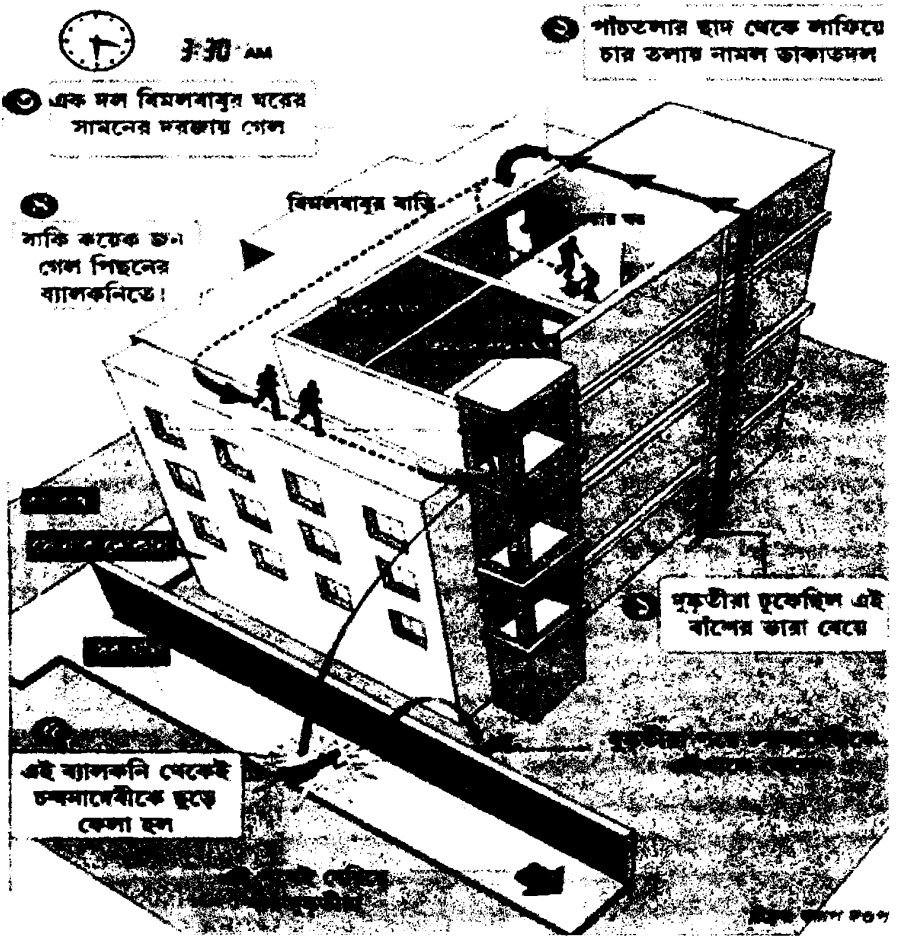

ঘটনার পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রাফিক্স

ইনস্পেকটর প্রবীর সান্যাল। সিআইডি-তে অনেকটাই কেটেছে যাঁর কর্মজীবন, যাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল বহু জটিল কেসের সমাধানে।

শুরুর দিনতিনেক তদন্তের ভার ছিল বীজপুর থানার সাব-ইনস্পেকটর মনিরুল ইসলাম সরকারের উপর। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে থানার চার্জ নেওয়ার দিনই তদন্তভার প্রবীরকে দিয়েছিলেন পুলিশ সুপার, 'এমন কেস তো রোজ রোজ হয় না প্রবীর... তাই আপনাকে দিলাম... বুঝতেই তো পারছেন, এই কেসটা দ্রুত ডিটেক্ট করে কনভিকশন না করাতে পারলে আমরা

BanglaBook.org

কেউই মুখ দেখানোর জায়গায় থাকব না। যারা এভাবে মেরে ফেলল এক মহিলাকে, তাদের যদি শাস্তি না দেওয়া যায়...।' কথা শেষ করেননি এসপি। করার দরকারও ছিল না। প্রবীর দিব্যি শুনতে পেয়েছিলেন না-বলা শব্দগুলো, 'তা হলে আর চাকরি করে কী লাভ?'

স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সঙ্গে ঘটনার দিন থেকেই রোজ অন্তত ঘণ্টাতিনেক বসছিলেন পুলিশ সুপার। বীজপুর থানাতেই দিনের সিংহভাগ কাটাচ্ছিলেন। কী কী জানা যাচ্ছে আপাতত, কী কী জানার আছে আরও, কী কী করণীয় এখন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছিল সবটা।

প্রথম কথা, বিমল-নিরঞ্জন-অভিজিৎদের বয়ান থেকে পাওয়া যাচ্ছে, গ্যাংটা ছিল মোটামুটি বারো-চোদ্দো জনের। কিছু লোক হিন্দিতে কথা বলছিল। কয়েকজন বাংলায়। তিন-চারজনের মুখ ঢাকা ছিল। অর্থাৎ, যদি ভিনরাজ্যের গ্যাংই হয়, সঙ্গে বঙ্গভাষী দুষ্কৃতীও ছিল, যাদের স্থানীয় হওয়ারই সম্ভাবনা। লোকাল গ্যাং হলেই সাধারণত মুখ বেঁধে ক্রাইম করে। যাতে চেহারার বর্ণনা শুনে পুলিশ চট করে 'আইডেন্টিফাই' না করতে পারে।

তা ছাড়া বিমলের বাড়ির নকশা যখন পাওয়া গেছে, এমন কেউ বা কারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে, যার বা যাদের যাতায়াত ছিল বাড়িতেও। যে বা যারা জানত নিখুঁত, কোথায় কী আছে। কে বা কারা? বাড়ির কাজের লোক হতে পারে। দোকানের কর্মচারী হতে পারে। বাড়িতে কাজ হচ্ছিল দু'মাস ধরে। রোজ অনেক মিস্ত্রির যাতায়াত ছিল। তাদেরও কেউ হতে পারে।

তালিকা তৈরি করতে হবে সবার, যাদের পক্ষে সম্ভব বাড়ির নকশা বানানো বা বানাতে সাহায্য করা। বাড়ির কাজের মাসি, দুধওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা, জমাদার... কেউ যেন বাদ না যায়। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। মিস্ত্রিদের তালিকা তৈরি করে 'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক' দরকার। কল ডিটেলসও নিতে হবে সবার। কোনও কর্মচারীকে কি বিমল সাম্প্রতিক অতীতে ছাঁটাই করেছিলেন? সেই থেকে কোনও শত্রুতার অ্যাঙ্গল? খবর নেওয়া দরকার আত্মীয়-পরিজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপারে। কাদের কাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল বিমলদের বাড়িতে, সেটুকু অন্তত জানতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু তিন-চারজনের বর্ণনা আপাতত পাওয়া যাচ্ছে তিনজনের বয়ানে, যার ভিত্তিতে 'পোর্ট্রেট পার্লে', অর্থাৎ ছবি আঁকানোর চেষ্টা করা যায়। দেখলে বাচ্চা-বাচ্চা মনে হয় এমন একজন। চৌকোটে মুখ একজনের। কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখের আরেকজন। ভারী চেহারা, পাতলা চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির একজন। বাকিদের মধ্যে যাদের মুখ বাঁধা ছিল না, তাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে মোটামুটি একই উত্তর আসছে তিনজনের থেকে, 'এত ভয় পেয়ে গেছিলাম, ডিটেলে খেয়াল করার মতো অবস্থা ছিল না।' বটে, কিন্তু যাদের বর্ণনা দিতে পারছেন, তাদেরই বা ডিটেল কোথায় সেভাবে? চৌকোটে মুখ বা বাচ্চা-বাচ্চা দেখতে বা অল্প চুলের ভারী

BanglaBook.org

চেহারার লোক... এমন শ'খানেক লোক তো এই কাঁচড়াপাড়াতেই খুঁজলে পাওয়া যাবে। তবু যা পাওয়া গেছে, তা-ই সই। বর্ণনা অনুযায়ী ছবি আঁকানো হোক সিআইডি-তে বিমলদের পাঠিয়ে। সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হোক সোর্সদের মধ্যে।

তিন নম্বর, চন্দনার মোবাইলটা নিয়ে গেছে ডাকাতরা। তারপর থেকেই বন্ধ। প্রত্যাশিতভাবেই। আইএমইআই (international mobile equipment identity। প্রতিটি মোবাইল ফোনের জন্য নির্দিষ্ট 'ইউনিক' বা অনন্য নম্বর, যা সাধারণত ফোনের ব্যাটারির পিছনে লেখা থাকে) মার্চে দিয়ে রাখতে হবে লুঠ হওয়া মোবাইলের নম্বরটা। আজ-কাল-পরশু-তরশু বা এক-দু'মাস পরে, মোবাইলটা খুলে যখনই কেউ ওতে অন্য সিম ভরে ফোন চালু করবে, আইএমইআই নম্বরের সূত্রে জানা যাবে ফোনের অবস্থান।

মোবাইল ফোনের ঘাঁতঘোঁত সবাই মোটামুটি জেনেই গেছে আজকাল। সিম না বদলে চুরি করা ফোন ব্যবহার করার বোকামো ছিঁচকে মোবাইল চোররাও করে না। আর এরা তো ডাকাতদের গ্যাং পুরোদস্তুর। সুতরাং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, ফোন কখন চালু হয়, কখন ঢোকানো হয় অন্য সিম। মোবাইলটা যে নিয়ে গেছে, এটা একদিক থেকে খুবই আশাপ্রদ তদন্তের পক্ষে। ভাল হয়েছে, নিয়ে গেছে। একবার ফোনটা চালু হলেই তৎক্ষণাৎ চালু হবে প্রযুক্তি-প্রহরা।

চার নম্বর, এই ধরনের দুঃসাহসিক ডাকাতি কোনও নতুন আনকোরা গ্যাংয়ের কাজ নয়। যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, অন্য রাজ্যের কোনও পেশাদার ডাকাতদল স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে কাজটা করেছে। বিমলরা বলেছেন, ডাকাতদের একজনের গায়ে টোটাভরতি চামড়ার বেল্ট ছিল। যেমনটা দেখা যায় সিনেমায়, চম্বলের ডাকাতদের শরীরে। বন্দুক নিয়ে, গব্বর সিং স্টাইলে গুলিভরতি বেল্ট নিয়ে এভাবে ডাকাতি শেষ কবে হয়েছে এ রাজ্যে? আদৌ হয়েছে? যদি বা হয়েও থাকে, কোথায় হয়েছে? কিনারা হয়েছিল? খোঁজ নিতে হবে। দলটা যে অত্যন্ত বেপরোয়া, সন্দেহাতীত। না হলে সামান্যতম প্রতিরোধেই এভাবে নির্মম নির্বিকার ছুড়ে ফেলে দেয় এক মহিলাকে!!! কোথাকার গ্যাং এরা?

ফ্রিজের উপর ডাকাতদের ফেলে যাওয়া তেলের শিশি ইঙ্গিত দিচ্ছে, গ্যাং সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের। শুধু হিন্দিতে কথা বলছিল বলে নয়। শিশির লেবেলের উপর 'উত্তরপ্রদেশ' লেখা আছে বলে নয়। অভিজ্ঞ তেল-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, শিশির উপর 'হিমতাজ'-এর যে লেবেলটা আছে, সেটা আসল 'হিমতাজ' তেলের নয়। ডুপ্লিকেট। এবং সেটা এ রাজ্যে বিক্রি হয় না। ব্র্যান্ডের জাল লেবেল বানিয়ে এই তেল অনেক কম দামে যথেচ্ছ বিকোয় উত্তরপ্রদেশ-বিহারে।

পয়েন্ট নম্বর পাঁচ, উত্তরপ্রদেশ হোক, বিহার হোক, যে রাজ্যই হোক, স্থানীয় দুষ্কৃতীদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা নিয়ে যখন ন্যূনতম সংশয়ও নেই, আপাতত 'ফোকাস' করতে হবে উত্তর ২৪ পরগনা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর উপর। হাওড়া-হুগলি-নদিয়া-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এমনকী বর্ধমান-বীরভূমেও গত চার-পাঁচ বছরে যা যা ডাকাতি হয়েছে, সিআইডি-তে গিয়ে রেকর্ড ঘেঁটে

BanglaBook.org

দেখতে হবে। ক'টার কিনারা হয়েছিল? কারা করেছিল? তারা এখন কোথায়? জেলে, না জামিনে বাইরে? বাইরে থাকলে সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্পর্কে খবর নিতে হবে।

সিটের সদস্যদের তো বটেই, জেলার সমস্ত ওসি-কেও বলা হল, যার যেখানে যা সোর্স আছে, সবাইকে কাজে লাগাতে হবে মরণবাঁচন ক্ষিপ্রতায়। যেভাবেই হোক, 'ব্রেক-থ্রু' চাই। জেলায় এবং সিআইডি-র ক্রাইম রেকর্ডস সেকশনে পুরনো দাগি ডাকাতদের যত ছবি আছে, দেখানো হল বিমল-নিরঞ্জন-অভিজিৎকে, 'এদের মধ্যে কেউ ছিল কি?' বিমলরা চিনতে পারলেন না।

অবশ্য বিমল যা বলছেন, সেটাকেও ধ্রুবসত্য বলে ধরে নেওয়া যাচ্ছিল না আর। 'ক্রাইম রিকন্সট্রাকশন' এই জাতীয় মামলায় অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা যাতে নির্ভুল হয়, তাই ডাকাতির দিনই শুধু নয়, তার পরের দু'দিনও বিমলকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিবারই বয়ানের কিছু না কিছু বদলাচ্ছিলেন। ঘটনার দিন বলেছিলেন, তিন-চারজনের মুখ বাঁধা ছিল। তার দু'দিন পর বললেন, 'সাত-আটজনের মুখে কাপড় ছিল।' আগে যে অন্য কথা বলেছিলেন?—'মাথার ঠিক ছিল না ওভাবে ডাকাতি হওয়াতে। ওভাবে স্ত্রী-কে চোখের সামনে ফেলে দিতে দেখে। শকের মধ্যে ছিলাম।'

'শক' পাওয়ার মতোই ঘটনা, কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এত কিছু যে ঘটে গেল, মেয়ের ঘুম ভাঙল না? পাড়াপ্রতিবেশীরাও আঁচ পেলেন না কিছু? বিমলের জবাব, 'মেয়ে অনেক রাত অবধি পড়ার পর অঘোরে ঘুমচ্ছিল। আমরা তো দু'-তিনবার ''ডাকাত ডাকাত'' বলার পর আর কিছু বলার সুযোগই পাইনি।' বেশ, হতেই পারে। কিন্তু স্থানীয় সোর্স মারফত একটা খবর আসছিল, মাসকয়েক আগে চন্দনার নামে নাকি আশি লক্ষ টাকার লাইফ ইনশিয়োরেন্স করেছেন বিমল। এত টাকার বিমা হঠাৎ? বিমল সরাসরি অস্বীকার করলেন, 'প্রশ্নই ওঠে না এমন কোনও ইনশিয়োরেন্সের! এসব আমার শত্রুপক্ষ রটাচ্ছে।'

শত্রুপক্ষ বলতে? বিমলের ব্যাখ্যা, প্রচুর পরিশ্রমের ফলে তাঁর ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটেছে। চারতলা বাড়ি কিনেছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ প্রবল ঈর্ষান্বিত। তারাই রটাচ্ছে যত আজগুবি খবর।

যা রটে, তার কিছু কি বটে? ডাকাতিটা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিমল কি জানতেন, ডাকাতিটা হবে? চেয়েছিলেন, ডাকাতিটা হোক? চন্দনাকে তো আঘাত করেও চুপ করিয়ে দেওয়া যেত। ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। বা মুখ বন্ধ করে দেওয়া যেত প্রাণের ভয় দেখিয়ে, যেমন বিমলকে করা হয়েছিল। একেবারে নীচে ছুড়ে ফেলার মতো মরিয়া কাজ ডাকাতরা করতে গেল কেন? সত্যি-মিথ্যে এখনও যাচাই করা যায়নি, তবে বিমলের পরকীয়াজনিত কিছু খবরও বাতাসে ভাসছে। চন্দনার বেঁচে থাকা কি অসুবিধেজনক হয়ে উঠছিল অন্য কোনও সম্পর্কের কারণে?

আর হ্যাঁ, গয়নাগাটি সবই নিয়ে গেছে ডাকাতরা, কিন্তু তাতে আর কতটা ক্ষতি হবে বিমলের?

BanglaBook.org

নিজেই তো বলেছেন, 'ইনশিয়োর' করা ছিল প্রায় সবটাই। আর একটা খটকা, চন্দনার মোবাইল নিয়ে গেল ডাকাতরা। বিমলেরটা কেন নিয়ে গেল না? অস্বাভাবিক নয়?

বিমল-বিদ্যুৎ বাদে ডাকাতির আর দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী, অভিজিৎ আর নিরঞ্জনের ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যাচ্ছে না। বারবার জেরা করা হয়েছে ওঁদের। বয়ান বারবার ওঁরাও বদলেছেন। আগে-পরের বয়ানে অসংগতির ব্যাখ্যা সেই একই, 'এত ভয় পেয়ে গেছিলাম যে, সব কিছু ভাল করে খেয়াল করার অবস্থাতেই ছিলাম না। যখন যেমন মনে পড়ছে, তেমনই তো বলছি স্যার।'

নিরঞ্জন লোকটি বিমলের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আছে। পরিবারের অংশই বলা যেতে পারে। যদি সত্যিই ডাকাতি ঘটানো হয়ে থাকে বিমলের জ্ঞাতসারে, তা হলে নিরঞ্জনেরও পুরো পরিকল্পনার শরিক হওয়াটা স্বাভাবিক। আর অভিজিৎ? তিরিশ বছরের যুবক। তিন বছর হল বিমলের ওয়ার্কশপে কাজ করছেন কারিগর হিসেবে। সেই রাতে সত্যিই কি এতটা কাজের চাপ ছিল, যে বাড়ি না ফিরে ওয়ার্কশপেই থেকে যেতে হয়েছিল? না অন্য কারণ আছে, যা এখনও অজানা? অভিজিতের ব্যাপারে আরও খোঁজখবর প্রয়োজন।

মোট আটটা 'রেইড পার্টি' ঘটনার দিন রাতেই গঠন করে দিয়েছিলেন এসপি। যার প্রতিটির নেতৃত্বে ছিলেন পোড়খাওয়া ইনস্পেকটররা। টিমগুলো কোথায় কখন যাবে, কোন সোর্স ইনপুটটা কখন ফলো-আপ করবে, তার সমন্বয়ে ছিলেন এসডিপিও ব্যারাকপুর সুমনজিৎ রায়। পুলিশ সুপারের অগাধ আস্থা ছিল সুমনজিতের উপর। কারণও ছিল। মেধাবী এবং পরিশ্রমী এই অফিসারকে ক্রাইম ওয়ার্কে বরাবর সহজাত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে দেখেছেন।

জেলার এবং আশেপাশের সমস্ত সক্রিয় ডাকাতদলের তালিকা তৈরি করে শুরু হল নির্বিচার 'রেইড'। সামান্যতম সন্দেহ হলেই থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রতিটা টিমের সঙ্গে থাকছিল বাছাই করা সোর্সরা। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে ঘটনা ঘটেছিল। পরের বাহাত্তর ঘণ্টায় জেলা পুলিশের তল্লাশি-বাহিনী চষে ফেলেছিল জেলার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম। চষে ফেলেছিল হাওড়া-হুগলি-নদিয়া-দক্ষিণ ২৪ পরগনারও একটা বিস্তীর্ণ অংশ। অন্তত কুড়ি-বাইশ জন সন্দেহভাজনকে তুলে আনা হয়েছিল, যারা দাগি ডাকাত হিসেবে পরিচিত। লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করেও যাদের কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না কাঁচড়াপাড়ার ঘটনায় জড়িত থাকার।

প্রথম 'ব্রেক থ্রু'-র আভাস মিলল ২৬ ফেব্রুয়ারির রাতে। সোর্সের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে ঘোলা থানার তালবান্দা এলাকার একটা ভাড়াবাড়ি থেকে গভীর রাতের রেইডে গ্রেফতার হল ছয়জনের একটা গ্যাং। সূর্য গোলদার, বাবর আলি মণ্ডল, রতন ভরাই, সুরজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ মণ্ডল আর তাপস বিশ্বাস। ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত হল চারটে শাবল, দুটো দেশি পিস্তল এবং আটটা কার্তুজ। তবে আগ্নেয়াস্ত্র বা কার্তুজ নয়, উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠার উপাদান ছিল অন্যত্র।

BanglaBook.org

সূর্য গোলদারের একটা মাঝারি সাইজের টিনের সুটকেসে। যেটা খুলতেই বেরল চামড়ার বেল্ট, টোটা রাখার। ঠিক যেমনটা বলেছিলেন বিমল, 'একজনের গায়ে আড়াআড়িভাবে টোটাভরতি চামড়ার বেল্ট ছিল...।' এই বেল্টটায় অবশ্য টোটা ছিল না একটাও।

কেস তা হলে সমাধানের পথে? স্থানীয় গ্যাং বলতে তা হলে এরাই? কিন্তু লুঠের মাল? তন্নতন্ন করে খুঁজেও ঘর থেকে পাওয়া গেল না কিছু। গ্রেফতার করে বীজপুর থানায় নিয়ে গিয়ে চলল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশি জেরার যাবতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেও স্বীকারোক্তি এল না। হাজার চাপের মুখেও ভাঙা তো দূরের কথা, সামান্য মচকালও না কেউ, 'আমরা কিছু জানি না এই ডাকাতির ব্যাপারে, বিশ্বাস করুন স্যার।' সূর্য গোলদারকে চেপে ধরা হল, 'চামড়ার বেল্টটা তোর কাছে কী করে এল?' সূর্য একই কথা বলে চলল, 'এটা অনেকদিনের পুরনো। কল্যাণীতে একটা ডাকাতিতে কাজে এসেছিল। চাঁদনি মার্কেট থেকে শখ করে কিনেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু কাঁচড়াপাড়ার ডাকাতিতে ছিলাম না স্যার।'

ধৃত ছ'জনের ক্লোজ-আপ ছবি দেখানো হল বিমল-নিরঞ্জন-অভিজিৎকে। তিনজনের থেকেই একটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের উত্তর এল, 'মনে তো হচ্ছে এই দুটো লোক ছিল। তবে শিয়োর নই। আসলে কয়েকজনের মুখ বাঁধা ছিল তো... আর ভয়ে তো ওদের মুখের দিকে তাকাতেই পারিনি বেশিক্ষণ... যা করতে বলছিল, করে যাচ্ছিলাম শুধু।' দেখানো হল বেল্টটাও। যেটা দেখামাত্রই অবশ্য বিমল বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবিকল এইরকমই তো ছিল!' নিরঞ্জন-অভিজিৎ অত নিশ্চিত করে বলতে পারলেন না, 'ঠিক এমনটাই ছিল কি না মনে পড়ছে না স্যার!'

ছ'জনের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন নেওয়া হল সে-রাতের। আশ্চর্য, কাঁচড় পাড়ার ধারেকাছেও নেই কারও ফোনের অবস্থান! ২০ ফেব্রুয়ারির রাত থেকে ২১ ফেব্রুয়ারির ভোর পর্যন্ত সবার ফোনের লোকেশন ওই নিউ ব্যারাকপুর-ঘোলার আশেপাশেই।

সূর্য আর বাবর আলির বাড়ি নদিয়ার হরিণঘাটায়। ঘোলা থানার সাজিরহাটে বাকি চারজনের। ছ'জনকেই পুলিশি হেফাজতে নিয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হল। কিন্তু ফিরতে হল শূন্য হাতেই। 'রিকভারি' নেই। স্বীকারোক্তিও নেই। পুলিশ কাস্টডির মেয়াদশেষে সূর্যদের ঠাঁই হল জেলে, এই কেসে গ্রেফতার হওয়া সন্দেহভাজন হিসেবে।

চুরি-ছিনতাই-ডাকাতির কেসে সমাধানের মূল কথাই হল 'ফলেন পরিচয়তে'। মোদ্দা কথা, ধৃতদের কাছ থেকে চুরি-ছিনতাই হওয়া জিনিস উদ্ধার হলে তবেই নিশ্চিত হওয়া যায়, হ্যাঁ, কাজটা এরাই করেছে। 'রিকভারি' না হলে দাঁড়ায়ই না মামলা, সে ক্ষেত্রেই সন্দেহের কারণ থাকুক।

ঠিক সেটাই ঘটছিল সূর্যদের গ্রেফতারি নিয়েও। ওই চামড়ার বেল্ট উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ধরে নিয়েছিল, গ্যাং চিহ্নিতকরণের কাজটা হয়ে গেছে। এবার স্বীকারোক্তি আদায়, বাকিদের জালে তোলা এবং লুঠের মাল উদ্ধার স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বেল্ট উদ্ধারের খবর

BanglaBook.org

ফলাও করে প্রচার হয়েছিল মিডিয়াতেও, 'চন্দনা হত্যাকাণ্ডে ধৃত ছয়, উদ্ধার সেই বেল্ট'। কিন্তু মালপত্র কিছুই উদ্ধার না হওয়ায় সাধারণ মানুষ তো বটেই, পুলিশও ধন্দে পড়ে যাচ্ছিল। তা হলে কি এরা সত্যিই যুক্ত ছিল না? ভুল লোককে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই কেসে?

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। ঘুরে যাচ্ছিল সপ্তাহের পর সপ্তাহ। সূর্য গোলদারদের গ্রেফতারির পর তদন্তের অগ্রগতি একরকম থমকে গিয়েছিল বললেই চলে। 'রেইড' হচ্ছিল বটে এদিক-সেদিক। সোর্সরা যে যখন যা খবর দিচ্ছিল, যাচাই করা হচ্ছিল প্রত্যেকটাই। কিন্তু 'লিড' আর পাওয়া যাচ্ছিল কই?

এই 'কিছুতেই কিছু হচ্ছে না'-র সময়টায় যখন পুলিশ সুপার বিশেষ তদন্তকারী দলের কাজকর্মের পর্যালোচনা-বৈঠকে বসতেন, বুঝতে পারতেন, হতাশার ভাইরাসে ক্রমে আক্রান্ত হচ্ছে টিম। এবং একটাই কথা আউড়ে যেতেন নিয়মিত, 'ইংরেজিতে একটা কথা আছে। সবাই শুনেছ তোমরা। Fortune favours the brave. ভাগ্য বীরেরই সহায় হয়। পুলিশি তদন্তের ক্ষেত্রে কিন্তু 'fortune favours the perseverant.'

কথাটা নতুন নয়। জানাই আছে, জটিল মামলার তদন্তে ভাগ্য তাদেরই সহায় হয় যারা ধৈর্যের ফিক্সড ডিপোজিটে হাত দেয় না চরম সংকটেও। শুনতে শুনতে এক একসময় সুমনজিতের মনে হত, এসপি নেহাতই 'ভোকাল টনিক' দিচ্ছেন টিমের মনোবল অটুট রাখতে। আবার কখনও মনে হত, ভুল তো কিছু বলছেন না। মনে পড়ত কবীর সুমনের 'তিন তালের গান'-এর সেই লাইনটা, 'কখন কী ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না!' পরক্ষণেই আবার ভাবতেন, মাসদেড়েক হয়ে গেল ঘটনার পর। আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটছে আর কোথায়? ঘটবে আদৌ?

ঘটল। ভাগ্য সহায় হল এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের বিকেলে। যখন সুমনজিৎ রোজকার ফাইলে চোখ বুলোচ্ছেন অফিসে বসে। সাধারণত মোবাইল ভাইব্রেশন মোডে রাখেন। ফাইলে সই করতে করতেই টেবিলে রাখা ফোনে কম্পন টের পেলেন। চোখ রাখলেন স্ক্রিনে। 'আইসি বীজপুর কলিং'।

—হ্যাঁ, প্রবীর?

এত উচ্চগ্রামে প্রবীর কথা শুরু করলেন, ফোন রেখে দিয়ে 'হ্যালো' বললেও বোধহয় শোনা যেত বীজপুর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত।

—স্যার, একবার থানায় আসবেন?

—এখন? কেন, কী হল হঠাৎ?

—যে ফোনটা ডাকাতরা নিয়ে গেছিল, মানে চন্দনাদেবীর ফোনটা, সেটা বোধহয় অ্যাকটিভাইজড হয়েছে। যে দোকান থেকে বিমল ফোনটা কিনেছিলেন, তার মালিকের ফোনে একটা অদ্ভুত এসএমএস এসেছে লুঠ হওয়া ফোনটার নম্বর থেকে।'

BanglaBook.org

—কী এসএমএস?

—'প্লিজ হেল্‌প মি, আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার'।

—মানে?

—মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না স্যার... হু ইজ ইন ডেঞ্জার... কী হেল্‌প চাইছে... দোকানের মালিকের কাছেই বা কেন চাইছে... ভুতুড়ে ব্যাপার স্যার!'

—আসছি এখনই।

—আসুন স্যার... দোকানের মালিককে বসিয়ে রেখেছি।

সুমনজিৎ ছুটলেন বীজপুর থানায়। ফোনের দোকানের মালিক এমন কাঁচুমাচু মুখে বসে আছেন, মনে হবে ডাকাতিটা উনিই করেছেন বা করিয়েছেন। থানায় আসার অভিজ্ঞতা নেই, বেশ বোঝা যাচ্ছে হাবভাবে। তার উপর প্রবীর সহ অন্য অফিসাররা ভদ্রলোকের দিকে ঘনঘন কড়া দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন।

দোকানের মালিককে একটু ধাতস্থ হওয়ার সময় দিলেন সুমনজিৎ। কথা শুরু করলেন তারপর, 'এই মেসেজটা আপনার ফোনে...চন্দনাদেবীর লুঠ হয়ে যাওয়া ফোন থেকে... কী ব্যাপার বলুন তো?'

ব্যাপারটা যে কী, পরিষ্কার হয়ে গেল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এবং রক্তকণিকায় একশো মিটার স্প্রিন্টের ছটফটানি টের পেলেন সুমনজিৎ। ফোনে তৎক্ষণাৎ ধরলেন এসপি-কে। চেপে রাখতে পারলেন না উচ্ছ্বাস, 'স্যার! ফাইনালি লিড পাওয়া গেছে একটা। ডেফিনিট লিড!'

কী লিড? কেন 'ডেফিনিট'?

চন্দনার যে ফোনটা ডাকাতরা নিয়ে গিয়েছিল, সেটা স্যামসাং কোম্পানির। কাঁচড়াপাড়ারই দোকান থেকে কেনা। যে মডেলের ফোন, সেটা 'লঞ্চ' হয়েছিল সবে গত বছর, নানান অভিনব ফিচার্স সহ। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপিত ছিল 'মোবাইল ট্র্যাকার টেকনোলজি'।

সেটা কী?

ধরুন আপনি ওই মডেলের ফোন কিনলেন। এবং ফোনটা চুরি হয়ে গেল। এখন চুরি যাওয়া ফোনে যে মুহূর্তে চোর অন্য সিম ভরে চালু করবে, 'মোবাইল ট্র্যাকার টেকনোলজি'র সৌজন্যে একটা এসএমএস আসবে এমন একটা পূর্বনির্ধারিত নম্বরে, কেনার সময় যে নম্বরটা আপনার ফোন-মেমরিতে ভরে দেওয়া হয়েছিল। এসএমএসে অটোম্যাটিকালি যাতা আসবে মেমরিতে ভরে রাখা টেমপ্লেটের—'প্লিজ হেল্‌প মি, আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার'। যে নতুন সিম ভরা হয়েছে চুরি যাওয়া ফোনে, তার নম্বর তো বটেই, সিমের আইইএমআই নম্বরও জানা যাবে এসএমএস মারফত। এবার পুলিশকে জানালে টাওয়ার লোকেশন দিয়ে সহজেই ট্র্যাক করা যাবে ফোনের অবস্থান।

BanglaBook.org

এই পূর্বনির্ধারিত নম্বরটা কী হবে, সেটা আপনি অর্থাৎ খদ্দের ঠিক করে দেবেন ফোনট কেনার সময়। খদ্দের স্বাভাবিকভাবেই নিজের পরিচিত কারও নম্বরই ঢোকাবেন মেমরিতে বিমল যখন ফোনটা কিনেছিলেন, দোকানের মালিক সোৎসাহে বুঝিয়েছিলেন এই প্রযুক্তি কথা। জানতে চেয়েছিলেন, পূর্বনির্ধারিত কোন নম্বরটা বিমল মেমরিতে ঢোকাতে চান। বিমলে প্রযুক্তি বিষয়ক ধ্যানধারণা অতি সীমিত, বোঝেনওনি পুরো ব্যাপারটা। বলেছিলেন, 'আপনি তো পাড়ারই লোক... আমার অনেকদিনের পরিচিত... আপনার নম্বরটাই ভরে দিন না হয়' দোকানি সেটাই করেছিলেন। আজ দুপুরে চন্দনার ফোন থেকে ওই টেমপ্লেট-মেসেজ ঢুকেছে তাঁর ফোনে। দোকানি ভদ্রলোক নিমেষে বুঝেছেন, লুঠ হওয়া মোবাইল চালু করা হয়েছে অন সিম ভরে। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন বিমলকে। পরামর্শ দিয়েছেন একটুও দেরি না করে পুলিশকে জানাতে। জানামাত্রই বীজপুর থানার পুলিশ একরকম তুলেই নিয়ে গেছে দোকানদারকে। এই হল গল্প।

ঝটিতি 'সিট'-এর সদস্যদের নিয়ে বসলেন পুলিশ সুপার। কিনারা-সূত্রের আভাসে রাতারাতি যেন চাঙ্গা হয়ে গেছে টিম। অ্যাড্রিনালিনের বাড়তি ক্ষরণ ধরা পড়ছে সুমনজিৎ-প্রবীরদে নড়াচড়ায়।

যে সিমটা ভরা হয়েছে ফোনে, সেটার 'সাবস্ক্রাইবার ডিটেলস' নেওয়া হল দ্রুত। সিমটা বাদাম সিং বলে একজনের নামে। ঠিকানা? পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বাদাউন জেলা। এর বেশি নির্দিষ্ট তথ নেই সার্ভিস প্রোভাইডারের নথিতে। ফোনের অবস্থান? বাদাউন জেলারই 'কাদের চক' ব্লকে ধানুপুরা গ্রামের কাছাকাছি ঘুরপাক খাচ্ছে।

বেশ, এবার পরের ধাপ। সিমটা আজই চন্দনার ফোনে ভরেছে। নিজের মোবাইলে তে নিশ্চয়ই এই সিমই ব্যবহার করত এতদিন। এই সিম-নম্বরের কল ডিটেলস রেকর্ড নেওয়া যাক তা হলে। নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে ভিনরাজ্যের সঙ্গীসাথীদের নাম।

বেরল না ভিনরাজ্যের সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের নাম। কল রেকর্ডসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বর চিহ্নিত করা হল এ রাজ্যেরই দু'জনকে। যাদের সঙ্গে সম্প্রতি রোজই ঘনঘন কথা বলেছে বাদাম সিং। একজনের নাম অনিন্দ্য ঘোষ। খড়দায় বাড়ি। দ্বিতীয়, সুকান্ত রুইদাস। বাড়ি, বর্ধমানের জামালপুর। সার্ভিস প্রোভাইডার সংস্থার থেকে জোগাড় করা হল দু'জনের সিমকার্ড-সংক্রান্ত নথিপত্র। আরও সহজ করে বললে, 'Customer Application Form' বা 'CAF'।

দিনে অন্তত সাত-আটবার করে খড়দা আর জামালপুরের এই দু'জনের সঙ্গে কিসের এত কথ বাদাম সিংয়ের? সেই বাদাম সিংয়ের, যার কাছে চন্দনার ফোনটা আছে এবং সুতরাং ডাকাতি আর খুনের সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত? অনিন্দ্য-সুকান্তই কি 'লোকাল কনট্যাক্ট' স্থানীয় গ্যাংয়ের সদস্য, যারা যুক্ত ছিল ঘটনায়? সূর্য গোলদারদের গ্যাং নয়? 'বাদাম সিং' আদৌ

BanglaBook.org

ঠিক নাম কিনা জানা নেই। এমনও হতে পারে, অন্য নামে কেউ ওই সিম ব্যবহার করছে।

সে যা-ই হোক, সিদ্ধান্ত হল, এই 'বাদাম সিং'-কে তো তুলতে হবেই। তবে মোটামুটি একই সময়ে এই অনিন্দ্য-সুকান্তকেও আটক করতে হবে জেরার জন্য। গ্যাং বারো-চোদ্দো জনের। সূর্য গোলদার সহ ছ'জন এই ঘটনায় জড়িত কিনা, নিশ্চিত নয় এখনও। যদি ধরে নেওয়া যায় যে ওই ছ'জন যুক্ত ছিল, তা হলেও বাকি থাকে আরও ছয় থেকে আটজন। সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তিন সম্ভাব্য সন্দেহভাজনের। বাদাম সিং, অনিন্দ্য ঘোষ আর সুকান্ত রুইদাস। এদের মোটামুটি একই সময়ে তুলতে হবে। আগে-পরে হলে মুশকিল। 'খবর' হয়ে যাবে। ফোনে রোজ অনেকবার কথা হয় তিনজনের মধ্যে। আরও একাধিকের হয়তো ফোন-যোগাযোগ আছে এদের সঙ্গে। ফোনে না হলেও হয়তো অন্যভাবে আছে। পুরো নেটওয়ার্কটা এখনও স্পষ্ট নয়। বাদাউন থেকে বাদাম সিং গ্রেফতার হয়েছে, এই খবর হয়তো দ্রুতই পৌঁছবে অনিন্দ্য-সুকান্তর কাছে। সতর্ক হয়ে যাবে। গা-ঢাকা দেবে। আবার উলটোটাও সত্যি। অনিন্দ্যরা এখানে আটক হলে খবর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে বাদাউনে। চম্পট দেবে বাদাম সিং।

তা হলে করণীয়? অনিন্দ্য-সুকান্তের ঘরবাড়ি চিহ্নিত করে রাখা হল। চালু হল নজরদারিও। ওদের তোলা যাবে যখন-তখন। আগে বাদাম সিংকে ধরতে হবে। সেটা তুলনায় ঢের বেশি কঠিন কাজ। যেটা সম্পন্ন হলে কালবিলম্ব না করে অনিন্দ্য-সুকান্তের বাড়িতে হানা দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত হল, একটা টিম রওনা দেবে বাদাউনে। প্রবীর থাকলেন নেতৃত্বে। সঙ্গে জেলার আরও জনাপাঁচেক অফিসার-কনস্টেবল। সিআইডি সরকারি ভাবে কেসের দায়িত্ব নেয়নি ঠিকই, কিন্তু সহায়ক-শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল শুরু থেকেই। প্রবীরের সঙ্গী হলেন সিআইডি-র কয়েকজন অভিজ্ঞ অফিসার।

টিম রওনা হল ১৯ এপ্রিল। তার আগে পুলিশ সুপার ফোনে আলোচনা করে নিলেন বাদাউনের এসপি-র সঙ্গে। যিনি স্পষ্ট জানালেন, যে অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট নম্বরের বর্তমান অবস্থান, সেই ধানুপুরা গ্রাম এবং তার আশেপাশের এলাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে পরিচিত। দাগি ক্রিমিনাল-অধ্যুষিত। ওখানে 'রেইড' করতে গেলে স্থানীয় পুলিশও রাজ্যের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর সাহায্য নেয়। এই অভিযানেও ইউপি পুলিশের এসটিএফ-এর প্রয়োজন পড়বে। প্রাথমিক হোমওয়ার্ক পুলিশ সেরেই রাখবে, আশ্বস্ত করলেন এসপি।

হোমওয়ার্ক যে বাস্তবিকই অনেকটাই সেরে রেখেছে জেলা পুলিশ, বাদাউন পৌঁছে এসপি-র সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন প্রবীর। এসপি শুরুতেই বললেন, 'যাকে ধরতে এসেছেন, তার নাম বাদাম সিং নয়। বাদাম সিং-ও ডাকাত, দাগি আসামি, কিন্তু এখন জেলে আছে। ওর নাম ব্যবহার করে সিমটা নেওয়া হয়েছে। যে নিয়েছে, তার নাম শিশুপাল। এরও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। গ্রেফতারও হয়েছে আগে বেশ কয়েকবার। ডাকাতির কেসেই। ছবিও আছে

BanglaBook.org

আমাদের রেকর্ডে। ধানুপুরা গ্রামে বাড়ি। এখান থেকে একুশ কিলোমিটার দূরে। আমাদের জেলার বর্ডার। ওই গ্রামের পরেই অন্য জেলার এলাকা শুরু। কাঁসিরাম নগর। ট্রাস্ট মি, ধানুপুরা ইজ আ নটোরিয়াস ভিলেজ। একশো পুলিশ নিয়ে রেইড করলেও ওখান থেকে কাউকে ধরা একটা মুশকিলই। ছোট গ্রাম। হাজার দুয়েক লোক। পুলিশ হোক বা অন্য কেউ, বাইরের কেউ ঢুকলেই "খবর" হয়ে যায়। ওভাবে ধরা যাবে না শিশুপালকে।'

—তা হলে?

এসপি আশ্বস্ত করলেন, 'গ্রামের বাইরে এলে ধরতে হবে। আগে বের করতে হবে গ্রাম থেকে। আমাদের এসটিএফ-এর অফিসাররা লেগে আছেন। শিশুপালের সঙ্গে একসময় খুচরো চুরি-ছিনতাই করেছে, এমন সোর্স লাগানো হয়েছে। সেই সোর্সকে দিয়ে আজ রাতে গ্রামের বাইরে একটা মদের ঠেকে ডেকে পাঠানোর প্ল্যান আছে। সোর্সের সঙ্গে কথাও হয়েছে শিশুপালের। পেয়ে যাবেন রাতের মধ্যেই, সব যদি ঠিকঠাক থাকে।'

সব ঠিকঠাকই থাকল। ধানুপুরা থেকে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে ভোজপুর-নারায়ণপুর গ্রাম। সেখানে রাত আটটা নাগাদ সাইকেলে করে শিশুপালের আবির্ভাব ঘটল। সোর্সকে নিয়ে সন্ধে ছ'টা থেকেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল বাদাউন জেলা পুলিশের টিম, এসটিএফ-এর অফিসাররা এবং সদলবলে প্রবীর। 'শিশুপাল-বধ' সম্পন্ন হল অনায়াসে। পকেট থেকে উদ্ধার হল চন্দনাদেবীর মোবাইল। ধন্দের আর জায়গা নেই কোনও। শিয়োর শট ডিটেকশন। ঘটনার ঠিক দু'মাস পর, এপ্রিলের একুশে। উচ্ছ্বসিত প্রবীর ফোন করলেন পুলিশ সুপারকে, 'স্যার! মিশন সাকসেসফুল!'

'মিশন' আসলে শুরু হয়েছিল সবে। শিশুপালকে পেলেই তো শুধু হল না। প্ল্যানমাফিক রাতেই তুলতে হবে সম্ভাব্য দুই শাগরেদ অনিন্দ্য-সুকান্তকে। ঠিক হল, প্রথমে সুকান্তকে তোলা হবে জামালপুর থেকে। অনিন্দ্যর বাড়িতে তারপর হানা দেওয়া হবে সুকান্তকে সঙ্গে নিয়েই। রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে সুমনজিতের নেতৃত্বে জামালপুর পৌঁছে গেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের টিম। সুমনজিতের সঙ্গী হলেন আইসি জগদ্দল সুবীর চ্যাটার্জি সহ 'সিট'-এর বাছাই করা কয়েকজন কর্মী-অফিসার।

সুকান্তকে পাওয়া গেল বাড়িতেই। বছর তিরিশের যুবক। নেহাতই সাদামাটা চেহারা। মধ্যবিত্ত সংসার। মা-বাবার একমাত্র ছেলে। ঘুমনোর তোড়জোড় করছিলেন। পুলিশের টিম দেখে ভীষণই ঘাবড়ে গেলেন। মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কথাবার্তার আওয়াজে ওঁদেরও ঘুম ভেঙে গেল এবং ঘরে পুলিশ দেখে দৃশ্যতই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

সুমনজিৎ প্রথম প্রশ্নটাই করলেন, 'আপনার ক'টা মোবাইল?'

—একটাই স্যার।

BanglaBook.org

—মোবাইলটা কোথায়?

শোয়ার ঘরে চার্জে বসানো ছিল ফোনটা। বিনা বাক্যব্যয়ে সুকান্ত মোবাইল তুলে দিলেন সুমনজিতের হাতে।

—হ্যাঁ, নম্বরটা বলুন ফোনের।

সুকান্ত বললেন নম্বর। যাতে 'কল' দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করেও নেওয়া হল, ঠিক বলছেন কিনা। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! এই নম্বর তো মিলছে না সেই নম্বরের সঙ্গে, যে নম্বরে দিনে অন্তত আটবার করে কথা বলেছে শিশুপাল গত দেড়মাস ধরে। মিলছে না তো! সুমনজিৎ ফের চেপে ধরেন সুকান্তকে।

—আর ক'টা ফোন আছে আপনার?

—এই একটাই স্যার।

—দেখুন সুকান্তবাবু, কোনও জোরজবরদস্তি করতে চাই না। অন্য ফোনটা দিন।

—বিশ্বাস করুন স্যার, আমার এই একটাই ফোন।

—কী করেন আপনি?

—বিশেষ কিছু না স্যার, টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ।

—শিশুপাল বলে কাউকে চেনেন?

—না স্যার।

সুমনজিৎ তাকান সুবীরের দিকে, 'এভাবে হবে না। একে থানায় নিয়ে গিয়ে কথা বলতে হবে। তার আগে ঘরটা ভাল করে সার্চ করা দরকার।' তল্লাশি হল তন্নতন্ন করে। না পাওয়া গেল দ্বিতীয় কোনও মোবাইল, না পাওয়া গেল কোনওরকম অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত থাকার প্রমাণ। যখন তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসছে পুলিশ, মা কান্নাকাটি জুড়েছেন, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন স্তব্ধবাক, তখনও সুকান্ত চিৎকার করে যাচ্ছেন, 'আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা? সামান্য সাপ্লাইয়ের কাজ করে খাই। জীবনে কখনও কোনও দু'নম্বরি কাজে জড়াইনি, বিশ্বাস করুন। মাক্কালীর দিব্যি স্যার...বিশ্বাস করুন!'

বিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখছিল না পুলিশ। ইয়ারকি নাকি? বললেই হল, আর ফোন নেই? যে নম্বরের সঙ্গে শিশুপালের কথা হচ্ছে, তার 'কাস্টমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম' আগেই জোগাড় করা হয়েছে সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে। সেই ফর্মে সুকান্তের ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডের ছবি জ্বলজ্বল করছে। এখন বললেই হল, নেই? নেই, তো গেল কোথায়? থানায় এনে একটু 'যত্নআত্তি' করার উপক্রম করলেই দ্বিতীয় মোবাইল সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে, নিশ্চিত ছিলেন সুমনজিৎরা।

নিশ্চিত থাকা কিন্তু গেল না জামালপুর থানায় সুকান্তকে নিয়ে এসে ঘণ্টাদেড়েক ধরে নানা কায়দায় জিজ্ঞাসাবাদের পর। সুকান্ত অবিচল থাকলেন নিজের বয়ানে, 'আমাকে মেরে ফেললেও

BanglaBook.org

একই কথা বলব স্যার, যে নম্বরের কথা আপনারা বলছেন, ওই নম্বরের কোনও মোবাইল আমার নেই। আমার এই একটাই ফোন।' সুমনজিৎ এবং টিমের অন্যদেরও খটকা লাগতে শুরু করল এবার। প্রতিকূল পরিবেশে প্রবল পুলিশি চাপ সহ্য করে নিজের নির্দোষিতার ব্যাপারে এতটা আত্মবিশ্বাসী থাকাটা একজন অপরাধীর পক্ষে বেশ অস্বাভাবিকই। কোথাও গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে বড়সড়! নতুন করে ফের ভাবা দরকার ঠান্ডা মাথায়।

ভাবা হল। সুকান্তের কাছে যে মোবাইলটা ছিল, সেটার টাওয়ার লোকেশন দেখা হল। ডাকাতির আগে বা পরে কাঁচড়াপাড়ার ত্রিসীমানাতেও ছিল না। ফোনের অবস্থান ছিল জামালপুরেই। এবং সুকান্তর এই ফোনের থেকে শিশুপালের নম্বরের কোনও যোগাযোগ হয়নি কখনও। শুধু তাই নয়, সুকান্তর কাছে পাওয়া ফোনের থেকে কখনও কোনও যোগাযোগ হয়নি ওই সন্দেহজনক নম্বরেরও, যে নম্বরে শিশুপাল নিয়মিত কথা বলেছে, যে নম্বরের ফোন সুকান্তের কাছে পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত ছিল পুলিশ। এসবের একটাই মানে দাঁড়ায়। সুকান্ত সম্ভবত মিথ্যে বলছেন না। সত্যিই তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই এ ডাকাতির সঙ্গে।

সুকান্ত যে ফোনটা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন, তার 'ক্যাফ' আনানো হল পরদিন সকালে। এখানেও প্রত্যাশিতভাবেই সুকান্তের ছবি। 'ভুতুড়ে' সিমকার্ডের 'ক্যাফ'-এ যে ছবি ছিল সুকান্তের, সেই একই ভোটার আইডি কার্ডের ছবি। দুটো সিমকার্ডের 'ক্যাফ' পাশাপাশি রেখে দেখা হল খুঁটিয়ে। এবং দেখতে গিয়েই চমক! যে দোকান বা এজেন্সি থেকে সিম বিক্রি হয়, নথিপত্রে 'সিল' থাকে সেই দোকানের। এ তো দেখা যাচ্ছে, দুটো সিমই বিক্রি হয়েছে একই দোকান থেকে। নেহাতই সমাপতন?

সুমনজিতের হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, ওই অনিন্দ্যের সঙ্গে যে নম্বরে শিশুপাল কথা বলছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তার 'ক্যাফ'-টাও তো জোগাড় করা ছিল। ওটা দেখা যাক একবার। দেখা হল। আরে! এ কী! এই সিমকার্ডও বিক্রি হয়েছে ধনেখালির ওই এজেন্সি থেকেই। এটাও সমাপতন? হতেই পারে না! ইম্পসিবল!

দুটো সন্দেহজনক নম্বর, দুটো সন্দেহজনক সিম। যাদের নামে নথিভুক্ত, তাদের একজন সুকান্ত। যিনি বলছেন, তাঁর কাছে এমন কোনও সিমই নেই। অন্যজন, অনিন্দ্যকে নিয়ে আসা হল থানায়। এবং যেমনটা আঁচ করতে শুরু করেছিলেন অফিসাররা, সেটাই ঘটল। অনিন্দ্য সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করেন। আকাশ থেকে পড়লেন সব শুনে। যে সিম বিক্রি হয়েছে তাঁর ছবি এবং অন্যান্য নথিপত্রের ভিত্তিতে, এমন সিম নেই-ই তাঁর কাছে। একটাই মোবাইল তাঁরও। অনিন্দ্যর কল ডিটেলস এবং টাওয়ার লোকেশন পরীক্ষা করেও দূরতম আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া গেল না তাঁর এই ডাকাতিতে জড়িত থাকার।

মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়াল তা হলে? একই দোকান থেকে দুটো সিম কার্ড বিক্রি হয়েছে এমন দু'জনের নথি ব্যবহার করে, যাঁরা সেই সিম কেনেনেই নি। নথি স্বাভাবিক নিয়মে দোকানির

BanglaBook.org

কাছেই ছিল। কারণ, অনিন্দ্য-সুকান্ত দু'জনেই ওই দোকান থেকে সিম কিনেছিলেন, যেগুলো এখন নিজেরা ব্যবহার করেন। সাপ্লাইয়ের কাজে সুকান্তকে প্রায়ই ধনেখালি যেতে হয়। আর অনিন্দ্যর শ্বশুরবাড়ি ধনেখালিতে। দু'জনেই ঘটনাচক্রে সিম কিনেছিলেন ওই দোকান থেকেই।

দোকানের কোনও কর্মচারীর এই জাতীয় অসাবধানতাজনিত ভুল? একবার নয়, দু'-দু'বার? হয় কখনও? এখন প্রশ্ন, কাদের কাছে বিক্রি হয়েছে ওই দুই সন্দেহজনক সিম? উত্তর যেখানে লুকিয়ে আছে, দুপুর গড়ানোর আগেই সেখানে রওনা দিল টিম।। ধনেখালি।

ছোটখাটো এজেন্সি ধনেখালি বাজারের কাছে। মালিকের নাম রাহুল। বয়স ওই পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মধ্যে। সুমনজিৎ সরাসরি দুটো সন্দেহজনক সিমকার্ডের নথি সামনে রাখলেন রাহুলের, 'এগুলো আপনার দোকান থেকে বিক্রি হয়েছে । কিন্তু যাঁদের নথি ব্যবহার করে বিক্রি হয়েছে, তাঁদের ফোনে এই সিম নেই। এটা কী করে হল?'

রাহুলের চোখেমুখে বিস্ময়ের আঁকিবুকি, 'এমন তো হওয়ার কথা নয় স্যার!'

—সে তো আমরাও জানি, হওয়ার কথা নয়। সেজন্যই তো জানতে চাইছি। সেজন্যই তো আসা।

—বুঝলাম স্যার। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমনটা হয়নি কখনও আমার দোকানে...

—'আজ পর্যন্ত' তো আজকেই শেষ রাহুলবাবু... কালকে কী হবে সে আর কে জানে বলুন... ঘটনাটা আপনার দোকান থেকেই ঘটেছে... জবাবটাও ন্যাচারালি আপনাকেই দিতে হবে।

রাহুলকে সামান্য নার্ভাস দেখায় এবার, 'এভাবে বলছেন কেন স্যার? কত সিম বিক্রি হয় দোকান থেকে... কর্মচারীরা সবসময় ডকুমেন্টস চেক করে নেয়। হয়তো ভুল করে...'

সুমনজিৎ গলা চড়ান এবার, 'এভাবে বলব না তো কীভাবে বলব? বলছেন ভুল করে হয়তো হয়ে গেছে? মজা পেয়ে গেছেন? একাধিকবার যখন এমন গুরুতর ভুল হয়েছে, ধরে নিতে হবে, সেটা ইচ্ছাকৃতই।'

রাহুলের ডিফেন্স এবার আরও নড়বড়ে দেখায়, 'বিশ্বাস করুন স্যার...'

—থানায় চলুন তো আগে... বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ফয়সালা না হয় ওখানেই হবে।

ধনেখালি থানায় যখন রাহুলকে নিয়ে পৌঁছল পুলিশ, বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। মাঝবৈশাখের রোদ তার তেজ হারিয়েছে। বিকেল ক্রমে সন্ধ্যাকালীন।

পুলিশের গাড়িতে ওঠার পর থেকেই ঘামছিলেন রাহুল। ধনেখালি থানার বড়বাবুর ঘরে ঢুকে যখন একঝাঁক পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি বসানো হল, সুমনজিৎ বুঝতে পারলেন, দম ফুরিয়ে এসেছে রাহুলের। হাত কাঁপছে সামান্য। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছছেন ঘনঘন।

স্বীকারোক্তি এল দ্রুতই। সিম কিনতে গেলে যে যে প্রামাণ্য নথি বা 'ডকুমেন্টস' প্রয়োজন, অনেকেরই থাকে না। যাদের ডকুমেন্টস নেই, অথচ সিম চাই, তাদের ডবল দামে সিমকার্ড বেচত রাহুল। কী ভাবে? সিম কিনতে গেলে 'কাস্টমার অ্যাপলিকেশন ফর্ম' (ক্যাফ) ভরতি করতে হয়

BanglaBook.org

গ্রাহককে। নিজের পরিচয় সংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্যসমেত। কেউ পাসপোর্টের জেরক্স কপি দেয়, কেউ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, কেউ-বা অন্য কিছু। সিম-বিক্রেতা দোকান বা এজেন্সিকে সেই ফর্ম পাঠাতে হয় সংশ্লিষ্ট মোবাইল পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থাকে।

যে গ্রাহকরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে সিম কিনতেন, তাঁদের নথির জেরক্স করে রাখতেন রাহুল। এবং যখন কেউ এসে বলত, সিম লাগবে, কিন্তু ডকুমেন্টস নেই, তখন ওই গ্রাহকদের জেরক্স করা নথি ব্যবহার করতেন। ডকুমেন্ট-হীন ক্রেতাকে আশ্বস্ত করতেন, 'পেপার্স জোগাড় হয়ে যাবে, তবে টাকাটা ডাবল লাগবে।'

রাহুল জেরায় খোলাখুলি আরও বললেন, 'এমনটা শুধু আমি নয়, অনেক এজেন্সি করছে স্যার... দেখুন একটু খোঁজ নিয়ে।'

অন্যরা কে কী করছে, সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার সময় পড়ে আছে অনেক। বোঝাই যাচ্ছে, একটা চক্র তৈরি হয়েছে উদোর নথিপত্র নিয়ে বুধোকে সিম দেওয়ার। সুমনজিৎ ভাবছিলেন, সমস্ত মোবাইল পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে একটা মিটিং করা দরকার শীঘ্রই। সার্ভিস প্রোভাইডাররা হয়তো জানেই না এই নয়া জালিয়াতির ব্যাপারে, সেভাবে হয়তো এখনও কোনও সিস্টেমই তৈরি হয়নি এটা প্রতিহত করার। কিন্তু এসব তো পরে। আপাতত যেটা জানা দরকার, অনিন্দ্য-সুকান্তের নথি ব্যবহার করে ওই দুটো সিম রাহুল বেচেছিলেন কাদের?

কাদের বেচেছিলেন, দিব্যি মনে ছিল রাহুলের। দু'জন হিন্দিভাষী লোক। রাহুল মুখ চিনতেন। ধনেখালির দশঘরায় রাহুলের বাড়ি। বাড়ির কাছেই সাত-আটজন লোক তিন-চার মাস হল একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। বাড়িটা স্থানীয় একটা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের। যাঁর পাশাপাশি দুটো বাড়ি। একটা দোতলা, যেটায় নিজে থাকেন সপরিবারে। আরেকটা একতলা। যেটা ভাড়া দিয়ে আসছেন বহুদিন ধরেই। পাড়ার লোক জানত, ওই সাত-আটজন হিন্দিভাষী ভাড়াটে উত্তর ভারতের লোক। এ রাজ্যে ব্যবসার কাজে এসেছে। নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। ঠিক কিসের ব্যবসা, স্থানীয় মানুষ জানত না। জানার আগ্রহও বিশেষ ছিল না। ওই সাত-আটজনের মধ্যেই দু'জন মাসতিনেক আগে রাহুলের দোকানে এসেছিল। বলেছিল, লোকাল সিম দরকার, কিন্তু ডকুমেন্ট নেই। এমন খদ্দেরদেরই অপেক্ষায় থাকতেন রাহুল। অনিন্দ্য-সুকান্তের নথির জেরক্স কপি ব্যবহার করে ডবল দামে বেচে দেন সিম। ওঁদের নামেই রেজিস্টার্ড হয়ে যায় সিম-নম্বর।

—নাম জানেন ওই দু'জনের?

—না স্যার, তা কী করে জানব? ওই একবারই দু'জনের সঙ্গে কথা হয়েছিল, যেদিন দোকানে এসেছিল। তারপর এক-দু'বার বাজারে দেখেছি। কথা হয়নি।

—বাড়িটা তো চেনেন বললেন...

—হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, চিনি না আবার! একদম চিনি।

BanglaBook.org

—এখন তো সন্ধে হয়ে গেছে। এখন গেলে পাওয়া যেতে পারে ওদের?

প্রাথমিক ভয় আর জড়তা কেটে গিয়ে রাহুল তখন প্রায় সোর্সের ভূমিকায়, আমাকে দুটো ফোন করতে দিন স্যার। আমি জেনে নিচ্ছি, এখন ওরা আছে কি না।

ফোন করতে দেওয়া হল রাহুলকে। পালটা ফোন এল মিনিট পনেরোর মধ্যেই। হ্যাঁ, এখন ওই বাড়িতেই আছে ওরা। ফোনে এসপি-কে পুরোটা জানালেন সুমনজিৎ। সবুজ সংকেত এল রেইডের। রাহুলের সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা 'রেকি' করে আসা হল। পরিকল্পনা ছকে ফেলা হল।

জনবহুল মহল্লার মধ্যেই বাড়ি। ঢোকা-বেরনোর একটাই দরজা। ধনেখালি থানায় একটা সশস্ত্র বাহিনী তৈরি রইল। যারা ফোনে বা ওয়ারলেসে বার্তা পেলেই ছুটবে ওই বাড়িতে। মূল 'রেইড'-এ থাকবে সুমনজিতের নেতৃত্বে সাদা পোশাকের টিম। সঙ্গে ধনেখালি থানার ওসি এবং তাঁর টিমের ছ'জন। সবাই প্লেন ড্রেসে। প্রত্যেকের কোমরে গোঁজা নাইন এমএম পিস্তল। লোডেড। যাদের খোঁজে যাওয়া, তারা বেপরোয়া প্রকৃতির ডাকাত। সামান্যতম বিপদের আঁচ পেলে যে-কোনও মুহূর্তে গুলি চালাতেই পারে। বারবার 'ব্রিফ' করে দেওয়া হল সবাইকে। চূড়ান্ত সতর্কতা প্রয়োজন।

সতর্কতার তেমন প্রয়োজনই হল না অবশ্য। ধনেখালির ওসি কড়া নাড়লেন দরজায়। খুলল এক মাঝবয়সি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘুমচোখ। এবং দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নাকে যে তীব্র গন্ধটা ছিটকে এল, তাতেই সুমনজিৎ বুঝলেন, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। এ গন্ধ ভোলার নয়! এ সেই 'হিমতাজ' তেলের বিকট গন্ধ! যে তেলের শিশি বিমলের বাড়ির ফ্রিজের উপর ফেলে গিয়েছিল ডাকাতরা। ওই টেনশনের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য ছোটবেলায় পড়া ওই গল্পটা মনে পড়ে গিয়েছিল সুমনজিতের। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জাদুকরী কলমে লেখা। 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক'!

দুদ্দাড় ঢুকে পড়েছে পুলিশের টিম। যে দরজা খুলেছিল, তার বুকে দু'জন অফিসার ঠেকিয়ে দিয়েছেন পিস্তল। সাকুল্যে দুটো ঘর। অগোছালো, নোংরা। একটা ঘরে চাটাই পাতা। তাতে দু'জন ঘুমচ্ছিল। উঠে বসেছে ধড়মড়িয়ে। পাশের ঘরটা তুলনায় বড়। কিন্তু একই রকম অপরিচ্ছন্ন। সেখানে একটা তক্তপোশ। যাতে শুয়েছিল চারজন। হইচই শুনে যাদের ঘুম ভেঙেছে। এবং ভাঙার পর দেখেছে, খেল খতম! প্রতিরোধ করার মতো প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই! ওয়ারলেস বার্তা পেয়ে উল্কাগতিতে চলে এসেছে ধনেখালি থানার অপেক্ষারত সশস্ত্র টিম। শুরু হয়ে গিয়েছে তল্লাশি।

ওই চৌখুপ্পি সাইজের দুটো ঘরের তল্লাশিতে কতক্ষণই বা সময় লাগে? তক্তপোশের নীচে গোটা চারেক জংধরা ট্রাঙ্ক। যার মধ্যে দুটো থেকে বেরল প্রায় সোনারুপোর গয়না। যার চেহারা-ছবি মিলে যাচ্ছে বিমল-বর্ণিত খোয়া-যাওয়া গয়নার তালিকার সঙ্গে। আরেকটা ট্রাঙ্ক থেকে

BanglaBook.org

উদ্ধার হল চারটে শাবল, দুটো বন্দুক, তিনটে ওয়ান শটার আর দুটো নাইন এমএম পিস্তল যেমনটা মুঙ্গেরে তৈরি হয়।

সাত ডাকাত। বাবুলাল সিং, গণপত রাম, প্রেম পাল, ভগবান সিং, বনওয়ারি সিং, বলবীর সিং, সতীশ গৌতম। সাতজনের মধ্যে সতীশ আর বলবীর ছাড়া সবাই ওই ধানুপুরারই বাসিন্দা। সতীশ আর বলবীর, দু'জনে সম্পর্কে আত্মীয়। দু'জনেরই বাড়ি রাজস্থানে। ধানুপুরা অঞ্চলে সতীশের বোনের বিয়ে হয়েছে। সেই সূত্রে সতীশ-বলবীরের যাতায়াত ধানুপুরায়।

ভিনরাজ্যের আট ডাকাত

সিজ়ার লিস্ট বানাতে লেগে গেল ঘণ্টাদুয়েক। রাত দশটা নাগাদ যখন 'সপ্তরথী'-কে প্রিজ়ন ভ্যানে তুলে উত্তর ২৪ পরগনার দিকে রওনা দিচ্ছে পুলিশ, সামনের গাড়িতে গা এলিয়ে দেন সুমনজিৎ। টানা প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, টিম একরকম নিদ্রাহীনই। অথচ কারও ঘুম পাচ্ছে না। কখন ব্যারাকপুরে পৌঁছনো হবে, কখন শিশুপালকে নিয়ে ফিরবেন প্রবীর, কখন বসা হবে এদের নিয়ে, কখন জানা যাবে ডাকাতিটার আদি থেকে অন্ত, তর সইছিল না যেন। কথায় বলে, দুঃসময় একা আসে না। হয়তো ঠিক। কিন্তু উলটোটাও সত্যি। সুসময়ও একা আসে না। সঙ্গে নিয়ে আসে সাময়িকভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলিয়ে দেওয়ার টোটকা।

ব্যারাকপুর ফিরতে ফিরতে রাত সোয়া বারোটা হয়ে গেল। থানায় তাঁর অনেক আগেই এসে গিয়েছেন এসপি এবং অ্যাডিশনাল এসপি। প্রবীর কাল সকালে ফিরছেন শিশুপালকে 'ট্র্যানজিট রিমান্ড'-এ নিয়ে।

জিজ্ঞাসাবাদ-পর্ব শেষ হতে হতে রাত কাবার হয়ে গেল প্রায়। ঠিক কীভাবে চিত্রনাট্য রচিত

BanglaBook.org

হয়েছিল দুঃসাহসিক ডাকাতির, জানা গেল বিস্তারিত। জানা গেল, একজনকে ধরা বাকি আছে এখনও। 'দে বাবু'। টিম বেরিয়ে গেল সকালেই। 'দে বাবু'-কে দুপুরের মধ্যেই তুলে আনা হল হুগলি জেলার হরিপালের বাড়ি থেকে।

কে 'দে বাবু'? শ্রীকান্ত দে। হরিপালেই যার ছোটখাটো সোনার দোকান আছে। এই শ্রীকান্ত লোকটির মূল ব্যবসাই ছিল চোরাই সোনা কেনাবেচার। ডাকাতির মূল চক্রী ছিল এই শ্রীকান্তই।

হরিপালে শ্রীকান্তের এক প্রতিবেশী ছিল। নাম রামলোচন। আলুর কোল্ড স্টোরেজের কর্মী। উত্তরপ্রদেশের লোক। বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত হরিপালে। রামলোচনের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শ্রীকান্তের। এই রামলোচন আবার শিশুপালের দেশোয়ালি ভাই। ধানুপুরা গ্রামেই বাড়ি।

মাস সাত-আটেক আগে শিশুপাল আসে রামলোচনের কাছে। আলাপ-পরিচয় হয় শ্রীকান্তের সঙ্গে। চোরে চোরে মাসতুতো-পিসতুতো বা খুড়তুতো ভাই হতে সময় লাগেনি বিশেষ। শিশুপাল নিজেদের গ্যাংয়ের ব্যাপারে সব খুলে বলে শ্রীকান্তকে। বেরিলিতে করা একটা ডাকাতির কিছু সোনা বিক্রির ব্যাপারে আলোচনাও করে। মাসখানেক পরে এসে সেই সোনা বিক্রিও করে যায়। বাড়ে ঘনিষ্ঠতা।

ভবঘুরে-জাতীয় গ্যাং এদের। আট-ন'জনের টিম। বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে ডাকাতি করে বেড়ায়। স্থানীয় যোগাযোগ থাকলে কাজের সুবিধা হয়। মূলত আর্থিক সংস্থার অফিস বা সম্পন্ন সোনার দোকানকেই টার্গেট করত এরা। গত বছরের পুজোর আগে রামলোচনের ভাইঝির বিয়েতে শ্রীকান্ত নিমন্ত্রিত হিসেবে যায় ধানুপুরায়। পরিচয় হয় গণপত-বাবুলাল-বনওয়ারিদের সঙ্গে। শ্রীকান্তকে কথায় কথায় বলেছিল বাবুলাল, 'বাঙ্গাল মে কোই কামধান্দা হো তো জরুর বাতানা।'

'কামধান্দা'-র ব্যাপারে বেশি ভাবতে হয়নি শ্রীকান্তকে। তার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি কাঁচড়াপাড়ায়। সেখানে নিয়মিত যাতায়াত আছে শ্রীকান্তের। বিমলের বাড়ি থেকে বন্ধুর বাড়িটা হাঁটাপথে মিনিট চারেক। বন্ধুরও গয়নার দোকান আছে একটা। বিমলের সঙ্গে খুবই সুসম্পর্ক আছে এই বন্ধুটির। সেই সূত্রেই বন্ধুর সঙ্গে শ্রীকান্ত একাধিকবার গিয়েছেন বিমলের বাড়িতে। ছবির মতো মনে আছে বাড়িটার কোথায় কী।

বিমলের ব্যবসায় যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেখে তীব্র হিংসে হত শ্রীকান্তের। বছরদুয়েক আগেও যার কিনা ছোট্ট একরত্তি দোকান ছিল, তার এত বড় শোরুম-ওয়ার্কশপ-চারতলা বাড়ি হয় কোন ভোজবাজিতে? শুধু পরিশ্রম? নাকি অন্য গল্প আছে? হয়তো এ ব্যাটাও চোরাই সোনা কেনে! তার নিজের মতো অল্প টুকটাক নয়, কোনও স্টেডি সাপ্লাই আছে চোরাই মালের। এই বলবন্ত-গণপত-শিশুপালরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ গ্যাং। এদেরকে দিয়ে বিমলের বাড়িতে ডাকাতি করিয়ে দিলে কিছু না হলেও কুড়ি-পঁচিশ লাখের মাল তো পাওয়া যাবেই। তারপর অল্প

BanglaBook.org

দামে কিনে নিয়ে ঘষামাজা করে ফের বেচে দেওয়া। লালে লাল হয়ে যাওয়া আটকাতে পারবে না কেউ। হরিপালের দোকানটাকে বড় করার ইচ্ছে বহুদিনের। পুঁজিতে কুলোচ্ছে না। বলবীররা যদি কাজটা করতে পারে, তা হলে আর...।

ভিনরাজ্যের কোনও গ্যাংয়ের পক্ষে একটা সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা জায়গায় এই মাপের 'অপারেশন' করা তো সোজা নয়। স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সাহায্য ছাড়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে! শ্রীকান্ত ভেবে রেখেছিল আগাম করণীয়। সূর্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সূর্য গোলদার। চাকদায় বাড়ি। কল্যাণী আর হরিণঘাটায় দুটো ডাকাতির মাল বেচেছিল শ্রীকান্তের কাছে বছরখানেক আগেই। শিশুপালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিল শ্রীকান্ত জানুয়ারির মাঝামাঝি, 'বড়া কাম হ্যায়, টিম লে কে আ যাও তুরন্ত।'

চলে এসেছিল আটজনের গ্যাং। ধনেখালিতে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল শ্রীকান্তই। সূর্যের গ্যাংয়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিল বাবুলালদের। নিজে এঁকে দিয়েছিল বিমলের বাড়ির ঘরগুলোর ছবি। গভীর রাতে সবাই মিলে গিয়ে জরিপ করেও এসেছিল বাড়িটা। কীভাবে উপরে ওঠা হবে বাঁশের ভারা দিয়ে, 'অপারেশন'-এর সময় কে কোথায় থাকবে, ছকের খুঁটিনাটি ঠিক হয়েছিল শ্রীকান্তের হরিপালের বাড়িতে।

এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি, নৃশংসতার ভোর। আগের রাতে আড়াইটে নাগাদ সবাই জড়ো হওয়া কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে। আড়াই-তিন ঘণ্টার ডাকাতি, চন্দনাদেবীকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া চারতলা থেকে। শ্রীকান্ত নিজে উপরে ওঠেনি। একতলার ওয়ার্কশপের কাছে দাঁড়িয়ে উপর-নীচের অপারেশনের সমন্বয় করেছিল। মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। না হলে বিমল চিনে ফেলতেন অবধারিত।

বাবুলালরা বুদ্ধি দিয়েছিল সূর্যদের, কাজের সময় ফোন সঙ্গে না রাখতে। যদি কোনওভাবে তাড়াহুড়োয় পড়েটড়ে যায়, পুলিশ খুঁজে পেয়ে যায়, ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সূর্যের টিম ফোন রেখে এসেছিল তালবান্দার ডেরায়।

কিন্তু উদ্দেশ্য তো ছিল ডাকাতি, খুন করতে হল কেন? ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া যেত না? চারতলা থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে হল এক নির্দোষ মহিলাকে, যিনি ডাকাতদের অকস্মাৎ হানায় আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়েছিলেন শুধু? ধাক্কাটা কে দিয়েছিল? পাতলা চুল আর ভারী চেহারার বাবুলাল নির্বিকারভাবে বলেছিল, 'হাম নে ফেকা... শালি বহুৎ চিল্লা রহি থি, ইসি লিয়ে ফেক দিয়া।' চিৎকার করছিলেন বলে 'ফেক দিয়া'? বলছে এমন ভাবে, যেন একটা দেশলাই বাক্স বা জলের বোতল ছুড়ে ফেলার কথা হচ্ছে।

শুনে প্রবীরের মনে পড়ছিল বাদাউনের সেই ডিএসপি-র কথা, ধানুপুরার রেইডের আগে যিনি বলেছিলেন, 'এক্সট্রিমলি ফেরোশাস এরা। সামান্যতম রেজিস্ট্যান্সেও এরা গুলি চালিয়ে দেয়। বর্ন ক্রিমিনালস... অ্যান্ড ভেরি ডেসপারেট... অল অফ দেম।'

BanglaBook.org

চন্দনার মৃত্যুটা অবশ্য একেবারেই শ্রীকান্তদের হিসেবের মধ্যে ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতিই। মৃত্যুটা ঘটে যায় স্রেফ বাবুলালদের গ্যাংয়ের বেপরোয়া স্বভাবের জন্য। শুধু ডাকাতি হলে যা হইচই হত, চন্দনার মৃত্যুতে তার একশোগুণ বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় ঘটনাটা। আর এখানেই ডাকাতি-পরবর্তী ভাগবাঁটোয়ারার ছকটা ওলটপালট হয়ে যায় শ্রীকান্তদের।

কথা ছিল, ডাকাতির পরের দিন শ্রীকান্তের বাড়িতে লুঠের মাল নিয়ে বসা হবে। তারপর কেনাবেচার হিসেবনিকেশ। কিন্তু পরের দিনই এমন তোলপাড় শুরু হয় রাজ্যজুড়ে, এমন 'রেইড' শুরু করে পুলিশ, শ্রীকান্তই পরামর্শ দেয়, এখন কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকাই ভাল। হাওয়া ঠান্ডা হোক একটু, তারপর দেখা যাবে। সেইমতোই ধনেখালিতে বাবুলাল-বনওয়ারিদের ভাড়াবাড়িতে লুঠের মালপত্রের সিংহভাগ রাখা ছিল। অল্প কিছু সোনাদানা ছিল শ্রীকান্তের কাছে। সূর্যদের বলা হয়েছিল, টাকাপয়সার ভাগ পরে হবে। একটু থিতিয়ে যাক সব।

নামী ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোনের শখ ছিল শিশুপালের। চন্দনার ফোনটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। মার্চের শেষ সপ্তাহে কিছুদিনের জন্য ধানুপুরায় ফিরে গিয়েছিল এক আত্মীয়ের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেয়ে। দেড় মাসেরও বেশি ফোনটা বন্ধ রাখার পর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে আর লোভ সামলাতে পারেনি। নিজে যে ফোনটা ব্যবহার করত, তার সিমটা ভরে নিয়েছিল চন্দনার ফোনে। চালু করেছিল ফোন। ভাগ্যিস সেই ফোনটায় ছিল সবে গত বছর চালু হওয়া 'মোবাইল ট্র্যাকার টেকনোলজি'।

চার্জশিট তৈরির সময় নিজের দীর্ঘদিনের তদন্ত-অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণটা উজাড় করে দিয়েছিলেন প্রবীর। প্রমাণ একত্রিত করেছিলেন অখণ্ড মনোযোগে। শিশুপালের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া চন্দনার মোবাইল তো ছিলই। লুঠ হওয়া গয়নার প্রায় সবটাই উদ্ধার হয়েছিল বাবুলাল-বনওয়ারিদের দশঘরার ডেরা থেকে। বাকিটা শ্রীকান্তের বাড়ি থেকে। উদ্ধার হওয়া গয়নাগাটি যে বিমলের দোকানেরই, তা প্রমাণিত হয়েছিল তর্কাতীত। দোকানের সমস্ত গয়নাতে নিজের নামের আদ্যক্ষর খোদায় করে দিতেন বিমল, 'B.D'। উদ্ধার হওয়া সব গয়নাতেই ছিল ওই আদ্যক্ষর।

রাহুল আদালতে চিহ্নিত করেছিলেন বনওয়ারি আর সতীশকে, যাদের সিম বেচেছিলেন অনিন্দ্য-সুকান্তের নথিপত্র ব্যবহার করে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ফুটপ্রিন্ট যা পাওয়া গিয়েছিল, তার একাধিক মিলে গিয়েছিল অভিযুক্তদের কারও না কারও সঙ্গে। 'টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড'-এ বিমল-নিরঞ্জন-অভিজিৎ শনাক্ত করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের আট ডাকাতকে। সূর্য

BanglaBook.org

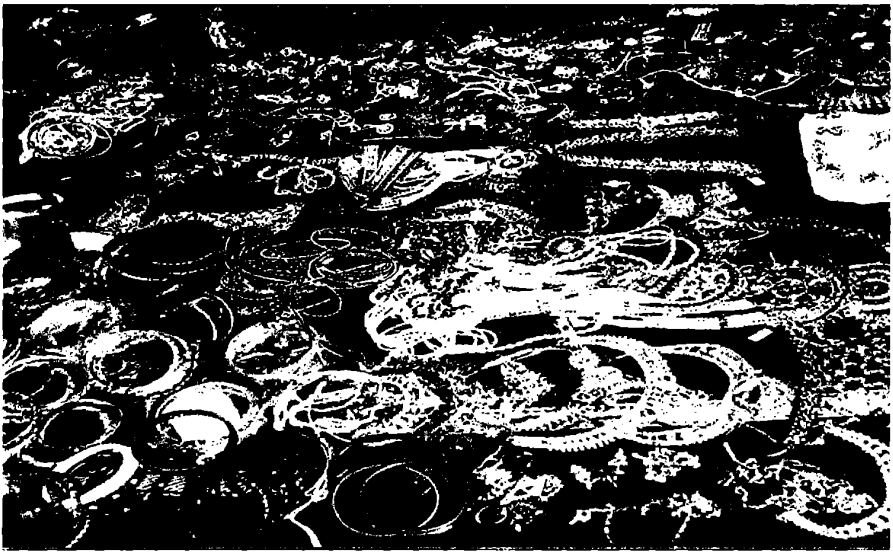

উদ্ধার হওয়া গয়না

গোলদার, রতন তরাই আর বাবর আলি মণ্ডলকেও চিহ্নিত করেছিলেন ওঁরা। বিমল আদালতে শনাক্ত করেছিলেন সূর্যের সেই চামড়ার বেল্ট।

সূর্যদের এবং বাবুলালদের ডেরা থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া শাবলে যা 'tool marks' ছিল, তার ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল, বাড়ির চারতলার কোলাপসিবল গেট আর ওয়ার্কশপের শাটার ভাঙতে ওই শাবলগুলোই ব্যবহৃত হয়েছিল। সুরজিৎ-বিশ্বজিৎ-তাপসকে চিহ্নিত করা যায়নি শনাক্তকরণ প্যারেডে।

মামলার কিনারা হওয়ার পর বিশেষ 'ট্রায়াল মনিটরিং' টিম গঠন করেছিলেন পুলিশ সুপার। যে টিমের নেতৃত্বে ছিলেন সুমনজিৎ এবং প্রবীর, সঙ্গে ছিলেন বিচারপ্রক্রিয়ার সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে, জেলার এমন কিছু অফিসার। টিমের কাজ ছিল চার্জশিট পেশের পর বিচারের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়ে দৈনন্দিন নজর রাখা। উদ্দেশ্য একটাই, পদ্ধতিগত নানা বিলম্বে যেভাবে বছরের পর বছর গড়িয়ে যায় বহু মামলা, এক্ষেত্রে যেন কোনওভাবেই না হয়।

সাপ্তাহিক বিভাগীয় পর্যালোচনা হত বিচার চলাকালীন। প্রতি পনেরো দিন অন্তর 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' জমা পড়ত অ্যাডিশনাল এসপি আর এসপি-র কাছে। নিয়মিত বৈঠক হত সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে। বিবাদী পক্ষের সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি ভোঁতা করে দেওয়ার কলাকৌশল তৈরি হত নিবিড় অধ্যবসায়ে।

BanglaBook.org

ফলও মিলেছিল এত খাটাখাটনির। বিচারপর্ব সম্পন্ন হয়েছিল আশাতীত দ্রুততায়, ব্যারাকপুর দায়রা আদালতের ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টে। ২০১০-এর ৮ জানুয়ারি রায়দানের দিন ধার্য হয়েছিল। কিছুটা বিপত্তি অবশ্য ঘটে গিয়েছিল রায়দানের সপ্তাহদুয়েক আগে। আসামিদের হাজিরার দিন ছিল ব্যারাকপুর কোর্টে। জেল থেকে আদালতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে ব্যারাকপুর পুলিশের প্রিজন ভ্যান। জোর ধাক্কা লাগে একটা টেম্পোর সঙ্গে। ভ্যানের পিছনের দরজাটা ভেঙে যায়। ডামাডোলের মধ্যে লাফ দিয়ে পালায় গণপত, সতীশ আর বনওয়ারি।

চিরুনিতল্লাশি শুরু হয়েছিল অবিলম্বে। পালাতে হলে রেলপথেই পালাবে, এই আন্দাজে হাওড়া আর শিয়ালদা জিআরপি-কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। মেইল করে দেওয়া হয়েছিল পলাতকদের ছবি। দুই স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল জেলা পুলিশের টিমও। আন্দাজটা মিলে গিয়েছিল সতীশের ক্ষেত্রে। যে ওই রাতেই হাওড়া স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেনে ওঠার আগে প্ল্যাটফর্ম থেকেই ফের গ্রেফতার হয়েছিল। গণপত আর বনওয়ারিকে ধরা যায়নি। অনেক চেষ্টা হয়েছিল ধরার। ফের টিম পাঠানো হয়েছিল ধানুপুরায়। পাওয়া যায়নি। ফেরারই থেকে গিয়েছিল দু'জন।

রায় বেরিয়েছিল নির্দিষ্ট দিনেই। সূর্য গোলদার, রতন তরাই, বাবর আলি মণ্ডল, শ্রীকান্ত দে এবং শিশুপাল-বলবীর-বাবুলাল-সতীশ-ভগবান-প্রেম পালকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল আদালত। প্রমাণাভাবে খালাস পেয়েছিল সুরজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং তাপস বিশ্বাস।

রায়ে বিচারপতি লিখেছিলেন, 'I hold that this case belongs to the rarest of the rare category and death sentence for all the convicts would be the adequate punishment in this case, and they are harmful to the society and the society does not require them any more for their dreadful activities, and if the sentence for life imprisonment is given to them, they would do similar harm against the society in future'.

মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছিল সাজাপ্রাপ্তরা। উচ্চ আদালতে শাস্তির মাত্রা কমে দাঁড়িয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসে।

ধরা পড়ার পর পুরো গ্যাংটা যখন ছিল চোদ্দোদিনের পুলিশি হেফাজতে, এক সন্ধেয় ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ এসেছিলেন বীজপুর থানায়। সঙ্গে পুলিশ সুপার সহ অন্য পদস্থ আধিকারিকরা। আলোচনা চলছিল কেসটা নিয়ে।

একসময় প্রবীর একটু ইতস্তত করেই বললেন এসপি-কে, 'স্যার, বিদ্যুৎকে, মানে বিমলবাবুর ছেলেকে একবার থানায় আনা যায়?' এসপি-র জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে প্রবীর বললেন, 'আসলে

BanglaBook.org

So considering the balance between the aggravating and mitigating circumstances in the light of the facts and circumstances of this case, and the above cruelty, brutality and awesome nature of the convicts, I hold that this case belongs to the rarest of the rare category and death sentence for all the convicts would be the adequate punishment in this case, and they are harmful to the society and the society does not require them any more for their dreadful activities, and if the sentence for life imprisonment is given to them, they would do similar harm again in the society in future.

The above terrible and shocking circumstances as discussed above on the basis of the materials on record are the special reasons u/s 354 (3) of the Cr.P.C. for awarding death sentence to all the 10 convicts, and I also hold that the death sentence must be imposed in this case because the sentence for life imprisonment would be inadequate punishment having regard to the facts and circumstances of this case.

ব্যারাকপুর আদালতের রায়ের অংশবিশেষ

হয়েছে কী স্যার, ডাকাতরা ধরা পড়েছে, এটা তো বিদ্যুৎও শুনেছে সবার মুখে। বিমলবাবু সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছেন। বলছেন, ছেলে বায়না ধরেছে, মা-কে যে লোকটা ধাক্কা দিয়েছিল, আমি দেখেছিলাম। আমাকে দেখাতে নিয়ে চলো।' একটু থেমে প্রবীর যোগ করলেন, 'আসলে ছেলেটা এখনও ট্রমার মধ্যে আছে তো... স্কুল যাচ্ছে না। চুপচাপ হয়ে গেছে ঘটনার পর থেকে। লোকটাকে দেখলে যদি মনটা একটু...।'

এসপি এক মিনিট ভাবলেন। তারপর বললেন, 'নিয়ে এসো।'

প্রবীর নিজে গাড়ি নিয়ে গেলেন। নিয়ে এলেন আট বছরের বিদ্যুৎকে। সঙ্গে এলেন বিমলও। থানারই একটা ঘরে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার চটজলদি ব্যবস্থা করা হল। বাবুলালকে দাঁড় করানো হল ঘরটায়। ওই ঘরেরই বাইরে একটা জানালা একটু ফাঁক করে বিদ্যুৎকে দেখানো হল ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকা বাবুলালকে। প্রায় এক মিনিট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিদ্যুৎ। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিমলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, 'ও মা-কে মারল কেন বাবা?'

প্রবীর ওদের দু'জনকে নিয়ে এলেন ওসি-র চেম্বারে। কান্না থামার পর বিদ্যুৎ একটু শান্ত হয়েছে যখন, এসপি বললেন প্রবীরকে, 'বাবুলালকে নিয়ে আসুন এখানে। আর লাঠি আনুন তো একটা।' বাবুলাল আসার পর এসপি উঠে গিয়ে বিদ্যুতের কাঁধে হাত রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি এই লোকটাকে চাইলে শাস্তি দিতে পারো। এই নাও লাঠি।' বিদ্যুৎ তাকিয়েছিল এসপি-র মুখের দিকে। লাঠিটা হাতেও নিয়েছিল। তিরিশ সেকেন্ড পর রেখে দিয়েছিল টেবলে। পুলিশ

BanglaBook.org

সুপারের হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'তোমরা ওকে জিজ্ঞেস করো, মা-কে ও নীচে ফেলে দিল কেন? মা তো কিছু করেনি! কেন মেরে ফেলল?' বলে ফের কেঁদে ফেলেছিল অঝোরে।

কী উত্তর দিতেন পুলিশ সুপার? কী বলতেন ডিআইজি? কী-ই বা বলার ছিল উপস্থিত অফিসার-কর্মীদের? কিছু দৃশ্য থাকে, ভিতরটা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে চৌচির করে দেয়। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে আচমকা। কিছু মুহূর্ত আসে, যখন আবেগ অবাধ্যতা করে। এ ছিল তেমন দৃশ্য, তেমন মুহূর্ত। ডিআইজি-এসপি থেকে শুরু করে থানার সেন্ট্রি কনস্টেবল, চোখের জল আটকাতে পারেননি কেউই। চেষ্টাও করেননি।

পুলিশ তো পরে। উর্দি তো পরে। পেশাদার তো পরে। আগে তো মানুষ!

একটু নাটকীয় শোনাল হয়তো শেষ দু'-তিনটে বাক্য। শোনাক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গোরস্থানে আজও সাবধান

ভোকাট্টা!

খেল খতম ঘুড়িটার। কাটা পড়েছে প্রতিপক্ষ ঘুড়ির মাঞ্জার ধারে। হাওয়ায় পাক খেতে খেতে এলোমেলো নেমে আসছে নীচে। দেখেই লাটাই হাতে ছুট লাগিয়েছিল বারো বছরের অশোক। অনেকক্ষণ জ্বালিয়েছে এই পেটকাটি চাঁদিয়ালটা। এতক্ষণে জারিজুরি শেষ। কেটে গেছে। এবার কাজ বলতে ঘুড়িটাকে ধরা। ওই তো, পড়েছে! ঘুড়িটা তুলে সামনে তাকাতেই হাত-পা অসাড় হয়ে গেল অশোকের। আরে, ওটা কী?

দুটো পা। ভরদুপুরে বেরিয়ে আছে বহু পুরনো কবরের ভিতর থেকে। গাছপালা-ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে পড়েছে দুপুররোদ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পরনের জিন্সের একঝলক। ঘুড়ি-লাটাই সেখানেই ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল অশোক। থামল গিয়ে সোজা অফিসঘরের কাছে।

'লছমনচাচা, ও লছমনচাচা!'

দুপুর তিনটে তখন। এই সময়টায় ঘণ্টাখানেক ভাতঘুমের অভ্যেস আছে মধ্যপঞ্চাশের লছমনের। অশোকের চিলচিৎকারে কাঁচাঘুমের দফারফা। চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এলেন। ধমক দেবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন অশোকের চোখমুখ দেখে। হাসিখুশি ছেলেটা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে যেন। লছমন এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরলেন অশোকের, 'আরে ক্যায়া হুয়া?'

অশোক নিরুত্তর। হাত-পা কাঁপছে ছেলেটার। হাঁপাচ্ছে। চোখমুখ ফ্যাকাশে। লছমন একটু ঘাবড়েই গেলেন এবার। অশোকের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন, 'বাতা তো সহি, হুয়া ক্যায়া?'

BanglaBook.org

কাহিনি সিকি শতক আগের, ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারির।

সূত্রপাত, ১৮৪, এজেসি বোস রোডে। মল্লিকবাজারের কাছে খ্রিস্টান কবরস্থানে। প্রায় একশো বিঘে জমির বিস্তারে যার অবস্থান, বহু স্মৃতির ধারক ও বাহক হয়ে। চারদিকে উঁচু দেওয়াল। যার কিছু অংশ ইতিউতি ভাঙা। ভিতরে বড় বড় আম-পাইন-মহুয়া-বট-অশ্বত্থের ছায়ায় শায়িত

১৮৪, এজেসি বোস রোডের খ্রিস্টান কবরস্থান

বহু কবরস্থ শরীর, অনন্ত শান্তিতে। পুরনো সেই দিনের কথায় আগ্রহীরা তো বটেই, এমনিও রোজই এখানে ঘুরতে আসেন দেশি-বিদেশি ট্যুরিস্টরা। এমন জায়গা আর ক'টাই বা আছে কলকাতা শহরে, যার প্রতিটি ইঞ্চি-সেন্টিমিটার-মিলিমিটারে ইতিহাস তার পায়ের ছাপ রেখে গেছে আলগোছে?

প্রবেশদ্বারের পাশেই খ্রিস্টান বেরিয়াল বোর্ডের সেক্রেটারির অফিস। পূর্বদিকে ক্রিমটোরিয়াল স্ট্রিট, আর তার পাশেই জনবহুল জাননগর বস্তি। সেক্রেটারি সাহেবের অফিসের কাছেপিঠে মালি আর কবরখননকারীদের ছোট ছোট কোয়ার্টার। তাঁদের পরিবারের ছেলেপুলেদের কাছে কবরস্থানের বিস্তৃত প্রাঙ্গণই এক পৃথিবী খুশি। এক কবর থেকে অন্য কবরের আড়ালে লুকোচুরি, আগডুম-বাগডুম, ঘুড়ি ওড়ানো, ভোকাট্টা।

ওই ভোকাট্টা থেকেই শুরু।

শীতের এক বিকেল-ছুঁইছুঁই দুপুরে ঘুড়ি ধরতে গিয়েই কবরস্থানের দীর্ঘদিনের এক কর্মীর কিশোর পুত্র অশোকের চোখে পড়ল ওই অদ্ভুতুড়ে দৃশ্যটা। কবর থেকে বেরিয়ে থাকা দুটো পা। আতঙ্কিত অশোক ছুটে এসে ঘুম ভাঙাল তার 'লছমনচাচার'। লছমন সিং, যিনি এই কবরস্থানের

BanglaBook.org

কর্মী হিসেবে কাজ করছেন প্রায় বছর তিরিশ হয়ে গেল। পড়িমরি করে দৌড়লেন লছমন এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ চোখ পলকের দেখায় বুঝে নিল, বড়সড় গণ্ডগোল আছে কোনও। এখানে কবর দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর হবে। তা ছাড়া কবরের মৃতদেহ রাখা হয় মাটির অনেক গভীরে, যাতে কুকুর-শিয়াল নাগাল না পায় আর দেহপচনের দুর্গন্ধও বাইরে না আসে। এ দেহ কবরের নয়। হতেই পারে না! এখনই সেক্রেটারি সাহেবকে খবর দেওয়া দরকার।

'খ্রিস্টান বেরিয়াল গ্রাউন্ড'-এর সেক্রেটারি টেরেন্স স্ট্যানলি আর্নল্ড অফিসেই ছিলেন। লছমনের মুখে সব শুনলেন। ঘটনাস্থলে এসে দেখলেন এবং কালবিলম্ব না করে দ্রুত অফিসে ফিরেই ডায়াল করলেন বেনিয়াপুকুর থানায়। ওসি-র জিপ মল্লিকবাজারের কবরখানার সামনে এসে ব্রেক কষল আর্নল্ড সাহেবের ফোন পাওয়ার মিনিট পনেরোর মধ্যেই।

দেশ বা বিদেশের যে-কোনও পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যখন তদন্ত-পদ্ধতি বিষয়ে পড়ানো হয়, একটা চ্যাপ্টার তুলনায় বেশি গুরুত্ব পায়। ঘটনাস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। পুলিশি পরিভাষায়, 'একজামিনেশন অফ দ্য পি.ও'। পি.ও, অর্থাৎ 'প্লেস অফ অকারেন্স'।

ওসি 'পি.ও' দেখলেন অনেকটা সময় নিয়ে। কবরখানার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের দেওয়াল থেকে সত্তর-আশি মিটার দূরে জায়গাটা। নির্জন, শুনশান। একেবারে প্রান্তসীমায়। চট করে নজরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। যে বা যারাই ঘটনাটা ঘটিয়েছে, স্থান নির্বাচনে বুদ্ধি খরচ করেছে যথেষ্ট।

একজোড়া পা যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে, তার থেকে বেশ কিছু ফুট দূরে জংলা ঘাসজমির উপর ছোপ ছোপ শুকনো লালচে-কালো দাগ। ফরেনসিক পরীক্ষা করলে তবেই বৈজ্ঞানিক শিলমোহর পড়বে, তবে ওই দাগ যে শুকিয়ে আসা রক্তেরই, তাতে প্রাথমিকভাবে কোনও সংশয় ছিল না একাধিক খুনের মামলার তদন্তের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ওসি-র। একটু দূরেই পড়ে আছে একজোড়া কালো বুটজুতো। তার পাশে একটা মাঝারি সাইজের সিমেন্টের স্ল্যাব। তাতেও শুকিয়ে রয়েছে লালচে-কালো দাগ। এটাও রক্ত না হয়ে যায় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হবে স্রেফ নিয়মরক্ষার জন্যই।

ওসি মোবাইলে ধরলেন ডিসি ইএসডি (ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশন)-কে, 'স্যার, মল্লিকবাজারের কবরখানায় একটা বডি পাওয়া গেছে। পি.ও দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ক্লিয়ার কেস অফ মার্ডার। মেরে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু গর্তটা খুবই শ্যালো খুঁড়েছিল। পা বেরিয়ে এসেছে। হোমিসাইডকে এখনই খবর দেওয়া দরকার।'

নিজে ঘটনাস্থলে রওনা দেওয়ার আগে ডিসি ডিডি (ডেপুটি কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান)-কে ফোনেই ব্রিফ করলেন ডিসি ইএসডি, 'আমি স্পটে যাচ্ছি স্যার। ওসি হোমিসাইডকে একটু বলে দিন। ফোটোগ্রাফার, ফরেনসিকস...।'

লালবাজার থেকে ওসি হোমিসাইড সদলবলে স্পটে চলে এলেন দ্রুতই। ফোটোগ্রাফার ছবি তুললেন নানান অ্যাঙ্গল থেকে। মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ তোলা হল উপরে। জল দিয়ে ভাল

BanglaBook.org

করে ধোয়ামোছার পর স্পষ্ট হল দেহের অবয়ব। বছর কুড়ি-বাইশের এক যুবক। গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে যেমন হয়। হাতের তালুতেও ক্ষতচিহ্ন একাধিক। মুখের ডানদিকটা থেঁতলে গিয়েছে অনেকটা। ওই সিমেন্টের স্ল্যাব দিয়ে মুখে আঘাত করে চেহারাটা বিকৃত করে দিতে চেয়েছিল খুনি বা খুনিরা। পোশাক বলতে জিন্‌স আর ফুলহাতা সোয়েটার। তার নীচে স্যান্ডো গেঞ্জি।

তৈরি হল 'সিজার লিস্ট'। যাতে থাকল খোঁড়া জায়গাটার কাছেই পড়ে থাকা বুটজুতো, লাল-কালো ছোপ লাগা মাটির কিছু অংশ। এবং তার সংলগ্ন ছোপবিহীন মাটির নমুনা কিছু (ফরেনসিক পরিভাষায় যাকে বলে 'control earth', যার সঙ্গে দাগ-লাগা অংশের তুলনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা, দুটি নমুনাই একই জমির কি না। এই প্রমাণ জরুরি বিচারপর্বে)। বাজেয়াপ্ত হল সিমেন্টের স্ল্যাবটাও।

ইতিমধ্যে এসে গিয়েছেন ডিসি ডিডি স্বয়ং। নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করেছেন পুরো প্রক্রিয়ার। সব শেষ করে যখন দেহ তোলা হচ্ছে গোয়েন্দাবিভাগের সিডি (কর্পস ডিসপোজাল) ভ্যানে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমেছে। সাড়ে ছ'টা বাজে প্রায়। রাতে আর ময়নাতদন্ত হওয়ার সুযোগ নেই। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেই।

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন আর্নল্ড সাহেব। তদন্তের বল গড়াতে শুরু করল। থানার সঙ্গে যৌথভাবে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার অফিসারদের সমন্বয়ে।

বেনিয়াপুকুর থানা। কেস নম্বর ৩২। তারিখ ১০/২/৯৪। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় মামলা। খুন এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ।

খুন অনেকেই হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহের নিরিখে এই খুনটা ছিল একেবারে অন্যরকম। ভরদুপুরে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কবরখানা থেকে খুন হওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার। যে সময়ের কথা লিখছি, তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সর্বময় উপস্থিতি ছিল না সমাজজীবনে। কিন্তু খবরের কাগজ তো ছিলই। যাতে ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকল খুনের বিবরণ এবং পুলিশি তদন্তের সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি। কাজ বাড়ল ক্রাইম রিপোর্টারদের। তদন্ত কিনারা করার চাপও যথানিয়মে বাড়ল পুলিশের উপর।

প্রথম কাজ দেহ শনাক্ত করা। শিকারের পরিচয় পেলে তবেই না শিকারির খোঁজ। কে খুন হলেন জানা গেলে তবেই না 'কেন-কীভাবে'-র দিকে এগনো। দেহ অজ্ঞাতপরিচয়ের হলে যা প্রচলিত প্রথা, শহরের সমস্ত থানায় বার্তা পাঠানো হল রাত্রেই। কলকাতা এবং তার আশেপাশে কোনও যুবক কি নিরুদ্দেশ হয়েছেন গত কয়েকদিনের মধ্যে? মিসিং ডায়েরি হয়েছে কোনও? উত্তর নেতিবাচক।

BanglaBook.org

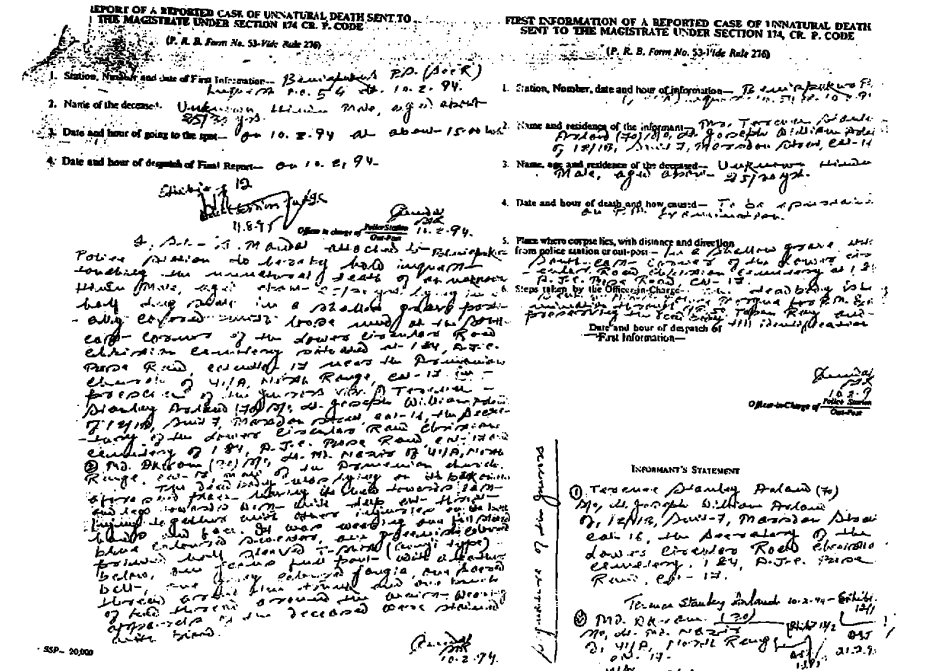

REPORT OF A REPORTED CASE OF UNNATURAL DEATH SENT TO THE MAGISTRATE UNDER SECTION 174 CR. P. CODE

(P. R. B. Form No. 53-Vide Rule 216)

1. Station, Number and date of First Information— Beniapukur P.S. (S.C.R.) Inquest No. 54 dt. 10.2.94.
2. Name of the deceased— Unknown Hindu Male, aged about 25/30 yrs.
3. Date and hour of going to the spot— On 10.2.94 at about 15.00 hrs.
4. Date and hour of despatch of Final Report— On 10.2.94.

Officer in charge of Police Station / Out-Post 10.2.94.

SSP— 20,000

FIRST INFORMATION OF A REPORTED CASE OF UNNATURAL DEATH SENT TO THE MAGISTRATE UNDER SECTION 174, CR. P. CODE

(P. R. B. Form No. 53-Vide Rule 216)

1. Station, Number, date and hour of information—
2. Name and residence of the informant—
3. Name, age and residence of the deceased— Unknown Hindu Male, aged about 25/30 yrs.
4. Date and hour of death and how caused—
5. Place where corpse lies, with distance and direction from police station or out-post—
6. Steps taken by the Officer-in-Charge—

Date and hour of despatch of First Information—

Officer-in-Charge of Police Station / Out-Post

INFORMANT'S STATEMENT

এফআইআর-এর প্রতিলিপি

ইতিবাচক দিশা মিলল ঘটনার পরের দিন দুপুরে। পার্ক সার্কাস ময়দানে মালির কাজ করতেন এক ভদ্রলোক। তাঁর দুই ছেলে, জ্যোতি রায় এবং রাম রায় বেনিয়াপুকুর থানায় এসে জানালেন, তাঁদের ছোটভাই গোপাল রায় একটি কুরিয়ার সার্ভিস সংস্থায় ডেলিভারির কাজ করে। গত ৬ তারিখ বেরিয়েছিল কাজে। ফেরেনি এখনও। শহরের বাইরে যেতে হয় মাঝেমধ্যে গোপালকে। দু-তিনদিনের মধ্যেই ফিরে আসে সচরাচর। এবার পাঁচদিন হয়ে গেল, ফেরেনি। কোনও আপদবিপদ হয়নি তো, এই আশঙ্কায় থানায় মিসিং ডায়েরি করতে আসা।

ওসি শুনলেন, এবং ছবি দেখালেন আগের দিন কবরখানা থেকে উদ্ধার হওয়া দেহের। যা একঝলক দেখেই দুই ভাইয়ের কান্না জানিয়ে দিল, খুন হওয়া ব্যক্তি গোপালই। শনাক্তকরণ-পর্ব সম্পন্ন।

সেদিনই বিকেলে নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শুরু হল গোপালের দেহের। উপস্থিত বেনিয়াপুকুর থানার সাব-ইনস্পেকটর শাহ্‌জামাল মণ্ডল। সরকারিভাবে ডাক্তারবাবুর সই হয়ে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পুলিশের হাতে আসতে সময় লাগে কিছুটা। তাই জটিল মামলায় ময়নাতদন্তের সময় তদন্তকারী অফিসারদের হাজির থাকাটাই রীতি। রিপোর্ট যখন আসার,

BanglaBook.org

আসুক। কিন্তু পোস্টমর্টেমের পরেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক জেনে নিতে হয়, কী থাকতে চলেছে রিপোর্টে। তদন্তের গতিপথ নির্ধারণে সুবিধে হয় অনেক।

পোস্টমর্টেম করার কথা হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান, প্রথিতযশা চিকিৎসক ড. রবীন বসুর। যাঁর কাছে মূলত দুটো জিনিস জানার ছিল শাহ্‌জামলের। এক, খুনের সম্ভাব্য দিন আর সময়। দুই, দেহের আঘাতের সমস্ত খুঁটিনাটি দেখে কী মনে হচ্ছে? খুনি এক, না একাধিক? একজনের পক্ষে সম্ভব বছর পঁচিশের শক্তসমর্থ যুবককে মেরে, মুখ থেঁতলে দিয়ে, মাটি খুঁড়ে এভাবে পুঁতে দেওয়া? থিয়োরিটিক্যালি অসম্ভব নয়। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি?

কাজ শুরুর আগে প্রথামাফিক ড. বসু বললেন শাহ্‌জামলকে, 'বডির জামাকাপড় ভাল করে দেখে নিয়েছেন তো?' উদ্ধারের পর দেহ যদি প্রাথমিকভাবে অজ্ঞাতপরিচয় থাকে, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয় মৃতের পোশাক-আশাক। বিশেষ করে 'tailoring mark'। রেডিমেড কেনা পোশাক হলে আলাদা কথা, কিন্তু পোশাক যদি বানানো হয় মাপজোক দিয়ে কোনও টেলর-এর দোকান থেকে, পরিধেয়র কোনও একটা জায়গায় সেই দোকানের নাম সেলাই করা থাকে সাধারণত। সেই চিহ্ন দেখে সংশ্লিষ্ট দোকানে গিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর করে মৃত অজ্ঞাতপরিচয়ের পরিচয় জানা যায় হামেশাই। এক্ষেত্রেও দেখা হয়েছিল দেহ উদ্ধারের পর। পাওয়া যায়নি কোনও 'টেলরিং মার্ক'। পকেটেও পাওয়া যায়নি কিছু। তা ছাড়া, ময়নাতদন্ত শুরু হচ্ছে যখন, ততক্ষণে থানা মারফত মৃতের পরিচয় জেনে গিয়েছেন শাহ্‌জামল।

তবু কী মনে হল শাহ্‌জামলের, বললেন, 'দেখা হয়েছে, স্যার, আরেকবার দেখে নিচ্ছি না হয়...।'

প্রাক্-পোস্টমর্টেম মৃতদেহকে খুঁটিয়ে দেখায় একটা বড় ভূমিকা থাকে সরকারি হাসপাতালের ডোমেদের। যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া কোনও ময়নাতদন্তই হওয়ার নয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কতশত দেহ আসে সরকারি হাসপাতালে। সেই দেহগুলি ডাক্তারবাবুর টেবিলে কাটাছেঁড়ার জন্য পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত ডোমেদের কাজ থাকে বহুবিধ। ফের গোপালের পোশাক নেড়েচেড়ে দেখার সময় এমনই একজন ডোমের নজরে এসেছিল ব্যাপারটা, শাহ্‌জামলকে বলেছিলেন দেহকে বিবস্ত্র করার সময়, 'স্যার, প্যান্টের এই জায়গাটা একটু কেমন যেন ফোলা লাগছে।'

কোন জায়গাটা? এমনিতে সাদা চোখে জিন্‌সের পকেটে কিছু নেই। কিন্তু ভাল করে হাতড়ে দেখলে একটা জায়গা সত্যিই একটু ফোলা লাগছে। শাহ্‌জামল দেখলেন মন দিয়ে এবং দ্রুত আবিষ্কার করলেন পকেটের ভিতর আলগাভাবে সেলাই করা আরেকটা ছোট পকেট। সেলাইটা ছিঁড়ে গেল হাতের আলতো টানেই। পকেটের ভিতরের পকেট থেকে বেরল ছোট্ট লাইটার একটা।

আরে, প্রথমবারের চেকিংয়ে কীভাবে মিস হয়ে গেল এটা? শাহ্‌জামল হামলে পড়লেন লাইটারটার উপর। যাতে দেখা যাচ্ছে সোনার জলে লেখা একটা অক্ষর। উঠে গেছে কিছুটা। কিন্তু পড়া যাচ্ছে। 'মা'।

BanglaBook.org

এই বয়সের যুবকের জিন্‌সের পকেটে আলাদা সেলাই করে লুকিয়ে রাখা লাইটারে 'মা'? লাইটারটা আরও মন দিয়ে দেখলেন শাহ্‌জামল, দেখালেন ড. বসুকেও। সাদা চোখেই দিব্যি বোঝা যাচ্ছে আরও দুটো অস্পষ্ট অক্ষরের ছাপ। অপটু হাতের সোনার জলের কাজ। মোট তিনটে অক্ষর লেখা ছিল লাইটারে। প্রথম দুটো অক্ষর উঠে গেছে। পড়ে আছে 'মা'।

ময়নাতদন্তের পর ড. বসু জানালেন, মৃতের হাতের তালুর ক্ষতচিহ্নগুলি 'defensive wounds', আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে পাওয়া আঘাত। প্রাথমিকভাবে যা আন্দাজ করেছিল পুলিশ, ডাক্তারবাবু সহমত হলেন তাতে। 'আততায়ী' নয়, সম্ভবত 'আততায়ীরা'। গোপাল-হত্যার নেপথ্যে এক নয়, আছে একাধিক। খুন হওয়ার সম্ভাব্য সময়? খুব সম্ভবত দিন চার-পাঁচ আগে। মানে ৬ বা ৭ ফেব্রুয়ারি।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের উপর এই মামলার তদন্তভার ন্যস্ত হওয়ারই ছিল। দেহ উদ্ধারের দিনদুয়েকের মধ্যেই ডিডি-কে দায়িত্ব দিলেন নগরপাল। গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার তরুণ সাব-ইনস্পেকটর সুশান্ত ধর (বর্তমানে গোয়েন্দাবিভাগেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার) নিযুক্ত হলেন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে।

কে খুন হয়েছেন, জানা আছে। আর আছে খুন হওয়া ব্যক্তির পকেটে পাওয়া একটা লাইটার, যাতে তিন অক্ষরের একটা নাম লেখা ছিল সোনার জলে। শেষ অক্ষর, 'মা'। ওই তিন অক্ষরের নামটা যে মৃত গোপালের প্রেমিকার, সেটা আঁচ করতে আইনস্টাইনের মেধার দরকার হয় না। দিদি বা বোনস্থানীয় কারও দেওয়া উপহার হলে ওভাবে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হত না।

লাইটারটা প্রেমিকা উপহার দিয়েছিলেন, নাকি নিজেই কিনে নাম লিখিয়েছিলেন গোপাল, সেটা পরের কথা। জরুরি কথা হল, এই প্রেমের কথা বাড়ির লোককে গোপাল কোনওমতেই জানতে দিতে চাননি বলেই জিন্‌সের মধ্যে অত সন্তর্পণে সেলাই করে লুকিয়ে রাখা।

বাড়ির লোক সত্যিই জানতেনও না। গোপালের পরিবারের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হল বিস্তারিত, কোনও বান্ধবী, কোনও প্রেমিকার কথা জানতেন? টের পেয়েছিলেন কোনওভাবে কিছু? একই উত্তর এল মা-বাবা-দাদাদের কাছ থেকে, 'না, তেমন কিছু তো শুনিনি। কিছু যদি থেকেও থাকে, আমরা জানতাম না।'

যে কুরিয়ার সংস্থায় কাজ করতেন গোপাল, তার কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলা হল। পাড়ায় যে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মাঝেমাঝে সময় কাটাতেন বলে জানা গেল, তাঁদের সঙ্গেও কথা বললেন সুশান্ত-শাহ্‌জামল। নিটফল শূন্য। ওঁরাও কিছু জানেন না।

পরিবার-পরিজন বা বন্ধুবান্ধব, কেউ কিছু জানতেন না বলে চেষ্টা আর লাইটারটা মিথ্যে হয়ে যায় না। 'ক্লু' বলতে ওই লাইটার ছাড়া আর আছেটা কী? সুশান্ত ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসলেন। শেষ অক্ষর 'মা', এই দিয়ে তিন অক্ষরের কী কী নাম হতে পারে মেয়েদের? তনিমা, প্রতিমা,

BanglaBook.org

চন্দ্রিমা, অণিমা, পরমা, সরমা.... ভাবতে বসলে এমন অজস্র-অগুনতি। একপ্রকার তো খড়ের গাদায় সূচ খোঁজাই। হয় নাকি ওভাবে?

টিভি-র 'সিআইডি'-জাতীয় জনপ্রিয় ক্রাইম সিরিজ় হলে হয়তো দেখা যেত, 'মা' দিয়ে শেষ হচ্ছে, এমন তিন অক্ষরের নামের যত তরুণী আছেন শহরে, তার তালিকা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি করে ফেলছেন তদন্তকারীরা। এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দ্রুত চিহ্নিত করে ফেলছেন মৃতের প্রেমিকাকে। কিন্তু কল্পনা কল্পনায় থাকে। বাস্তব বাস্তবেই। ওভাবে 'রিল লাইফে' হয়। 'রিয়েল লাইফে' নয়।

ডাক পড়ল স্থানীয় সোর্সদের। গোপালের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর চাই। আর খবর! ঘটনার আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও সোর্সরা জানাতে পারল সেটুকুই, যেটুকু হয় জানাই ছিল, বা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। একুশ বছরের গোপালের পড়াশুনো বেশিদূর হয়নি। কুরিয়ার সার্ভিসের 'ডেলিভারি বয়'-এর সামান্য চাকরি। রোজগারও সামান্যই। মধ্যবিত্ত পরিবার গোপালদের। দুই দাদা, তাদের পরিবার, আর মা-বাবা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সুযোগ ছিল না গোপালের। নেহাতই ছাপোষা দিনযাপন। কোনও বান্ধবীর সন্ধান? জানা যাচ্ছে না এখনও।

সুশান্ত একটু হতাশই হয়ে পড়ছিলেন। তদন্ত কতটা এগোল, ডিসি ডিডি ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'মনিটর' করছেন, খোদ নগরপাল খোঁজ নিচ্ছেন দৈনিক। অথচ ওই লাইটারেই এখনও আটকে আছে যা কিছু। আটকে যে থাকবে না বেশিদিন আর, তদন্তের গাড়ি হঠাৎই যে চলতে শুরু করবে গড়গড়িয়ে, দেহ উদ্ধারের তিনদিন পরে সকালে লালবাজারে ঢোকার সময়ও ভাবতে পারেননি সুশান্ত।

ডিডি বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখেই দেখা ওসি ওয়াচ-এর সঙ্গে। গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ অফিসার। দারুণ চালান 'ওয়াচ সেকশনটা', যার কাজ মূলত শহরের পকেটমারদের উপর নজরদারি এবং গ্রেফতার। সুশান্তকে খুবই পছন্দ করেন ভদ্রলোক। চোখাচোখি হতেই পিঠে হাত রাখলেন, 'কী রে, কী খবর?'

সুশান্ত ম্লান হাসেন, 'চলছে স্যার।'

ওসি ওয়াচ একটু থমকান। তাকান সুশান্তর মুখের দিকে, 'চলছে মানে? তোর বয়সে তো দৌড়নোর কথা। ওই কবরখানার কেসটা নিয়ে চাপে আছিস বুঝি? কিছু হল ওটার?'

সুশান্ত মাথা নাড়েন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রবীণ ফের পিঠে হাত রাখেন নবীনের, 'আরে, হবে হবে। অত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারালে চলে? এই দ্যাখ না, একটা পিকপকেট গ্যাং মাথা খারাপ করে দিয়েছিল গত দেড় মাস ধরে। রোজ ঝাড় খাচ্ছিলাম ডিসি-র কাছে। অপারেট করছিল শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে। প্রতি সপ্তাহে অ্যাট লিস্ট দুটো করে পিকপকেটের কেস। নতুন গ্যাং। হদিশই পাচ্ছিলাম না। গতকাল বিকেলে ফাইনালি ধরা পড়েছে।'

BanglaBook.org

সুশান্ত পকেটমার ধরার বৃত্তান্তে উৎসাহ পাচ্ছিলেন না তেমন। এমনিতেই মনটা দমে আছে। তবু কৃত্রিম কৌতূহল দেখাতেই হল, 'দারুণ খবর স্যার। নতুন গ্যাং?'

'আর বলিস না! নতুন গ্যাং-ই। দুটো মেয়ে। মহিলাদের চট করে কেউ পকেটমার বলে সন্দেহ করে না। সেটার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছিল। গীতা নস্কর আর উইলমা ফার্নান্ডেজ। বাড়িতে সার্চ করে অনেক রিকভারি হয়েছে। পিক আওয়ার্সে শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেরনোর ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কাজ সারত।'

সুশান্তকে বলতেই হয়, 'কনগ্র্যাচুলেশনস স্যার।'

ওসি ওয়াচ ঢুকে পড়েন নিজের ঘরে। আর সুশান্ত হাঁটা দেন নিজের অফিসের দিকে। একটু পরেই ডাক পড়বে ওসি হোমিসাইড-এর ঘরে। জানতে চাওয়া হবে মামলার অগ্রগতি। কী বলবেন? এই তো শুনলেন, একটা পকেটমার গ্যাং ডিটেক্ট করতেই দেড় মাস লেগে গেল ওয়াচ সেকশন'-এর। আর খুনটা তো হয়েছে এই সেদিন। সময় লাগবে না একটু?

আত্মপক্ষ সমর্থনে সাজানো যুক্তিগুলো সুশান্তের নিজেরই নড়বড়ে লাগছিল। অপরাধের গুরুত্ব বিচারে পকেটমারির সঙ্গে এই ধরনের সাড়া ফেলে দেওয়া খুনের কোনও তুলনা হয়? পিকপকেটের তুলনায় খুন নিয়ে কর্তারা বেশি মাথা ঘামাবেন, স্বাভাবিক। চাপ তো আসবে দ্রুত সমাধানের। হইচই তো কম হচ্ছে না।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন সুশান্ত। নামদুটো কী যেন বললেন ওসি ওয়াচ? গীতা আর উইলমা। উইলমা? নামটা চার অক্ষরের অবশ্য, কিন্তু 'মা' দিয়ে শেষ। খ্রিস্টান নাম। লাইনের উদ্ধারের পর 'প্রতিমা-সুরমা-তনিমা' ইত্যাদিই মাথায় এসেছিল কিন্তু এমন তো হতেই পারে, গোপালের সঙ্গে ভিন্ন ধর্মের কোনও তরুণীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। বেনিয়াপুকুর-তপসিয়া এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরই সংখ্যাধিক্য। এই অ্যাঙ্গেলে ফের একবার খোঁজখবর করলে হয় না? আলোর রেখা যখন দূরবিন দিয়েও দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে ক্ষতি কী আর?

সুশান্ত আলোচনা করলেন ওসি হোমিসাইডের সঙ্গে। তিনি আইডিয়াটা শুনে বললেন 'দেখা যেতেই পারে খোঁজ নিয়ে। তবে একটা কথা বলি। তুমি আগে থেকে ধরেই নিচ্ছ, গোপালের বান্ধবী ওর থেকে ছোট হবে বয়সে বা সমবয়সি। বা দু'-এক বছর বড়। এমনও তো হতে পারে, উনি গোপালের থেকে দশ-বারো বছরের বড়। এবং কে বলতে পারে, হয়তো বিবাহিতাও। হয়তো স্থানীয় নন। হয়তো থাকেন গোপালের বাড়ি থেকে বহু দূরে। হয়তো কলকাতার বাইরে। অসম্ভব বা খুব অস্বাভাবিক কিছু কি?'

সুশান্তকে হতোদ্যম দেখায়, ওভাবে ভাবলে তো খোঁজার কোনও শেষ নেই স্যার। সেই খড়ের গাদায় সূচ খোঁজাই তো হল!'

ওসি হোমিসাইড থামিয়ে দেন সুশান্তকে, 'আরে আমি একবারও বলছি না, তোমার আইডিয়াটা

BanglaBook.org

খারাপ। আমি শুধু পসিবিলিটিজগুলোর কথা বলছি। আগে থেকে কিছু প্রিজিউম না করতে বলছি। তবে আই এগ্রি উইথ ইউ, ডেফিনিট লিড যখন পাওয়া যাচ্ছে না, ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথডে যাওয়া যেতেই পারে। লাগল তো লাগল, না লাগল তো না লাগল। ফোকাসটা ন্যারো করে এনেই চেষ্টা করো। স্থানীয় তরুণী এবং আনম্যারেড—টার্গেট বেস এটাই রাখো আপাতত। সার্কলটা এর থেকে বড় করা মানে ওই যেমন বললে, খড়ের গাদায় সুচ...। লাভ নেই।'

স্থানীয় সোর্স যারা আছে, তাদের দিয়ে এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি। অশ্বডিম্বই প্রসব করেছে। এমন একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল, যে একসময় পুলিশের সবচেয়ে দাপুটে সোর্স ছিল মধ্য এবং পূর্ব কলকাতায়, বহু মামলার সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল যার। এই প্রাক্তন সোর্স বেশ কয়েক বছর হল নিজের ছোটখাটো স্টেশনারির ব্যবসা শুরু করেছে ট্যাংরায়। পুলিশের সঙ্গে খবর আদানপ্রদানে নিষ্ক্রিয় অনেকদিন হল, কিন্তু লালবাজারের অনুরোধ বলে কথা। সক্রিয় হল আরেকবার।

সোর্সের আসল নাম উহ্য থাক। নাম ধরা যাক আমজাদ। কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল আমজাদকে। খবর চাই, 'মা' দিয়ে শেষ হচ্ছে তিন অক্ষরের নাম, এমন অবিবাহিতা তরুণী কে কে আছেন গোপালের বাড়ির কাছাকাছি, তপসিয়া-বেনিয়াপুকুর এলাকায়, সে যে ধর্মেরই হন না কেন, যে সম্প্রদায়েরই হন না কেন।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট'। সব পেশার ক্ষেত্রেই সারসত্যি এটা। অন্য সোর্সরা খাবি খাচ্ছিল, কিন্তু আমজাদ খবর আনল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।

কী খবর? নাম এমন অনেকই আছে। অসংখ্য। সেলিমা, আসমা, আলিমা, রহিমা ...। কিন্তু বয়সের হিসেব মিলছে শুধু তিনজনের সঙ্গে। কুড়ি-একুশের অবিবাহিতা তরুণী বলতে পাওয়া যাচ্ছে তিনটে নাম। সালমা হায়দার, ফতিমা জাভেদ আর রেশমা আলি।

সে না হয় হল। কিন্তু স্রেফ একটা আন্দাজের উপর কি আর ওভাবে দুম করে বাড়ি চলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় কোনও তরুণীকে? আরও খবর চাই ওঁদের ব্যাপারে। বাড়িতে কে কে আছে, কে কী করেন, পাড়ায় কার কী ধারণা ওদের ব্যাপারে, কারও বিষয়ে প্রেম ঘটিত কিছু জানা যাচ্ছে কি না, এইসব।

হোমওয়ার্ক করেই এসেছিল আমজাদ। জানাল, সালমার বিয়ে আগামী এপ্রিলে। সম্বন্ধ করে। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের পরিবারেরই। কোনও জটিলতার খবর নেই। ফতিমা যথেষ্ট উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কলকাতার অভিজাত কলেজে ইংরেজি অনার্স পড়ছে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রেমঘটিত কিছু জানা যাচ্ছে না।

—আর রেশমা?

—এই রেশমার কিন্তু গল্প আছে স্যার। নাদির বলে ট্যাংরায় একটা ছেলে আছে। এই

BanglaBook.org

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। একটা গ্যারেজে মেকানিকের কাজ করে। খুচরো মস্তানির জন্য বছরখানেক আগে তপসিয়া থানা অ্যারেস্ট করেছিল। 'কষ' আছে চেহারায়। হেবি লম্বা-চওড়া।

সুশান্ত শুনতে থাকেন নিশ্চুপ। বলতে দেন আমজাদকে। গড়পড়তা সোর্সদের স্বভাব জেনে গিয়েছেন এতদিনে। আসল খবরে আসতে সময় নেয় ইচ্ছে করে। সুতো ছাড়ে ধীরে ধীরে। কিন্তু এই আমজাদ অন্য গোত্রের। ধান ভানতে শিবের গীতের গল্প করে না। পয়েন্টে আসে চট করে।

পয়েন্টে এল। এবং শুনে সুশান্ত উত্তেজনার ওম টের পেলেন শরীরে। আমজাদ বলল, 'এই নাদির সাত তারিখ বিকেল থেকে মহল্লায় নেই স্যার। কোথায় কেটে গেছে বাড়ির লোকও বলতে পারছে না। বাড়িতে শুধু বলে গেছে, নতুন চাকরির খোঁজে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। যে গ্যারেজে কাজ করে, তার মালিকও কিছু জানে না। এই নাদিরের সঙ্গে রেশমা বলে মেয়েটার হেব্বি বাওয়াল হয়েছিল হপ্তাদুয়েক আগে। চার নম্বর ব্রিজের কাছে।'

—রেশমার বাড়িতে কে কে আছে?

—আব্বু-আম্মা আর ছোট ভাই। আব্বুর জুতোর দোকান আছে একটা ছোট। রেশমা কলেজে পড়ে। ওর ভাই স্কুলে।

সুশান্ত খবরটা দ্রুত সাজিয়ে নিলেন মাথায়। ময়নাতদন্ত বলছে, খুনটা হয়েছে ৬ বা ৭ তারিখ। ৭ তারিখ বিকেল থেকে নাদির এলাকা থেকে বেপাত্তা। কেন? এই নাদিরের সঙ্গে কিছুদিন আগে রেশমা বলে স্থানীয় তরুণীর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। কী নিয়ে ঝগড়া? জানতে হবে। মৃত গোপালের জিন্সের পকেট থেকে পাওয়া লাইটারের শেষ অক্ষর 'মা'। প্রথম দুটো অক্ষর কি তা হলে 'রেশ?' পুরো কথাটা 'রেশমা'? গোপালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এই রেশমার? সেটা নিয়েই ঝগড়া নাদির-রেশমার? প্রণয়ঘটিত ঈর্ষার চেনা বাস, চেনা রুট?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খোলেন সুশান্ত।

—নাদিরের খোঁজ লাগা। কোথায় যেতে পারে মনে হয়?

—লোকাল সেয়ানা স্যার। লোকালিটি থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? জাননগরে বাড়ি। পাড়ায় ফিরতেই হবে। আমি লেগে আছি স্যার। পেয়ে যাব।

—হুঁ, রেশমার বাড়িটা একজ্যাক্টলি কোথায়?

তপসিয়া রোড সংলগ্ন একটা গলির মুখে একতলা বাড়ি। বাইরের সাদামাটা রংচটা দেওয়ালে চোখ বুলোলেই বোঝা যায়, এবাড়ির বাসিন্দারা মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। সুশান্ত যখন একজন

BanglaBook.org

এএসআই এবং এক মহিলা কনস্টেবলকে নিয়ে সাদা পোশাকে পৌঁছলেন রেশমাদের বাড়ির সামনে, সন্ধে প্রায় সাড়ে সাতটা।

'লালবাজার থেকে আসছি, একটু দরকার ছিল' —শুনেই ঘাবড়ে গেলেন মাঝবয়সি গৃহকর্তা। সুশান্ত আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন যথাসাধ্য, 'চিন্তার কিছু নেই। রেশমা কি আপনার মেয়ে?' এবার চূড়ান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখায় ভদ্রলোককে, 'হ্যাঁ, কেন? কী ব্যাপার?' সুশান্ত বললেন, 'ব্যাপার সামান্যই। আপনার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

রেশমা বেরিয়ে এলেন। বসার ঘরের সোফায় কুঁকড়ে বসলেন মা-বাবার সঙ্গে। দৃশ্যতই অস্বস্তিতে। সুশান্ত কোনওরকম ভনিতা না করেই শুরু করলেন।

—দেখুন, একটা কথা শুরুতেই বলে নিই। আপনাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি শুধু কয়েকটা জিনিস জানতে এসেছি। রেশমা যতটুকু জানেন, বললে আমাদের সুবিধে হয় একটা কেসের ব্যাপারে।

রেশমা মুখ তুলছেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেয়ের হয়ে বাবাই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ. বলুন না!'

সুশান্ত এবার সোজা তাকান রেশমার দিকে।

—আপনি গোপাল রায় বলে কাউকে চেনেন?

নামটা উচ্চারণ করা মাত্র শরীরী ভাষা বদলে যায় বছর কুড়ির রেশমার। ফোঁপাতে শুরু করেন। তরুণীর মা-বাবা ততক্ষণে ঘাবড়ে গেছেন মেয়ের রকমসকম দেখে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে ওঁদের। সুশান্ত একটা চাপা শ্বাস ফেলেন স্বস্তির। ঠিক জায়গাতেই এসেছেন. নিশ্চিত।

কান্নার বেগ ক্রমে বেড়ে চলেছে রেশমার। সুশান্ত বোঝেন, মেয়েটিকে শান্ত করা প্রয়োজন সবার আগে। তাকান সঙ্গে আসা মহিলা কনস্টেবলের দিকে। যিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যান, কী করণীয় এখন। এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রাখেন রেশমার। সুশান্ত মুখ খোলেন ফের।

—রেশমা, আপনি প্লিজ শুনুন একটু মন দিয়ে। আমরা শুধু জানতে চাইছি, আপনি গোপাল রায় নামের কাউকে চিনতেন কিনা। শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বললেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, এই মামলায় কোনওভাবে আপনার নাম জড়াবে না। কোর্টকাছারির কোনও ঝামেলা থাকবে না। শুধু সত্যিটা বলুন।

রেশমা নিরুত্তর। মা-বাবা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছেন মেয়ের মুখের দিকে। দমবন্ধ অবস্থা ঘরে। সুশান্তই ফের কথা শুরু করেন।

—গোপাল যে খুন হয়েছে, বডি পাওয়া গেছে কবরখানা থেকে, শুনেছেন নিশ্চয়ই?

ফের কান্নার দমক। এবার আর থামানোর চেষ্টা করলেন না সুশান্ত। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে ধরলেন রেশমার সামনে।

—এই লাইটারটা গোপালের পকেট থেকে পাওয়া গেছে। এর উপর সোনার জলে একটা নাম...।

BanglaBook.org

কথা শেষ করতে পারেন না সুশান্ত। লাইটারটা দেখেই মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন রেশমা। সুশান্ত পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়ান, রেশমার মা-বাবাকে বলেন, 'আপনারা মেয়েকে একটু ভিতরে নিয়ে যান, একটু শান্ত করুন। তারপর ওর সঙ্গে কথা বলব। আমরা অপেক্ষা করছি। এক গ কথা প্লিজ মনে রাখুন, আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিলেই হবে । আবার বলছি, সরকারিভাব কোনও ঝামেলায় জড়াতে হবে না আপনাদের মেয়েকে। আপনাদের পরিবারকে। শুধু সত্যি গ বললেই হবে।'

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে রেশমা ফের সুশান্তের মুখোমুখি হলেন প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে। রেশমার মুখমুখ ফুলে গেছে এরই মধ্যে। বোঝা যাচ্ছে, গত আধঘণ্টা অঝোরে কেঁদেছেন। রেশমার মা-বাবার অবস্থা দেখেও খারাপ লাগে সুশান্তর। দু'জনকেই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। দেখানোরই কথা। কারও সাতে-পাঁচে না-থাকা ছাপোষা পরিবার এঁদের। সেখানে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ই এক সন্ধেয় বাড়িতে পুলিশ আসছে। আর মা-বাবা আবিষ্কার করছেন, তরুণী মেয়ের সঙ্গে গোপন প্রেম ছিল এক স্থানীয় যুবকের। যে কিনা খুন হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে।

রেশমার বাবা কোনওমতে আমতা-আমতা করে বললেন, 'আপনার যা জিজ্ঞেস কর র আছে, করুন। যা জানে বলবে ও। আমরা জানতাম না এই গোপাল বলে ছেলেটির কথা। এখন জিজ্ঞেস করে মালুম হল।'

রেশমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েই বললেন, যতটুকু জানতেন। সুশান্ত যেমনটা আন্দাজ করেছিলেন আমজাদের থেকে খবর পাওয়ার পর, ঘটনাক্রম মোটামুটি তেমনই। রেশমা এবং গোপাল প্রেম পড়েছিলেন পরস্পরের। প্রেমপর্বের দেখাসাক্ষাৎ হত অত্যন্ত গোপনে এবং কদাচিৎ। দুই পরিবারের কেউই জানতে পারেননি। পাড়াপ্রতিবেশীরাও নয়। রেশমার প্রবল প্রণয়প্রার্থী ছিল নাদির। রেশমাকে 'প্রেমপ্রস্তাব' দেওয়ার চেষ্টা করেছিল একাধিকবার। রেশমা সাড়া দেননি। নাদির অবশ্য হাল ছাড়েনি। নানান ছুতোনাতায় মরিয়া চেষ্টা করেই যেত রেশমার মনোযোগ পাওয়ার।

এই নাদির কিছুদিন আগে সন্ধের দিকে এন্টালির 'জেম' সিনেমার কাছে একসঙ্গে দেখে ফেলে রেশমা-গোপালকে। পরের সন্ধেতেই টিউশন থেকে ফেরার পথে রেশমার পথ আটকায় নাদির। গোপালের সঙ্গে কিসের এত ভাব ? সরাসরি জবাবদিহি দাবি করে রেশমার কাছে। উত্তেজিত বাক্যবিনিময় হয়।

লাইটারটা গোপালকে উপহার দিয়েছিলেন রেশমাই। তবে তার উপর সোনার জলে 'রেশমা' লেখার ব্যাপারটা জানতেন না। মানে, নামটা গোপালই লিখিয়েছিলেন এবং সযত্নে রেখ দিয়েছিলেন প্রেমের স্মারক হিসেবে।

রেশমাদের বাড়ি থাকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় মেজাজটা ঝুরঝুরে লাগে সুশান্তের। যাক, কেসটা এখন 'ডিটেকশন'-এর দোরগোড়ায়। খুনের সম্ভাব্য মোটিভ পাওয়া গেছে। নাদিরকে ধরতে পারলে দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

BanglaBook.org

অপেক্ষা স্বল্পস্থায়ীই হল। আমজাদ ঠিকই বলেছিল, 'লোকাল সেয়ানা'। 'লোকালিটি' ছেড়ে পালিয়ে আর কতদিন ? ১৭ ফেব্রুয়ারি, দেহ উদ্ধার হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় ধরা পড়ল নাদির। আমজাদ পাকা খবর দিয়েছিল। সন্ধেবেলায় পার্ক সার্কাস স্টেশনে লোক রাখতে বলেছিল সুশান্তকে। ট্রেন থেকে নামতেই চিনিয়ে দিয়েছিল পঁচিশ বছরের নাদিরকে।

স্টেশন থেকে সোজা লালবাজারে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু হয়েছিল নাদিরের। যার বাঁ হাতের তর্জনীতে স্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। এটা কী করে হল? শিশুর সারল্য নিয়ে নাদির বলল, এন্টালিতে গাড়ি সারাইয়ের যে গ্যারেজে কাজ করে, সেখানে কিছুদিন আগে টিনের পাতে লেগে কেটে গিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, ডাহা মিথ্যে। তবু নিয়ে যাওয়া হল গ্যারেজে। মিথ্যে ধরা পড়ল। এরপর গুছিয়ে একটা থাপ্পড়, এবং যাবতীয় প্রতিরোধ শেষ।

খুনটা ঠিক কীভাবে হয়েছিল, আদ্যোপান্ত খুলে বলল নাদির। প্রকাশ্যে এল গোপাল-হত্যার নেপথ্যকাহিনি।

—আমি রেশমাকে পাগলের মতো ভালবাসতাম স্যার। মনে হত, ও চাইলে জানও দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ও আমাকে পাত্তাই দিত না। যে-দিন সন্ধের দিকে এন্টালিতে ওদের দু'জনকে হাত-ধরাধরি করে দেখলাম, দিমাক খারাপ হয়ে গেল। গোপালকে চিনি আমি। এলাকার ছেলে। মুখচেনা, তবে আলাপ ছিল না তেমন। রেশমার সঙ্গে গোপালকে দেখে রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। গোপালের মধ্যে কী দেখল মেয়েটা?

রেশমাকে ধরলাম পরের দিন সন্ধেবেলা। পার্ক সার্কাসে চার নম্বর ব্রিজের কাছে। জানতাম, ওই সময় কোচিং ক্লাস থেকে বাড়ি ফেরে। আমি স্ট্রেট বললাম, 'তোমাকে গোপালের সঙ্গে দেখলাম কাল বিকেলে। ওর সঙ্গে মিশছ কেন?' রেশমা ভীষণ রেগে গেল। বলল, 'তাতে তোমার কী? ওকে ভাল লাগে, তাই মিশছি। বেশ করছি।'

—তারপর?

—শুনে মাথা দপদপ করছিল। রেশমার সঙ্গেই আমার নিকাহ হবে, এই খোয়াব দেখতাম। সারারাত ঘুমতে পারলাম না স্যার। মনে হচ্ছিল, রাতেই গোপালের বাড়ি চলে যাই। মেরে মুখ ফাটিয়ে দিই।

আমার দুই কাছের বন্ধু রাজ আর আজাদকে সব খুলে বললাম পরের দিন। রাজ বলল, মাথা গরম করিস না। এই গোপাল মালটাকে রাস্তায় ধরে একটু চমকে দিই চল। আজাদ সায় দিল, বলল, দরকার হলে সলিড কয়েক ঘা দিয়ে দেব। রেশমার দিকে আর কখনও চোখ তুলে তাকানোর সাহস হবে না। আমিও ভাবলাম, ঠিকই বলছে। থ্রেট দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

—হুঁ...

—রাজ বুদ্ধি দিল, পাড়াতে এসব করতে গেলে হল্লা হয়ে যাবে। নির্জন কোনও জায়গায় গোপালকে নিয়ে যেতে হবে। আজাদও বলল, হ্যাঁ, এমন কোথাও, যেখানে কেউ আশেপাশে

BanglaBook.org

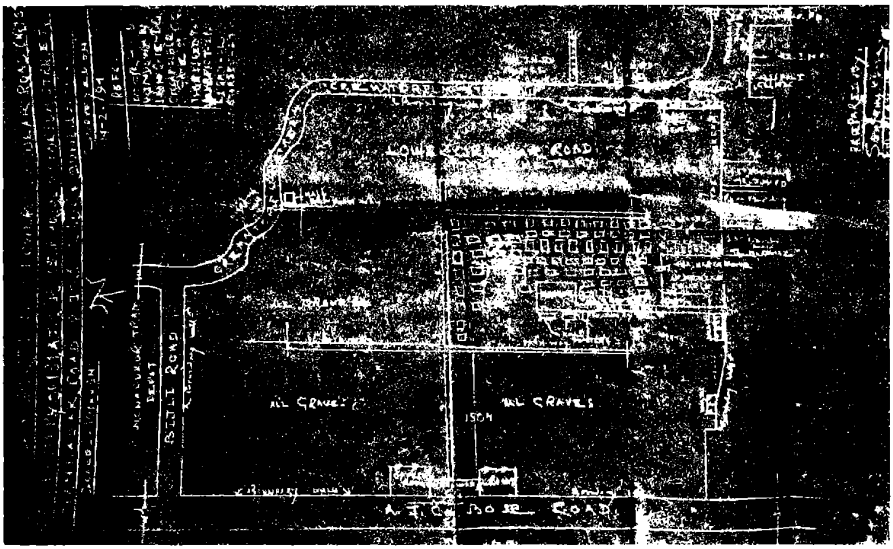

গদন্তে ব্যবহৃত ঘটনাস্থলের ম্যাপ

থাকবে না। আমি বললাম, কিন্তু গোপাল আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হবে কেন? রাজ হাসল, 'আরে, ওটা কোনও প্রবলেমই না। আমার সঙ্গেও ওর মুখচেনা আছে। আমি কায়দা করে নিয়ে আসব। আগে জায়গাটা ঠিক কর তোরা।'

আজাদ বলল, জানানগরের কবরখানায় নিয়ে গেলে কেমন হয়? আজাদের কথাটা মনে ধরল আমার। ফাঁকা জায়গা, সন্ধের পর একটা লোকও থাকে না। অফিসঘরটার কাছে ছাড়া ভিতরে কোথাও জোরালো লাইটও নেই। পাঁচিল ভাঙা অনেক জায়গায়। ঢুকতে অসুবিধে হবে না।

—বুঝলাম...

—আমরা প্ল্যান বানালাম। ঠিক হল, আমি একটা ক্ষুর জোগাড় করে আনব ভয় দেখানোর জন্য। মারার কোনও প্ল্যান ছিল না স্যার, বিশ্বাস করুন। গোপাল রাত করে বাড়ি ফেরে, মল্লিকবাজার দিয়ে। রাজ ওকে রাস্তায় ধরে বলবে, ওর কোনও আত্মীয়ের অসুখ। হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য লাগবে। এই বলে ও কবরখানার পিছনের রাস্তায় নিয়ে আসবে। আমরা ওখানে অপেক্ষা করে থাকব।

—বেশ ...

—প্ল্যানমাফিকই হল সব। রাজ কবরখানার পিছনের রাস্তায় নিয়ে এল গোপালকে। আমাকে আর আজাদকে দেখে চমকে গেল গোপাল। রাজ ওকে বলল, 'রেশমার সঙ্গে তোর নাকি ইশক চলছে শুনলাম।' গোপাল রেগে গেল, 'তাতে তোর কী? তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে

BanglaBook.org

আনলি কেন?' আমি পকেট থেকে ক্ষুরটা বার করে সোজা গলায় ঠেকিয়ে দিলাম, 'ভিতরে চল, বলছি। না হলে এটা স্ট্রেট চালিয়ে দেব, মা কসম।'

গোপাল হকচকিয়ে গেল। পাঁচিলের ভাঙা জায়গার কোনখান দিয়ে ঢুকব, কোথায় বসব, আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। গোপালকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে রাজ আর আজাদ চমকে-ধমকে বোঝানোর চেষ্টা করল অনেক। গোপাল কিছু বলছিল না। মুখ গোঁজ করে বসেছিল। আমি শেষে বললাম, 'দ্যাখ গোপাল, আমি রেশমাকে অনেকদিন ধরে ভালবাসি। তুই এর মধ্যে ঢুকিস না। আর যদি কখনও রেশমার সঙ্গে তোকে দেখি, হাওয়া করে দেব একেবারে।'

আমি এটা বলামাত্রই খেপে গেল গোপাল। চিৎকার করতে শুরু করল, 'কী ভেবেছিস তোরা? মিথ্যে বলে ডেকে এনে ভয় দেখাবি, আর আমি রেশমাকে ভুলে যাব? তোকে রেশমা কেন পছন্দ করে না জানিস? তোর এই মাস্তানি স্বভাবের জন্য। রেশমা কার সঙ্গে মিশবে, আমি কার সঙ্গে মিশব, তুই ঠিক করে দেওয়ার কে রে? হাওয়া করে দিবি মানে? আমি কালই থানায় কমপ্লেন করছি দাঁড়া।'

আমার যে কী হয়ে গেল স্যার... গোপালের মেজাজ দেখে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর উপর। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। গোপাল পড়ে যেতেই আমি ওর গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিলাম রাগের মাথায়। পড়ে যাওয়ার পর গোপালও হাত-পা চালানোর চেষ্টা করেছিল। রাজ আর আজাদ তখন চেপে বসেছিল ওর বুকের উপর। প্রচুর রক্ত বেরচ্ছিল গোপালের গলা দিয়ে। একটু পরে ও স্থির হয়ে গেল। আমরা নাকের কাছে হাত দিয়ে বুঝলাম, নিশ্বাস পড়ছে না, মরে গেছে। খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম আমরা। মারতে চাইনি স্যার, হঠাৎ করে কী যে হয়ে গেল.....

—কী চেয়েছিলিস না চেয়েছিলিস সেটা আমরা বুঝব। বাকিটা বল।

—বলছি স্যার। আমরা ভাবলাম, বডিটা না সরিয়ে ফেললে তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। থানা-পুলিশ হবে। ধরা পড়লে লাইফ বরবাদ। জেল যেতে হবে। কিন্তু সরাব কোথায়? রাজই বলল, এই কবরখানাতেই পুঁতে দিই চল। লাশ না পেলে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। আজাদ বলল, পেলেও কেউ চিনতে পারবে না এমন ব্যবস্থা করতে হবে। কাছেই একটা ভারী সিমেন্টের টুকরো পড়ে ছিল। সেটা নিয়ে এসে গোপালের মুখের উপর আছড়ে ফেললাম।

—পুঁতলি কীভাবে বডিটা?

—ওখানে পুরনোদিনের অনেক মূর্তি আছে স্যার। দামি মার্বেল পাথরের। চোরেরা এসে পাথর ভেঙে নিয়ে যায়। মূর্তির মাথাও কেটে নিয়ে যায়। ভাঙা পাথরের বড় বড় টুকরো অনেক থাকে ওখানে। একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়। আমরা তিনজন ভারী কয়েকটা পাথরের টুকরো খুঁজে আনলাম। সেই দিয়ে মাটির কিছুটা তাড়াতাড়ি খুঁড়ে গোপালের বডি পুঁতে দিলাম।

—তোর বাঁ হাতের কাটা দাগটা? ক্ষুর থেকেই তো?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ স্যার। ক্ষুর চালানোর সময় গোপাল হাত চালিয়েছিল। আমার হাতেও ক্ষুর লেগেছিল। অনেকটা রক্ত ছিটকে এসে আমার পাজামাতে লেগেছিল। পাজামা আর ক্ষুর, দুটোই কবরখানাতেই মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছিলাম। গোপালের ঘড়ি আর মানিব্যাগটা আজাদ নিয়েছিল।

সে রাতে বেরনোর সময়ই আমরা ঠিক করলাম, হপ্তাখানেক এলাকায় থাকব না। সব ঠান্ডা হয়ে গেলে ফিরে আসব। ব্যান্ডেলে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। টাকা ফুরিয়ে আসছিল। বেশিদিন কামাই করলে গ্যারাজের চাকরিটাও চলে যেত।

—রাজ আর আজাদকে কোথায় পাওয়া যাবে ?

—সেটা বলতে পারব না স্যার।

আজাদকে ধরতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। সোর্স মারফত খবর এল দিন পনেরোর মধ্যেই। এদিক-ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। নাদিরের মতো আজাদকেও ফিরতে হতই জাননগরের বাড়িতে। চালু ছিল নিশ্ছিদ্র নজরদারি। এলাকায় পা রাখার ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ধরা পড়ল জালে।

বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা রাজ বরং বিস্তর ভোগাল পুলিশকে। ধরা পড়ল প্রায় এক বছর পরে। পালিয়ে গিয়েছিল বিহারে। রাজকে ফেরার দেখিয়েই যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ সংবলিত চার্জশিট দ্রুত জমা দিয়েছিলেন সুশান্ত।

এই মামলার তদন্ত এবং চার্জশিট ছিল পুরোটাই পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) নির্ভর। এবং সেজন্যই তদন্তে তিল মাত্রও ফাঁকফোকর রাখার উপায় ছিল না সুশান্তের। যে খুনের ঘটনায় কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই, সেই মামলায় পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা অতি দুরূহ কাজ।

কেন দুরূহ? সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫২ সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বিষয়ে যা বলেছিল, তার অংশবিশেষ তুলে দিলাম নীচে।

'It is well to remember that in case where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be in the first instance be fully established and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused.'

সারাংশ? পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার শর্তাবলি খুব পরিষ্কার। যে ঘটনাগুলিকে পরিপার্শ্ব বা অবস্থানগত প্রমাণ হিসেবে দাবি করছেন তদন্তকারী, তা শুধু

BanglaBook.org

সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করাটাই যথেষ্ট নয়। ঘটনাগুলি যে অভিযুক্তের অপরাধী হওয়ার তত্ত্বকেই শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত করছে, তা নিয়ে যেন ন্যূনতম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে বিচারকের মনে। সর্বোপরি, ঘটনা এবং প্রমাণের বাঁধুনি হতে হবে এতটাই সুশৃঙ্খল, যে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশও থাকবে না অভিযুক্তের অপরাধ নিয়ে।

শর্ত মেনেই খুঁতহীন চার্জশিট তৈরি করেছিলেন সুশান্ত। নাদিরের বয়ান অনুযায়ী কবরখানা থেকে উদ্ধার হয়েছিল পুঁতে রাখা ক্ষুর এবং লুঙ্গি। ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা রক্ত যে মানবদেহের এবং গোপালের জামাকাপড় আর নাদিরের ক্ষুর ও লুঙ্গিতে লেগে থাকা রক্ত যে একই গ্রুপের, সেটা ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল। আজাদের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মানিব্যাগ আর ঘড়ি, যা গোপালের বলেই আদালতে চিহ্নিত করেছিলেন ওঁর দাদারা। ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটে সে রাতে যখন গোপালের মুখোমুখি রাজ-আজাদ-নাদির, বাড়ি ফিরছিলেন এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা হানিফ। যিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আদালতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'last seen together'-এর জরুরি প্রমাণ। এবং ছিল ঘটনার দায় স্বীকার করে আদালতে বিচারকের কাছে নাদির-আজাদের গোপন জবানবন্দি। জাল কেটে বেরনোর রাস্তা কোথায় আর?

আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে নাদির, রাজ ও আজাদকে। রায়ে সপ্রশংস উল্লেখ ছিল শাহ্‌জামল এবং সুশান্তের ভূমিকার।

নাদির এবং আজাদ শাস্তি মকুবের আবেদন করে হাইকোর্টে। সওয়াল-জবাবের পালা সাঙ্গ হলে নিম্ন আদালতের রায়ের সঙ্গেই সহমত হয় হাইকোর্ট। সাজাপ্রাপ্তদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল সুপ্রিম কোর্ট, শাস্তির মেয়াদ কমানোর আর্জি নিয়ে। সর্বোচ্চ আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দেয় পত্রপাঠ।

সাজার মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে নাদির-আজাদের। রাজ এখনও সংশোধনাগারে।

কী লিখি শেষে?

ফেলুদার গল্পেই হোক বা বাস্তবে, গোরস্থানে সাবধান!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

যা গেছে তা যাক

সুলেখা কড়া চোখে তাকান গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের দিকে, 'একবার তো বললাম, যাবি না। কানে কথা যাচ্ছে না বুঝি? যা, পড়তে বোস।'

মায়ের বকুনিতে চোদ্দো বছরের কিশোরীর চোখ ছলছল। ফের মরিয়া আর্জি জানায়, 'কেন যাব না? স্কুলের সবাই দেখে ফেলেছে সিনেমাটা। সবাই বলছে, দারুণ হয়েছে। আজ সন্ধের শো-তে অরুণিমা-দেবস্মিতারা যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যেতে না দাও, তুমি বা বাবা নিয়ে চলো।'

সুলেখা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'ওরা যাচ্ছে যাক। হলে গিয়ে ওসব বড়দের হিন্দি বই দেখার বয়স তোর হয়নি। তুই যাবি না, ব্যস।'

—কে বলল বড়দের ছবি? 'কয়ামত সে কয়ামত তক' মোটেই বড়দের ছবি নয়। তা হলে তো 'এ' মার্কা থাকত, অরুণিমারাও যেতে পারত না। রোম্যান্টিক ছবি। ব্যারাকপুরে 'জয়ন্তী'-তে চলছে। চলো না নিয়ে।

সুলেখার মাথায় আগুন চড়ে যায়। বাবা-দাদু-ঠাকুমার আদরে মেয়েটা যেন বাঁদর হয়ে উঠছে দিন-কে-দিন। ক্লাস এইটের মেয়ে হিন্দি বই দেখতে যাবে হলে! তা-ও আবার রোম্যান্সের বই! শখ কত! তা ছাড়া মুখে-মুখে এত চোপা করার মতো সাহসই বা হয় কী করে?

মেয়ে এখনও জেদ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুলেখা ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেন গালে, 'সিনেমা দেখা নিয়ে আর একটা কথাও যেন মুখ থেকে না বেরয়। দশ মিনিটের মধ্যে পড়তে বসবি।' কথাগুলো বলেই দোতলা থেকে নেমে আসার সিঁড়িতে পা রাখেন সুলেখা। রান্নাবান্নার অনেক কাজ পড়ে আছে। দ্রুত পা চালিয়ে চলে আসেন নীচে। সময় হয় না আর পিছনে ফিরে তাকানোর। তাকালে দেখতে পেতেন, কিশোরী কন্যা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে একচুলও নড়েনি। ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে মায়ের নীচে নেমে যাওয়া। পাতা প্রায় পড়ছেই না চোখের। অদ্ভুত সে দৃষ্টি! ক্ষোভ-রাগ-অভিমানের সঙ্গে যাতে দ্বেষেরও তীব্র মিশেল!

BanglaBook.org

— হল তো! হল তো! কতবার বলেছিলাম, পাপ বিদেয় করো, বিদেয় করো! কানে কথাই তুললে না! তুললে আজ এভাবে মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হত না। গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার!

থামানো যাচ্ছিল না সুলেখাকে। স্ত্রী-র মুখরা স্বভাবের সঙ্গে সুভাষ পরিচিত বিয়ের অল্পদিন পর থেকেই। কিন্তু আজ যেন সুলেখার মেজাজ আরও বেশি বাঁধনহীন। রণচণ্ডী মূর্তি একেবারে। অন্যদিন হলে সুভাষ ঠান্ডা মাথায় শান্ত করার চেষ্টা করতেন সুলেখাকে। আজ সেটা করে লাভ নেই। যা ঘটেছে, শুনে তাঁর নিজেরই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। ভুল তো কিছু বলছে না সুলেখা। সত্যিই তো আগে একাধিকবার বলেছে ওই মাস্টারকে ছাড়িয়ে দিতে। তেমন একটা পাত্তা দেননি সুভাষ। কিন্তু আজ যা ঘটল, তারপর তো পাড়ায় থাকাই দায় হয়ে যায়। লোকে বাড়ি বয়ে এসে এভাবে অপমান করে যাবে!

আর অপমান বলে অপমান! সন্ধেবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর মুখে সুভাষ শুনলেন, বিকেলের দিকে অলকা এসেছিলেন। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট ধরে পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে শুনিয়ে তুমুল গালিগালাজ করে গেছেন, 'এমন মেয়ে আমার থাকলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম! ছি ছি! লজ্জা করে না! বলিহারি যাই এমন বাপ-মায়ের! বাপের বয়সি মাস্টারের পিছনে মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে মজা দেখছে...।'

সুলেখা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন, 'এসব আপনি কী যা-তা বলছেন!' উত্তরে গলার মাত্রা আরও চড়িয়েছিলেন রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অলকা, 'ঠিকই বলছি! একদম ন্যাকা সাজবেন না! ধিঙ্গি মেয়েকে সামলে রাখতে পারেন না তো জন্ম দিয়েছিলেন কেন? আর লাইনেই যদি নামাতে হয়, ভদ্রপাড়ায় কেন? সোনাগাছিতে পাঠান!'

প্রতিটা শব্দ যেন কানে আগুনের হলকা পৌঁছে দিচ্ছিল সুলেখার। মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঘুমচ্ছিল। টেনে তুলেছিলেন চুলের মুঠি ধরে, কিল-চড়-থাপ্পড় খরচ করেছিলেন এলোপাথাড়ি, 'ঠিকই তো বলে গেল, তোর মতো মেয়েকে পেটে ধরাটাও পাপ। থাকার থেকে না থাকা ভাল। পড়াশুনো করে দিগ্‌গজ হওয়া বার করছি তোর।'

মা যতক্ষণ মারছিল, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি শব্দও খরচ করেনি মেয়ে। মারের পর্ব শেষ হওয়ার পর শুধু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সুলেখার দিকে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি! যা থেকে অভিমান তো নয়ই, ক্ষোভ-রাগ-দ্বেষও নয়, ঠিকরে পড়ছিল স্রেফ প্রতিহিংসা।

BanglaBook.org

নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে ফিরতে একটু বেশিই রাত হয়ে গিয়েছিল রথীনবাবুর। সেই বরানগরের বিয়েবাড়ি থেকে এই নোয়াপাড়া, দূরত্ব তো নেহাত কম নয়। রাতে খাওয়ার পর ছাদে একটু পায়চারি করা মধ্যপঞ্চাশের রথীনের বরাবরের অভ্যেস। রাত প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ ছাদে উঠে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, আওয়াজটা তখনই কানে এসেছিল। গোঁ-গোঁ করে একটা শব্দ আসছে না পালবাড়ির দিক থেকে? কে গোঙাচ্ছে এত রাতে? বিপদ-টিপদ হল নাকি কিছু? ছাদের উপর থেকে স্পষ্ট কিছু দেখাও যাচ্ছে না। রথীন তড়িঘড়ি নেমে এসেছিলেন নীচে। বেরিয়ে পড়েছিলেন টর্চ নিয়ে। মিনিটদুয়েকের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ওই গোঁ-গোঁ আওয়াজের উৎস।

পালবাড়ির সদর দরজার সামনেই পড়ে আছে মেয়েটা। দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধা পিছমোড়া করে। মুখও বাঁধা কাপড় দিয়ে। ওই অবস্থাতেই আওয়াজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রাণপণ। কাছে গিয়েই চমকে উঠলেন রথীন। আরে, এ তো পালবাড়িরই মেয়ে! এখানে এভাবে পড়ে? তাড়াতাড়ি হাত-পা আর মুখের বাঁধনটা খুলে ফেললেন রথীন। মেয়েটা হাঁফাচ্ছে। কাঁপছে সারা শরীর। 'কী রে, কী হয়েছে?'-র জবাবে কেঁদে ফেলল ঝরঝরিয়ে। কোনওরকমে নিজেদের বাড়ির দিকে আঙুল দেখাতে পারল শুধু।

দোতলা বাড়িটার কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। একতলার সদর দরজাটা হাট করে খোলা। বড়সড় অঘটন ঘটে গেল নাকি কোনও? একটু নার্ভাস লাগছিল রথীনের। ভিতরে ঢুকতে গিয়েও থমকে গেলেন। ঢোকার আগে আশেপাশের দু'-তিনটে বাড়ির লোককে ডেকে তুললেন। রথীন সহ পাড়ার অন্তত জনাছয়েক একসঙ্গে ঢুকলেন ভিতরে। এবং ঢুকেই বুঝলেন, অবিলম্বে নোয়াপাড়া থানায় খবর দেওয়া দরকার।

একতলায় দুটো শোবার ঘর। একফালি ড্রয়িংরুম। রান্নাঘর, বাথরুম। একতলার ভিতর থেকেই দোতলায় উঠে যাওয়ার সিঁড়ি। দুটো বেডরুম দোতলাতেও। দুটো ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথরুম। আর ছোট বসার ঘর একটা।

একতলার ঘরের মেঝেতে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিস্পন্দ দেহ পড়ে আছে। দেবেন্দ্রমোহন পাল এবং তাঁর স্ত্রী লতিকা। এপাড়ার একেবারে আদি বাসিন্দা বলা যেতে পারে এঁদের। একতলাতেই রান্নাঘরের বাইরে পড়ে আছেন সুলেখা। দেবেন্দ্র-লতিকার পুত্রবধূ। দোতলার একটা বেডরুমের বিছানায় নিথর পড়ে আছেন দেবেন্দ্রমোহনের একমাত্র ছেলে, বছর পঁয়তাল্লিশের সুভাষ।

চারজনের দেহেই তামার তার জড়ানো। যে তারের অন্য প্রান্ত গুঁজে দেওয়া রয়েছে কাছাকাছির ইলেকট্রিক প্লাগ-পয়েন্টে। শরীরের কিছু কিছু অংশ পুড়েছে সবারই। চারজনের কারও দেহেই যে প্রাণের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই আর, সেটা বুঝতে ডাক্তার না হলেও চলে।

BanglaBook.org

দুটো তলাই লন্ডভন্ড। বাড়ির যা কিছু আলমারি-দেরাজ, মূলত দোতলাতেই। সব খোলা। ভিতরের কাপড়চোপড়-জিনিসপত্র সব যে হাঁটকানো হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, স্পষ্ট। বাড়িময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এদিক-সেদিক পড়ে আছে এটা-ওটা-সেটা।

নোয়াপাড়া থানার জিপ যখন এসে থামল বাড়ির সামনে, ততক্ষণে পাড়ার সবাই জেগে গিয়েছেন। ভিড় জমে গেছে বাড়ির সামনে। পাড়ার মহিলারা ধাতস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন সুভাষ-সুলেখার একমাত্র মেয়েকে। হাত-পা-মুখের বাঁধন রথীন খুলে দেওয়ার পর থেকেই যে কেঁদে চলেছে লাগাতার। কেঁপে কেঁপে উঠছে মাঝেমাঝে। বারবার মুখে-চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া সত্ত্বেও এখনও কথা বলার মতো অবস্থাতেই পৌঁছয়নি মেয়েটি। যাকে ডাকনামেই পাড়ার সবাই চেনে। বুড়ি। ভাল নাম সুদীপা। সুদীপা পাল।

কোন মামলার কথা লিখছি, সেটা পাঠক অবধারিত আন্দাজ করতে পারছেন আগের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে। সেই সাড়া-জাগানো মামলা, যার অভিঘাত শুধু রাজ্যের মানুষকেই স্তব্ধ করে দেয়নি, আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল দেশজুড়েই। সেই ঘটনার কথা, প্রায় তিরিশ বছর পেরিয়ে গেলেও যা নিমেষে আমবাঙালির স্মৃতিতে ফিরে আসে ফ্ল্যাশব্যাকে, 'নোয়াপাড়া' আর 'সুদীপা পাল', এই শব্দ তিনটে একসঙ্গে উচ্চারণ করলেই।

কিছু মামলা থাকে, যা নিয়ে লোকের আগ্রহের পারদ কখনই নিম্নগামী হয় না। সে যতই পেরিয়ে যাক বছরের পর বছর, দশকের পর দশক। সুরূপা গুহ হত্যামামলা যেমন। সাতের দশকের শেষদিকের যে কেস নিয়ে এখনও অশেষ ঔৎসুক্য মানুষের মনে। তেমনই, কৌতূহলের শেষ নেই গড়িয়াহাটে দেবযানী বণিকের হত্যাকাণ্ড বা অক্সিটাউনের বহুচর্চিত খুনের মামলা নিয়ে। অথবা স্টোনম্যান বা খাদিম কর্তা অপহরণ বিষয়ে। এমন আছে আরও বেশ কিছু, যে সব ঘটনার নেপথ্যকথায় আমার-আপনার মতো সাধারণের আগ্রহ চিরকালীন। যে মামলার কথা লিখছি, তা-ও এই গোত্রেরই। কী হয়েছিল, কে করেছিল, কেন করেছিল, সেই মূল ব্যাপারটা সবারই মনে আছে মোটামুটি। তবু ঘটনাটাই এমন, আরও বিশদে জানতে চাওয়ার চাহিদাটা বেঁচে থাকেই।

এ মামলা নয়ের দশকের একেবারে শুরুর দিকের। সেসময় এই মামলার গতিপ্রকৃতি নিয়ে খবরের কাগজগুলো দিনের পর দিন নিউজপ্রিন্ট খরচ করেছে অকৃপণ। এই কেস নিয়ে মনোবিদরাও গবেষণা করেছেন বিস্তর। তবু তিক্ত সত্যিটা হল, সে সংবাদপত্রের রিপোর্টই হোক বা বিশেষজ্ঞদের গবেষণা, উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যের শুদ্ধতার সঙ্গে অনায়াসে মিশে গেছে কল্পনার ভেজাল, জল্পনার খাদ।

BanglaBook.org

আরও স্বীকার্য, কেস ডায়েরিতে ধরা থাকা বিভিন্ন নথি-বয়ানের নীরস খতিয়ানে বা চার্জশিটে নথিবদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণের বিবরণীতে, কিংবা আদালতের যুক্তি-তথ্য সমৃদ্ধ রায়েও বেরিয়ে আসে না এই ধরনের মামলার নেপথ্যের সব কিছু। বেরিয়ে আসে না পরদার পিছনে থাকা টুকরো টুকরো খণ্ডচিত্র। যা জানা যায় তদন্তের সঙ্গে জড়িত সর্বস্তরের অফিসার-কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণের আলাপচারিতায়। খোলস ছাড়ে বহু অজ্ঞাত-অশ্রুত তথ্য, প্রকাশ্যে আসে ঘটনার 'কী-কেন-কখন-কীভাবে'-র আদ্যোপান্ত।

জানা ঘটনার অজানা কাহিনি, তাই থাকল লিপিবদ্ধ।

২৬, ব্রজনাথ পাল স্ট্রিটের উপর দোতলা বাড়িটা নোয়াপাড়ায় বেশি পরিচিত 'পালবাড়ি' হিসেবে। ইছাপুরের গোয়ালাপাড়ায় এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন দেবেন্দ্রমোহন পাল। শুরুতে অবশ্য একতলা ছিল। দোতলাটা হয়েছে এই বছর পাঁচেক হল, ছেলে সুভাষের উদ্যমে। সুভাষ পেশায় স্কুলশিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি হাত লাগাতেন দেবেন্দ্রমোহনের খড়ের ব্যবসাতেও। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতা কমল দেবেন্দ্রের। শুরু হল অসুখ-বিসুখের উপদ্রব। স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে ব্যবসার হাল ধরলেন সুভাষ। শুধু হাল ধরলেন বললে কম বলা হয়, উদয়াস্ত পরিশ্রমে কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যবসাকে বাড়িয়ে তুললেন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। পালবাড়িতে লক্ষ্মীর বসতি স্থায়িত্ব পেল। 'মধ্যবিত্ত' থেকে পরিবারের উত্তরণ ঘটল 'উচ্চবিত্তে'।

পাঁচজনের সংসার। দেবেন্দ্রমোহন-লতিকা, সুভাষ-সুলেখা আর তাঁদের কিশোরী কন্যা সুদীপা, পালবাড়ির একমাত্র মেয়ে। বাড়ির আদরের 'বুড়ি'। দাদু-ঠাকুমা তো নাতনিকে চোখে হারান। সুদীপা যা যা খেতে ভালবাসে, ঠাকুমা পরম যত্নে বানিয়ে দেন নাতনির আবদারে। 'বুড়ি'-অন্ত প্রাণ দাদুও। মুখের কথা খসতে না খসতেই সুদীপার জন্য হাজির করেন হরেক উপহার।

মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন সুভাষের। নিজের ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি সংসারের জাঁতাকলে। সেই স্বপ্নের পুনর্জন্ম হয়েছে সুদীপাকে ঘিরে। মেয়েটা পড়াশুনায় ভাল। ক্লাসে প্রথম তিন-চার জনের মধ্যে থাকে ছোটবেলা থেকেই। এখন ক্লাস এইট। আর দু'বছর পরে, মানে ১৯৯০-এ মাধ্যমিক। সুভাষের স্থির বিশ্বাস, মেয়ে ভাল রেজাল্ট করবে। হায়ার সেকেন্ডারিতে সায়েন্স নিয়ে পড়ে তারপর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসবে মেয়ে, ভাবাই আছে সুভাষের। ভাবতে কী যে ভাল লাগে সুভাষের, আজকের এই একরত্তি মেয়েটা সাত-আট বছর পর কোনও বড় কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার! ভেবেই রেখেছেন, বাড়ির সদর দরজায় তখন বেশ বাহারি একটা নেমপ্লেট লাগাবেন। 'সুদীপা পাল, বিটেক'।

BanglaBook.org

রণধীর বসু

স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এতটুকু খামতি রাখেননি সুভাষ। ইছাপুরেরই বাপুজি কলোনিতে রণধীর বসুর বাড়ি। নবাবগঞ্জ হাইস্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনি করেন। পঞ্চান্ন বছরের রণধীর পাড়ায় পরিচিত 'গদু মাস্টার' নামে। লোকে বলে, গদু মাস্টারের কাছে নাড়া বাঁধলে অঙ্কে লেটার নিশ্চিত। এই গদু মাস্টারের কোচিং ক্লাসে মেয়েকে ভরতি করে দিয়েছিলেন সুভাষ। সপ্তাহে তিনদিন পড়তে যেত সুদীপা।

একদিন কোচিং থেকে মেয়েকে আনতে গিয়ে সুভাষ দেখলেন, যে ব্যাচে সুদীপা পড়ে, তার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে কয়েকজন। একচিলতে ঘরে গাদাগাদি করে বসতে হচ্ছে। সুভাষ সেদিনই রণধীরকে বললেন, 'মাস্টারমশাই, এতজনের সঙ্গে এক ব্যাচে পড়লে পার্সোনাল অ্যাটেনশনটা সেভাবে পাচ্ছে না মেয়েটা। আমি চাইছি, আপনি বাড়িতে এসে পড়ান। যে সময়টা আপনি আমার বাড়িতে খরচ করবেন, তাতে হয়তো আপনার আরেকটা ব্যাচ পড়ানো হয়ে যেত। কিন্তু ওই টাকাটা পুষিয়ে দেব আমি। টাকা নিয়ে ভাববেন না।'

রণধীর রাজি হয়ে গেলেন। প্রাইভেট টিউটর হিসেবে তাঁর সুনাম আছে ঠিকই। তবে তাঁর দুই কামরার বাড়ির যে ঘরটায় ছাত্র পড়ান, তাতে খুব ঠাসাঠাসি করে বসলেও ছ'-সাতজনের জায়গা হয়। ব্যাচ বড় করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। তা ছাড়া একটু বিত্তশালী ঘরের অভিভাবকদের একটা অনীহা থাকেই ওই ঘিঞ্জি ঘরে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে।

কোচিংয়ের জন্য একটা বড় ঘর ভাড়া নিতে পারলে হত। কিন্তু সে আর্থিক সংগতি আর কোথায়? স্কুলে পড়িয়ে মাস গেলে মাইনে হাতে আসে হাজার দেড়েক। টিউশনি থেকে যা পান, সেটা মাসমাইনের সঙ্গে যোগ করলেও সংসার চালাতে হিমশিমই খেতে হয় রণধীরকে। মেয়ের বয়স এখন আট। তার স্কুলের খরচ আছে। তার উপর স্ত্রী অলকা মাঝেমাঝেই রোগে ভোগেন। চিকিৎসার খরচ আছে। মাসের শেষ সপ্তাহে পৌঁছে হাতে প্রায় কিছুই থাকে না। সুদীপার বাবা যে টাকাটা দেবেন বলছেন বাড়ি গিয়ে পড়ালে, সেটা নেহাত কম নয়।

সপ্তাহে চারদিন, সোম-বুধ-শুক্র-শনি, সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা, বাড়িতে এসে সুদীপাকে পড়াতে শুরু করলেন রণধীর। এই ব্যবস্থায় সুলেখাও খুশি হলেন। চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়েকে নিয়ে মায়েরা একটু বেশিই সাবধানি থাকেন। কিন্তু সুলেখা ছিলেন আরও মাত্রাধিক সতর্ক। এবং ঘোর রক্ষণশীলও। মেয়ে আর দশজনের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে

BanglaBook.org

অঙ্ক শিখবে মাস্টারের বাড়ি গিয়ে, এতে শুরু থেকেই সায় ছিল না সুলেখার। মাঝেমাঝেই তাগাদা দিতেন সুভাষকে, 'বলে দেখো না, যদি বাড়িতে এসে পড়াতে রাজি হন।'

শুধু অঙ্ক শেখাই নয়, সুলেখা চাইতেন, শুধু স্কুলে যাওয়া-আসাটা বাদ দিয়ে সুদীপার বাকি সবকিছুও আবদ্ধ থাকুক বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই। বাড়ির সামনের মাঠে বিকেলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করত। সুদীপাকে যেতে দিতেন না সুলেখা, 'কত রকমের লোক আসে ওখানে, তোর যাওয়ার দরকার নেই। বাড়িতে খেলনা আছে তো অনেক। বারান্দায় বসে খেল।'

বাড়িতে একা একা খেলে কি আর সেই আনন্দ পাওয়া যায়, যা পার্কে বা মাঠে সকলের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে মেলে? সুদীপার খুব ইচ্ছে করত মাঠের দোলনাটায় দুলতে, স্লিপে চড়তে। কিন্তু মা অনুমতি দিলে তো! অনুমতি ছিল না পাড়ার সমবয়সি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার। অনুমতি ছিল না বন্ধুদের জন্মদিনে যাওয়ারও। কার জন্মদিন? কোথায় যেতে হবে? আর কে কে থাকবে? শুধু মেয়েরাই থাকবে তো, না কি কোনও ছেলেও থাকবে? ওই বাড়িতে কতজন পুরুষ? বন্ধুর বাবা কী করেন? হাজাররকম ফিরিস্তি দিতে হত সুদীপাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাকচ হয়ে যেত আর্জি। যদি বা কখনও সুলেখা অনুমতি দিতেন, সেটা হত বহুবিধ শর্তসাপেক্ষে, 'ঠিক সোয়া ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে', 'অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলবে না'... এমন আরও অনেক। শুনতে শুনতে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছেটাই মরে যেত সুদীপার। যেত না কোথাও, থেকে যেত বাড়িতেই। অভিমান আর মনখারাপ নিয়ে।

ধৈর্যের বাঁধ অবশ্য ভেঙে যেত কখনও কখনও। যেমন হয়েছিল 'কয়ামত সে কয়ামত তক' দেখতে যাওয়া নিয়ে। স্কুলে রোজ বন্ধুদের মুখে শুনছে, কী দারুণ হয়েছে সিনেমাটা। নতুন হিরো আমির খান বলতে তো বন্ধুরা পাগল। ভীষণ কিউট আর হ্যান্ডসাম নাকি। গানগুলোও সুপারহিট, টিভিতে 'চিত্রহার'-এ শুনেওছে সুদীপা। মায়ের কাছে সিনেমাটা দেখতে যাওয়ার আবদার করা মাত্র মুখঝামটা শুনতে হল, 'ক্লাস এইটের মেয়ে হিন্দি বই দেখতে যাবে হলে! তা-ও আবার রোম্যান্সের বই! শখ কত!' জেদ করে দাঁড়িয়েছিল বলে থাপ্পড়ও পড়ল গালে, 'সিনেমা দেখা নিয়ে আর একটা কথাও যেন মুখ থেকে না বেরয়। দশ মিনিটের মধ্যে পড়তে বসবি।'

সেদিন সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই এসে লক্ষ করলেন, সহজ অঙ্কতেও আটকে যাচ্ছে সুদীপা। একবার নয়, বারবার। রণধীর জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, 'আজ কী হয়েছে তোমার? এত কেয়ারলেস মিসটেক তো তোমার হয় না।' সুদীপা মাথা নিচু করে বসে আছে দেখে আলতো করে ছাত্রীর পিঠে হাত রাখলেন রণধীর, 'কী হয়েছে তোমার?' সুদীপা মুখ তুলে তাকাল। চোখে জল ভরে এসেছে। রণধীর অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী! কাঁদছ কেন?' সুদীপা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে থাকে সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে অশান্তির বৃত্তান্ত।

রণধীর শুনলেন। বললেন, 'মায়ের নিশ্চয়ই আজ কোনও কারণে মেজাজ খারাপ ছিল, তাই তোমাকে মেরেছেন। এটা নিয়ে মন খারাপ করে থেকো না। মা তো তোমার ভালই চান...।'

BanglaBook.org

বাক্য শেষ করতে পারলেন না রণধীর, খানিক চমকেই গেলেন সুদীপার প্রতিক্রিয়ায়, 'না স্যার, মা আমার ভাল চায় না। কথায় কথায় গায়ে হাত তোলে। বাবা-দাদু-ঠাকুমা ছাড়া কেউ ভাল চায় না আমার। মা আমাকে কোথাও যেতে দেয় না। কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না। কারও সঙ্গে কথা বলতে দেয় না। আপনিই বলুন স্যার, আমাকে সিনেমাটা দেখতে দিলে মায়ের কী ক্ষতি হত?'

—তুমি বাবাকেও তো বলতে পারো। হয়তো বাবা বুঝিয়ে বলতে পারবেন তোমার মা-কে।

সুদীপা চুপ। রণধীর বুঝতে পারলেন নীরবতার কারণ। এবাড়িতে নিয়মিত যাতায়াতের সুবাদে বুঝে গেছেন, মেয়েকে প্রাণাধিক ভালবাসেন ব্যবসার কাজে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ব্যস্ত থাকা সুভাষ, কিন্তু সুদীপার রোজকার জীবন কীভাবে চলবে, সে ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার এবাড়িতে সুলেখারই। দাদু-ঠাকুমাও জানেন সেটা। অনন্ত স্নেহ-ভালবাসা দেন ওঁরা, কিন্তু নাতনির দৈনন্দিন জীবনধারার ব্যাপারে নাক গলান না কখনও। কখনও পেরোন না সুলেখার নির্ধারণ করে দেওয়া অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা।

মাস্টারমশাই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন ছাত্রীকে, 'তুমি দুঃখ কোরো না, রেজাল্ট ভাল করলে আমি একদিন তোমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব, কেমন?'

সুদীপা মুখ তুলে তাকায়। জোর করে হাসার চেষ্টা করে। পড়ানো শেষ করে রণধীর উঠে পড়েন। বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, হলুদ টপ আর কালো স্কার্টে আজ কী দারুণ লাগছিল সুদীপাকে। এই বয়সে সব মেয়েকেই দেখতে ভাল লাগে। আর সুদীপা তো এমনিতেই দেখতে ভারী সুন্দর। যত বয়স বাড়ছে, রূপ যেন আরও ঝলসে উঠছে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আজকাল কখনও কখনও সুভাষবাবুকে বলতে ইচ্ছে করে রণধীরের, 'আমি সপ্তাহে চারদিন নয়, রোজই আসব আপনাদের আপত্তি না থাকলে। তার জন্য বাড়তি টাকা লাগবে না।' বলা হয়ে ওঠে না চক্ষুলজ্জায়। কী না কী ভেবে বসবেন ওঁরা! অবশ্য ভাবলে ভুল কিছু কি আর ভাববেন? নিজের কাছে কীভাবে লুকোবেন নিজেকে? সত্যিই তো সুদীপাকে রোজ দেখতে ইচ্ছে করে তাঁর। রোজ। মেয়েটার সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে প্রতিদিন।

মাস দুয়েক পরের ঘটনা। পড়াতে এসে ফের রণধীর দেখলেন, সুদীপার মুখ ভার। বড্ড অন্যমনস্ক। কারণটা আজ আর খুঁচিয়ে জানতে হল না। সুদীপা নিজেই বলল, বাঁ হাতে খুব ব্যথা। মা আজ দুপুরে স্কেল দিয়ে মেরে কনুই ফুলিয়ে দিয়েছে। কেন? স্কুল থেকে ফেরার সময় বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গিয়েছিল অজন্তার সঙ্গে। পাড়াতেই থাকে কয়েকটা বাড়ি পরে। অজন্তার দাদা মানসও ছিল সঙ্গে। খুব বেশি হলে মিনিটদুয়েক 'কী রে, কী খবর?' গোছের কথাবার্তা বলেছে সুদীপা। তা-ও অজন্তার সঙ্গে। মানসদা দাঁড়িয়েই ছিল চুপচাপ। মা দেখেছে বারান্দা থেকে।

বাড়ি ঢুকতেই কৈফিয়ত তলব, 'কেন কথা বলছিলি ওই ছেলেটার সঙ্গে?' সুদীপা প্রতিবাদ

BanglaBook.org

করেছিল, 'কথা তো অজন্তার সঙ্গে বলেছি!' মা পালটা বলেছিল, 'না, তুই ওর দাদার সঙ্গেই কথা বলছিলি, আমি নিজের চোখে দেখেছি।' সুদীপারও রাগ হয়ে গিয়েছিল মায়ের অকারণ দোষারোপে, 'তুমি ভুল দেখেছ। আর যদি মানসদার সঙ্গে একটা-দুটো কথা বলেই থাকি, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?' শুনে সুলেখা খেপে গিয়েছিলেন। চুলের মুঠি ধরে মেয়েকে মার, স্কেলপেটা।

'কোথায় লেগেছে দেখি?' সুদীপার হাতটা টেনে নিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। ফুলে থাকা কনুইয়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। সহানুভূতির স্পর্শে কান্না উথলে এসেছিল সুদীপার। রণধীর বলেছিলেন, 'ইশ! এভাবে কেউ মারে!' চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে হাত রেখেছিলেন ছাত্রীর পিঠে। যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন সুদীপাকে। স্যারের আঙুল ঘুরে বেড়াচ্ছিল ছাত্রীর কাঁধে-ঘাড়ে-পিঠে-গলায়। কী ভাল যে লাগছিল সুদীপার! মনে হচ্ছিল, স্যার যেন না থামেন। রণধীর আলতো করে সুদীপার মুখটা তুলে কপালে চুমু খেয়েছিলেন, বুকে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে নিয়ে। ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়েছিলেন। সুদীপা কাঁপছিল। ভাললাগার কাঁপুনি। পুরুষস্পর্শে সব উজাড় করে সাড়া দিচ্ছিল কিশোরী শরীর।

সেদিন পালবাড়ি থেকে বেরনোর আগে রণধীর কানে কানে বলেছিলেন সুদীপার, 'কোনও চিন্তা নেই তোমার। আমি তো আছি। আমাকে একটু ভাবতে দাও। তোমার মা বেশি বাড়াবাড়ি করলে তার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।'

মেয়েকে শাসন করতে গিয়ে কেন মাঝেমাঝেই বাড়াবাড়ি করে ফেলতেন সুলেখা? কেন মেয়ের প্রতি আচরণে প্রায়শই 'শাসন' রূপ নিত 'অত্যাচারের'? বাবা-দাদু-ঠাকুমার অফুরান স্নেহের প্রশ্রয়ে মেয়ে বিগড়ে যাবে, এমন আশঙ্কায় ভুগতেন বলেই কি জারি করেছিলেন এত নিয়মনিষেধ? নাকি অন্য কোনও অভাববোধ ছিল? যে না-পাওয়ার ক্ষোভ গভীর শিকড় গেড়েছিল অবচেতনে, এবং যার বহিঃপ্রকাশ প্রায়ই ঘটে যেত মেয়ের প্রতি ব্যবহারে? সুদীপার জন্মের পর বেশ কিছুদিন জটিল রোগে ভুগেছিলেন সুলেখা। সেরে ওঠার পর ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিলেন, কখনওই আর দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে পারবেন না সুলেখা। গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে পাকাপাকি। সুলেখার তীব্র ইচ্ছে ছিল, মেয়ের পর ছেলে হোক একটা। সেই পুত্রাকাঙ্ক্ষায় দাঁড়ি পড়েছিল সুদীপার জন্মের পর। কে জানে, অবচেতনে হয়তো মেয়ের ঘাড়েই চাপাতেন ইচ্ছাপূরণ না হওয়ার দায়।

একমাত্র সন্তানের যত্ন নিতেন না সুলেখা, এমন অপবাদ তা বলে কেউ দিতে পারবে না। কেউ বলতে পারবে না, মা হিসেবে মেয়ের প্রতি কর্তব্যে কোনওরকম ফাঁক রেখেছিলেন সুলেখা। সুলেখার সমস্যা আসলে ছিল ওই 'কর্তব্যবোধ' সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণায়।

একটা বয়সের পর যে সন্তানের জীবনের প্রতিটি ওঠাপড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা আর সেভাবে সম্ভব

BanglaBook.org

নয়, এবং জোর করে সেটা করতে গেলে যে সন্তানের মনে মা-বাবার প্রতি একটা অনিবার্য বৈরিতা তৈরি হয় ক্রমশ, সেটা সুলেখা বুঝতেন না। বুঝতেন না, অভিভাবকদের এই মাত্রাধিক নিয়ন্ত্রণকে সন্তানদের কাছে দাসত্ব বলে বোধ হয় বয়ঃসন্ধির বছরগুলোয়। বুঝতে চাইতেন না, দাসত্বের শৃঙ্খল যত বেশি নিশ্ছিদ্র হয়, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদও হয় ততটাই উদগ্র। মনও ততটাই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় authoritarian parenting-এর শিকার এই ছেলেমেয়েরা তখন চায় মানসিকভাবে অন্য কারও উপর নির্ভর করতে। কেউ যদি একটু সময় খরচ করে ওদের সুখ-দুঃখের কথা শোনে এ সময়, যদি পিঠে স্নেহের হাত রেখে দুটো সমবেদনার কথা বলে, তাকেই তখন নিজের শ্রেষ্ঠতম শুভানুধ্যায়ী মনে হয়।

নিজের পরিবারের বাইরে কাউকে অবলম্বন করে এই বাঁচতে চাওয়া কারও কারও ক্ষেত্রে পরিণত হয় 'অবসেশনে'। সান্ত্বনা দেওয়ার মানুষটা, সমবেদনা পাওয়ার জায়গাটা তখন হয়ে ওঠে যে-কোনও মূল্যে পরম কাঙ্ক্ষিত। হয়ে ওঠে নিজের একমাত্র পরিত্রাণের জায়গা।

রণধীর ছিলেন সুদীপার সেই পরিত্রাণ। এক পক্ককেশ পঞ্চান্ন বছরের কুদর্শন পুরুষের প্রেমে সুদীপার মতো সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী যেভাবে ভেসে গেছিল অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই, তার নেপথ্যে ছিল ওই পরিত্রাণেরই রসায়ন।

মায়ের প্রতি সুদীপার পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে প্রথমে ক্রোধ এবং ক্রমে ঘৃণায় পরিণত করতে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিলেন রণধীর। জানতেন, এই বয়সের উন্মত্ত রাগ ভুলিয়ে দিতে পারে অনেক কিছু। ভুলিয়ে দিতে পারে পরিবারের অন্যদের থেকে পাওয়া নিঃশর্ত স্নেহ-ভালবাসা, পরিবার থেকে পাওয়া অটুট নিরাপত্তা। রণধীর বুঝতেন, কৌশলী পরিচর্যা পেলে অন্ধ ক্রোধ একসময় বদলে যায়ই প্রতিহিংসায়। লোপ পায় বোধবুদ্ধি। নিরুদ্দেশ যাত্রায় যায় বিচার-বিবেচনা। ঠিক যেমনটা হয়েছিল সুদীপার।

প্রথম চুম্বনের সেই রাতে ঘুমতে পারল না সুদীপা। কানে নাগাড়ে বেজেই চলেছিল স্যারের কথাগুলো, 'আমি তো আছি।' কী ভালবেসে বললেন কথাটা! এমনভাবে তো কেউ কখনও বলেনি। এমনভাবে তো তার কথা ভাবেনি কেউ কখনও। মা যে এত কথায়-কথায় বকে-মারে, কই, বাবা-দাদু-ঠাকুমাও তো কখনও আটকাতে আসে না, বারণ করে না মা-কে। ঘরে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে যায় ঠিকই। কিন্তু বলে না তো কখনও, 'কাঁদিস না বুড়ি, আমরা তো আছি।' স্যার যেভাবে বললেন আজ, কত আদর করে!

আচ্ছা, সে কি স্যারের প্রেমে পড়তে চলেছে? স্যার তার থেকে প্রায় চল্লিশ বছরের বড়। মুখভরতি শ্বেতির দাগ। চুল পেকে গেছে অর্ধেক। রোগাটে সাদামাটা চেহারা। শেষ পর্যন্ত এমন একজনের প্রেমে পড়ল সে? না কি প্রেম এমনই হয়? চেহারা তুচ্ছ হয়ে যায়, বয়সের ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে যায়, যখন সত্যিকারের ভালবাসা আসে ঢেউয়ের মতো?

BanglaBook.org

সুদীপা ভেবেছিল, প্রেম। রণধীর বুঝেছিলেন, প্রেম নয়, মোহ। 'Teenage infatuation'। শৃঙ্খলিত আবহে বড় হওয়া এক কিশোরীর অবদমিত চাওয়া-পাওয়ার প্রকাশ। এই মোহকে ব্যবহার করেছিলেন রণধীর, নিজের অর্থকষ্ট লাঘবের সিঁড়ি হিসেবে।

দ্বিধার বাঁধ একবার ভেঙে গেলে যা হয়, যত দিন যাচ্ছিল, গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল শিক্ষক-ছাত্রীর অসমবয়সি সম্পর্ক। পড়াশুনার ফাঁকে রোজই হত টুকটাক শরীরী আদর। সুদীপার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে তখন 'স্যার', যাঁকে আপনি বলে সম্বোধন সবার সামনে, একান্তে স্রেফ 'তুমি'।

'৯০-এর মাধ্যমিকের তখন মাত্র তিন মাস বাকি। রণধীর পড়াতে এসে সুদীপাকে একদিন বললেন, 'মনে হয়, তোমাকে আর পড়াতে আসতে পারব না।' সুদীপার মাথায় বিশ্বচরাচর ভেঙে পড়ল, 'কেন স্যার?' রণধীরকে বিষণ্ণ দেখাল, 'আমি তো পড়াতেই চাই তোমাকে। তোমার বাবা মাইনেপত্র ভালই দেন, কিন্তু তবু আর পোষাচ্ছে না। অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে এখানে। নতুন ব্যাচের ছাত্র পেয়েছি পাঁচজন। মাসে দুশো করে দেবে বলছে। মাস গেলে এক হাজার। ওটা পেলে আমার উপকার হবে। সংসারের যা টানাটানি, পেরে উঠছি না। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

শরীরে-মনে ততদিনে সম্পূর্ণতই রণধীরের উপর নির্ভরশীল হয়ে-পড়া সুদীপা হাত চেপে ধরল স্যারের, 'না, তুমি যাবে না। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও, আমি দেখছি। টাকার জোগাড় হয়ে গেলে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?' রণধীর নিরুত্তর থাকলেন।

টাকার জোগাড় হল। পরের দিনই সুদীপা রণধীরের হাতে তুলে দিল একটা সোনার আংটি, 'তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।' বাড়ির সমস্ত আলমারি-সিন্দুকের চাবি ঘরের দেরাজেই পড়ে থাকে। ঠাকুমার ঘরের সিন্দুক থেকে একটা সোনার আংটি সরিয়ে ফেলা আর কী এমন কঠিন কাজ? আংটিটা হাতে নিয়ে সুদীপাকে একটা গভীর চুমু খেলেন রণধীর। স্যারের বিপদে পাশে দাঁড়াতে পারার আনন্দে ছাত্রী তখন আত্মহারা। রণধীর বুঝে গেলেন, সুদীপা 'সোনার হাঁস'। যাকে একবারে মেরে ফেললে চলবে না।

অর্থকষ্টের অজুহাতে দেড়-দুই মাস অন্তর টিউশনটা ছেড়ে দেওয়ার কথা তুলতে শুরু করলেন রণধীর। যা শুনলেই অস্থির হয়ে পড়ত স্যারের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া সুদীপা। কখনও মায়ের সোনার চেন, কখনও ঠাকুমার রুপোর বালা, কখনও বাবার আলমারিতে পড়ে থাকা 'ইন্দিরা বিকাশ পত্র'... সুদীপা জোগান দিয়ে যেত নিয়মিত। একবার একসঙ্গে প্রায় আট-দশ হাজার টাকার মতো দরকার পড়ল রণধীরের। লাইফ ইনশিয়োরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হবে। বাবার কাছে আবদার জুড়ল সুদীপা, 'স্যার লজ্জায় বলতে পারছেন না। ওঁর খুব দরকার টাকার। আমাকে বলেছেন, তোমার বাবাকে বোলো, মাইনে থেকে যেন মাসে মাসে কিছু কিছু করে কেটে নেন।' মেয়ের আর্জি ফেলতে পারলেন না সুভাষ।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরল। 'স্টার' পেল সুদীপা, অঙ্ক সহ তিনটে সাবজেক্টে লেটার।

BanglaBook.org

পালবাড়িতে সেদিন খুশির হইহই। সুভাষ বেশ কয়েক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। মা-ঠাকুমাও সারা সন্ধে ধরে রান্না করলেন সুদীপার পছন্দের খাবার। দাদু ভাবতে বসলেন, ঠিক কোন উপহারটা কিনে আনা যায় নাতনির জন্য।

সন্ধেবেলা রণধীর এলেন। সুদীপা বলল, 'যা নম্বর পেয়েছি, সবটাই স্যারের জন্য।' বলে নিজের হাতে মিষ্টি মুখে পুরে দিল রণধীরের। ছাত্রীর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন রণধীর। শুধু ছোঁয়ালেন নয়, হাত বুলোলেন প্রায় মিনিটখানেক ধরে। মধ্যপঞ্চাশের শিক্ষক মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন কিশোরী ছাত্রীকে। নেহাতই স্বাভাবিক দৃশ্য। কিন্তু স্বাভাবিক লাগল না সুলেখার। মিষ্টি তো প্লেটে দেওয়াই আছে। নিজে হাতে করে খাইয়ে দেওয়ার কী আছে? যত সব আদিখ্যেতা! মাস্টারেরও বলিহারি, আশীর্বাদ করার নামে অতক্ষণ মাথায় হাত বুলোনোরই বা কী আছে! আর মেয়েও কেমন বলল, যা নম্বর পেয়েছে, সবই নাকি এই গদু মাস্টারের জন্য! ওঁর কাছে পড়িস তো শুধু অঙ্ক! বাকি সাবজেক্টগুলোর নম্বরও কি এই মাস্টারের জন্য নাকি? বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে! গদু মাস্টার পড়াতে এলেই মেয়ে আজকাল যেন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, নজর এড়ায়নি সুলেখার। কথাটা বলা দরকার সুভাষকে।

সুভাষ পাত্তাই দিলেন না সুলেখাকে, 'ধুর, কী যে বলো! ভদ্রলোকের লেট ম্যারেজ। সাত-আট বছরের মেয়ে আছে একটা। আমাদের বুড়ি ওঁর মেয়ের মতো। তা ছাড়া এত ভাল রেজাল্ট করেছে ওঁর কাছে পড়ে। সামনে ইলেভেন-টুয়েলভ। তারপর জয়েন্ট এন্ট্রান্স। ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট এই দুটো বছর। এসময় দুম করে ছাড়িয়ে দেব অঙ্কের মাস্টার? হয় কখনও? তুমি এসব উলটোপালটা ভেবো না তো!' সুভাষ জানতেন না, 'এসব উলটোপালটা' তাঁকেও ভাবতে হবে কিছুদিনের মধ্যেই।

'ব্যারাকপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লস'-এ সায়েন্স নিয়ে ভরতি হল সুদীপা। শিক্ষক-ছাত্রীর এমনিতে দেখা হত শুধু পড়ানোর সময়টায়। সে আর কতটুকু? দেড় থেকে দু'ঘণ্টা। কখনও কখনও আড়াই। তার মধ্যে সকলের নজর এড়িয়ে একটুকু ছোঁয়া লাগা, একটুকু কথা শোনা। একান্ত সান্নিধ্যের সিকিভাগও পূরণ হয় না বাড়িতে। রণধীর-সুদীপা দেখা করতে শুরু করলেন ব্যারাকপুরের চিড়িয়া মোড়ে বা রেল স্টেশনে। স্কুল কামাই করতে শুরু করল সুদীপা। রণধীরও সপ্তাহে অন্তত দু'দিন যেতেন না নবাবগঞ্জের স্কুলে। দু'জনে ট্রেনে করে চলে যেতেন কলকাতায়। ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা, ইডেন গার্ডেন্স...। সিনেমা হলের অন্ধকারে একে অন্যের আরও কাছাকাছি আসা।

মেলামেশা যে হারে বাড়ছিল, পরিচিত কারও না কারও নজরে আজ নয় কাল পড়তই। পড়লও। এক প্রতিবেশিনী সুলেখাকে বলে গেলেন, 'জানো, গদু মাস্টারের সঙ্গে তোমার মেয়েকে কাল দেখলাম চিড়িয়া মোড়ে। রোল খাচ্ছিল দু'জনে।'

সুলেখা চেপে ধরলেন মেয়েকে। সুদীপা বলল, 'স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখা হয়ে গিয়েছিল স্যারের সঙ্গে। স্যারই রোল খাওয়ালেন।' দু'-চারটে চড়-থাপ্পড় পড়ল নিয়মমাফিক। কিন্তু

BanglaBook.org

সুদীপা নিজের বক্তব্য থেকে নড়ল না একচুলও। সুভাষও সব শুনলেন। খটকা একটা লাগল না, এমন নয়। কিন্তু পাশাপাশি এ-ও ভাবলেন, হতেও তো পারে মেয়ে সত্যিই বলছে। সুলেখাকে বোঝালেন, 'দেখা হয়েছে, রোল খাইয়েছেন। টিচার স্টুডেন্টকে খাওয়াতেই তো পারে। খারাপটাই ভেবে নিচ্ছ কেন?' সুলেখা জোর করলেন, 'ছাড়িয়ে দাও এই মাস্টারকে।'

সুভাষ মানলেন না। ছাড়িয়ে দেওয়াই যায় রণধীরকে। অন্য টিচার পাওয়া যাবে না, এমনও নয়। কিন্তু মেয়েটা হয়তো দুঃখ পেয়ে পড়াই বন্ধ করে দেবে। ভাববে, বাবাও মায়ের কথায় সন্দেহ করে টিউটর ছাড়িয়ে দিল। তা ছাড়া যে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন রণধীর, সেটা শোধ করছেন টিউশনের টাকা থেকে প্রতি মাসে কিছুটা করে কাটিয়ে। এখন অগস্ট, পুরোটা শোধ হতে হতে বছর ঘুরে যাবে। ততদিন অন্তত অপেক্ষা করা যাক চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। আর সুলেখা চিরদিনই মেয়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত 'পজেসিভ'। তিলকে তাল করছে হয়তো অকারণে, যেমন প্রায়ই করে থাকে।

অকারণে যে নয়, শীঘ্রই বোঝা গেল অবশ্য। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেটা। রণধীর এসেছেন। দোতলার ঘরে পড়াচ্ছেন সুদীপাকে রোজকার মতো। সুলেখা গিয়ে অন্যদিনের মতো চা-বিস্কুটও দিয়ে এসেছেন। রান্নার কাজ সারছেন একতলায়। হঠাৎ খেয়াল হল, পরের দিন নেমন্তন্ন আছে একটা। সন্ধেবেলা সবাই মিলে কল্যাণী যাওয়ার আছে। কাল পড়াতে আসার দরকার নেই, এটা বলে দেওয়া দরকার গদু মাস্টারকে।

ফের উপরে উঠলেন সুলেখা। এবং উঠে দোতলার বসার ঘরে ঢুকে যা দেখলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন স্ট্যাচুবৎ। রণধীর সোফায় শুয়ে পড়েছেন। মাথাটা সুদীপার কোলে। সুদীপা তার স্যারের মাথায় 'অমৃতাঞ্জন' মালিশ করে দিচ্ছে। মুখটা ঝুঁকে পড়েছে রণধীরের মুখের কাছে। দু'জনের ঠোঁটের মধ্যে স্রেফ হাইফেনের ব্যবধান।

মা-কে দেখে যেন ইলেকট্রিক শক খেল সুদীপা। ছিটকে সরে গেল দ্রুত। রণধীর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক থাকার, 'আসলে হয়েছে কী বউদি, মাথাটা খুব ধরেছিল হঠাৎ। শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তাই সুদীপাকে বললাম...।'

সুলেখা নিজেকে প্রাণপণ সামলালেন, 'শরীর খারাপ লাগছে যখন, বাড়ি চলে যান। এটা গৃহস্থবাড়ি, ডাক্তারখানা নয়।' রণধীর ব্যঙ্গটা হজম করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ক্রোধান্ধ সুলেখা বেল্ট দিয়ে বেদম মারলেন সুদীপাকে। দাগ হয়ে গেল পিঠে। রাতে সুভাষ ফিরতেই সুলেখা তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, 'এই মাস্টারকে বিদেয় করো। পড়াতে এসে নোংরামো শুরু করেছে মেয়ের বয়সি ছাত্রীকে নিয়ে। লম্পট একটা! আর তোমার মেয়েও কম নয়।'

স্ত্রী একটু শান্ত হতে সুভাষ বোঝালেন, নতুন মাস্টারের খোঁজ শুরু করবেন কাল থেকেই। সন্ধান পেলেই ছাড়িয়ে দেবেন রণধীরকে। টাকা শোধের জন্য অপেক্ষা করার আর প্রশ্নই উঠছে না। তবে সামনে ইলেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা। ততদিন সুদীপার পড়ার যাতে ক্ষতি না হয়

BanglaBook.org

সেটাও তো মাথায় রাখা দরকার। যতদিন না নতুন মাস্টার পাওয়া যাচ্ছে, বাড়িতে টিউশনির সময়টা একটু চোখে চোখে রাখতে হবে মেয়েকে।

পরের দিন যখন রণধীর ফের পড়াতে এলেন, দু'ঘণ্টায় অন্তত দশবার কোনও না কোনও অজুহাতে ঘরে ঢুকলেন সুলেখা। তার মধ্যেই অবশ্য স্যারকে সুদীপা জানিয়েছে বেল্ট দিয়ে মারের কথা। শুনে রণধীর উত্তেজিতভাবে বলেছেন, 'এ তো চোরের মার! এমন মা থাকার থেকে না থাকাই ভাল। উনি চান না তোমার ভাল হোক। নেহাত আমার কাছে পড়ে ভাল রেজাল্ট করেছ আর তোমার বাবা আমাকে ছাড়াতে চান না বলে আমাদের দেখা হচ্ছে। কিন্তু যা বুঝছি, তোমার মা আমাকে তাড়িয়ে ছাড়বেন। নষ্ট করে দেবেন তোমার জীবনটা।' সুদীপা প্রতিটা শব্দ শুনেছে মন দিয়ে। তারপর বলেছে, 'সেটা আমি হতে দেব না। তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইলে মেরেই ফেলব মা-কে। ডাইনি একটা!' রণধীরও সম্মতিতে মাথা নেড়েছেন, 'ঠিক বলেছ। এমন মা থাকার থেকে না থাকাই ভাল। এভাবে চললে তো একটা উপায় বার করতেই হবে। বেশি দেরি করা যাবে না।'

'৯১-এর জানুয়ারির এক বিকেলে যা ঘটল, রণধীর-সুদীপার আর উপায়ও থাকল না বেশি দেরি করার। রণধীরের স্ত্রী অলকা এলেন পালবাড়িতে। তুমুল গালিগালাজ করে গেলেন পাড়াপ্রতিবেশী সবাইকে শুনিয়ে, 'এমন মেয়ে আমার থাকলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম। বলিহারি যাই এমন বাপ-মায়ের। বাপের বয়সে মাস্টারের পিছনে মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে মজা দেখছে। আর লাইনেই যদি নামাতে হয়, ভদ্রপাড়ায় কেন? সোনাগাছিতে পাঠান।'

অপমানে সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল সুলেখার। মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে ঘুমচ্ছিল। টেনে তুলেছিলেন চুলের মুঠি ধরে, কিল-চড়-থাপ্পড় খরচ করেছিলেন এলোপাথাড়ি, 'ঠিকই তো বলে গেল, তোর মতো মেয়েকে পেটে ধরাটাও পাপ। পড়াশুনো করে দিগ্‌গজ হওয়া বার করছি তোর।' মারের পর্ব শেষ হওয়ার পর মায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সুদীপা। অদ্ভুত সে দৃষ্টি! যাতে অভিমান তো নয়ই, ক্ষোভ-রাগ-দ্বেষও নয়, ঠিকরে পড়ছিল স্রেফ প্রতিহিংসা।

সুদীপার সে রাতটা কাটল নিদ্রাহীন, সাত-পাঁচ ভাবনায়। স্যারের স্ত্রীর কী দরকার ছিল বাড়ি বয়ে এসে এইসব বলার? এরপর স্যারকে নির্ঘাত ছাড়িয়েই দেবে বাবা। রোজ তো লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা করা যায় না বাইরে। বাড়িতে টিউশনির নামে তবু দেখা হত সপ্তাহে চারদিন। স্যারকে না দেখে সে থাকবে কী করে? বাবা বলল, কাল নাকি স্কুলে যাবে। গেলে তো জানতেই পারবে, গত তিন মাসে অর্ধেকদিন স্কুলেই যায়নি সে। মানে, আরও এক প্রস্থ বকাবকি। আবার মারধর।

সারা পৃথিবীটাই শত্রু হয়ে গেছে যেন হঠাৎ। কেউ বাদ নেই। মায়ের বকাঝকায় না হয় তার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা? যে বাবা কোনওদিন চেঁচিয়ে কথা বলেনি তার সঙ্গে, সেই বাবাও তো তাকে খুব বকেছিল সেদিন। ওই যেদিন স্যারের মাথায় 'অমৃতাঞ্জন' মালিশ করার সময় মা

BanglaBook.org

দেখে ফেলেছিল। আজ বাড়ি ফিরে সব শুনে বাবাও কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। মা তাকে এত মেরেছে জেনেও একবারও কথা পর্যন্ত বলেনি এখনও।

আর দাদু-ঠাকুমাই বা কী! রোজ রাতে শোবার আগে সে একবার দাদু-ঠাকুমার কাছে যায়। ওঁরা আদর করে দেন। তারপর সে উপরে শুতে আসে। আজ রাগে-দুঃখে সে যায়ইনি নীচে। শুয়ে পড়েছে। কই, দাদু-ঠাকুমাও তো উপরে এল না একবার? বাবা ফিরে আসার পর মা যখন চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল, দাদু-ঠাকুমাও তো চুপ করে ছিল। কিছু তো বলল না? স্যার ছাড়া আর কেউ তার ভাল চায় না। বাকি সবাই শত্রু, সবাই। মরে যাক, সবাই মরে যাক। তার কাউকে চাই না। শুধু স্যার পাশে থাকলেই হবে।

'স্যার' ওদিকে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন, পালবাড়িতে টিউশনির পাট চুকতে চলেছে। পরের দিনই সুভাষ বলে দিলেন সরাসরি, 'আপনি আর আসবেন না মাস্টারমশাই। নানা কথা রটছে। আমাদের পাড়ায় থাকা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। বুড়িকে আপনার কাছে পড়াচ্ছিলাম, যাতে এইচএস-এ রেজাল্টটা ভাল করে। জয়েন্টে চান্স পায়। আজ ওর স্কুলে গিয়ে জানলাম, ও গত কয়েক মাসে স্কুলে যায়ইনি অর্ধেকদিন। আপনার ব্যাপারেও খোঁজখবর করলাম। শুনলাম, টানা অ্যাবসেন্ট করার জন্য আপনারও চাকরি গেছে নবাবগঞ্জের স্কুল থেকে। আপনি আমার মেয়ের অনেক ক্ষতি করেছেন। দোহাই, আর করবেন না। আমাদের পরিবারের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ না রাখলেই খুশি হব।'

সুভাষ কিসে খুশি হবেন না হবেন, সে নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর সময় ছিল না রণধীর-সুদীপার। পাছে স্কুল থেকে বাবাকে জানিয়ে দেয়, তাই সপ্তাহখানেক নিয়মিত ক্লাস করল সুদীপা। তারপর ফের রণধীরের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা শুরু করল। মার্চের শুরুর দিকে একদিন ছাত্রীর হাতে একটা কাগজের প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন রণধীর। বললেন, 'তোমার মায়ের তো বলেছ হজমের সমস্যা। রোজ রাতে ইশবগুল খেতে হয়। এই প্যাকেটের মধ্যে কিছু গুঁড়ো আছে। সেটা আজ রাতে ওই ইশবগুলের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ো।'

—কী আছে এতে?

—পথের কাঁটা সরানোর ওষুধ। চল্লিশটা ক্যামপোজ ট্যাবলেট গুঁড়ো করা আছে এতে। খেলে আর ঘুম ভাঙবে না তোমার মায়ের। কেউ যাতে দেখে না ফেলে, এইভাবে মিশিয়ে দিয়ো। লোকে ভাববে তোমার মা সুইসাইড করেছেন। মিটে গেল।

সুদীপা চুপচাপ শুনল। বাড়ি নিয়েও গেল ওই প্যাকেট। কিন্তু ওই গুঁড়ো ইশবগুলের গ্লাসে মেশানোর সাহস হল না শেষ পর্যন্ত। যা শুনে পরের দিন রণধীর হালকা বকাবকিই করলেন সুদীপাকে, 'দেখো, এভাবে কিন্তু বেশিদিন চলবে না। তুমি তো জানোই, তোমাকে নিয়ে আমার বাড়িতেও সমস্যা হচ্ছে। শুধু তোমাকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাই বলে বাড়ির

BanglaBook.org

রোজকার অশান্তিও সহ্য করে চলেছি। এখন তুমি যদি সামান্য ঘুমের ওষুধ মেশাতেও এত নার্ভাস হয়ে পড়ো, তা হলে তো মুশকিল। তা ছাড়া আমি ভেবে দেখলাম, শুধু তোমার মা মারা গেলে আমাদের কোনও লাভ হবে না। তোমার বাবা কিছুতেই আমাদের আর মিশতে দেবেন না। তোমার দাদু-ঠাকুমাও বাধা দেবেন। ওঁরা বেঁচে থাকলে আমাদের একসঙ্গে থাকার স্বপ্নটা আর বেঁচে থাকবে না। এখন তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি কোনটা চাও। তুমি না চাইলে আমি আর যোগাযোগ রাখব না তোমার সঙ্গে।'

কিশোরীবেলার মোহ যে কী মারাত্মক বস্তু! সুদীপা এক সেকেন্ডও ভাবল না উত্তর দিতে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি যেমনটা বলবে, তেমনটাই করব। এবার পারিনি, পরের বার ঠিক পারব। দেখে নিয়ো তুমি।' রণধীর বুকে টেনে নিলেন ছাত্রীকে। নিজের শরীরের সঙ্গে সুদীপাকে মিশিয়ে নিতে নিতে মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন পরবর্তী করণীয়। কালই দেখা করতে হবে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। ফুলবাগানের সত্যবাবুর দোকানে যেতে হবে। আগে এক্সপেরিমেন্ট করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়াটা জরুরি। বিষ বলে কথা!

সোডিয়াম সায়ানাইড আর মারকিউরিক ক্লোরাইড। রণধীরের অনুরোধে জোগাড় করে দিলেন কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দু জানা, বহুদিনের পরিচিত রণধীরের। নোয়াপাড়ারই একটি স্কুলে কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেন বছর পঁয়তাল্লিশের কৃষ্ণেন্দু। কলেজ স্ট্রিটে 'Scientronic India' নামের একটা ছোট দোকানও আছে। নানান ধরনের রাসায়নিক সামগ্রীর দোকান। খুব যে আমদানি হয় সে দোকান থেকে, এমন নয়।

কৃষ্ণেন্দুকে সব খুলে বলেছিলেন রণধীর। টোপ দিয়েছিলেন, 'কাজটা হয়ে গেলে ভাগ্য খুলে যাবে আমাদের। পুরো সম্পত্তি মেয়েটাই পাবে। গয়নাগাটিই যা আছে শুনেছি, পাঁচ-দশ লাখ টাকার হবে। মেয়েটার বাবা রিসেন্টলি এনএসসি করেছে ছ'লাখ টাকার। বোঝ একবার ব্যাপারটা! একটা মোটা অঙ্কের শেয়ার তুইও পাবি। লাইফ বদলে যাবে।'

টাকার অঙ্ক শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর। রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। বিষের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োগ করে নিশ্চিত হওয়াটা? ফুলবাগানে সত্য ঘোষের দোকানে রণধীরকে নিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দু। পশুপাখি নিয়েই সত্যবাবুর কারবার। দোকান থেকে কয়েকটা গিনিপিগ কিনেছিলেন রণধীর। সুদীপার সঙ্গে সেদিনই প্ল্যানমাফিক দেখা করেছিলেন ব্যারাকপুর আর্মি ক্যান্টনমেন্টের সামনে। দুটো ছোট শিশি দিয়েছিলেন সুদীপাকে। যাতে ছিল সোডিয়াম সায়ানাইড আর মারকিউরিক ক্লোরাইড। আর দিয়েছিলেন গিনিপিগগুলো, 'এগুলো বাড়িতে নিয়ে যাও। বলবে, বায়োলজির প্র্যাকটিকালে ডিসেকশন-এর জন্য লাগবে। বিষটা কাল দিয়ে দেখবে, গিনিপিগগুলো মরে কিনা।'

মরল। বিষক্রিয়ায় তিনটে গিনিপিগই মরল। মৃত গিনিপিগগুলো সুদীপা ভোরবেলায় ফেলে দিয়ে এল বাড়ির লাগোয়া মাঠে।

BanglaBook.org

কৃষ্ণেন্দুও আলাদাভাবে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন গিনিপিগের উপর। এবং রণধীরকে জানিয়েছিলেন, এ বিষ মনুষ্যদেহে প্রবেশ করার মিনিটখানেকের মধ্যেই মৃত্যু অবধারিত।

১৮ মার্চের দুপুর। সুদীপার সঙ্গে রণধীর দেখা করলেন টালা ব্রিজের কাছে। শেষবারের মতো যাচাই করে নিলেন সুদীপার মন, 'তুমি পারবে তো? ভেবে নিতেই পারো, এখনও সময় আছে। পরে দোষ দেবে না তো আমাকে? তুমি যদি এতে রাজি না-ও হও, আমি তোমাকে এখন যেমন ভালবাসি, সারাজীবন তেমনই বাসব। দেখাসাক্ষাৎ না হয় না-ই বা হল।'

রণধীর বিলক্ষণ জানতেন, কী প্রতিক্রিয়া হবে মোহগ্রস্ত কিশোরীর। জানতেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁর হাত চেপে ধরবে সুদীপা, 'না না স্যার, কী বলছেন আপনি? আমি রেডি।' রণধীর নিজের হাতে সুদীপার হাতটা তুলে নিলেন, 'আমি জানতাম সোনা, তুমি পারবে। সব মনে আছে তো তোমার? তা হলে কাল বাদে পরশু।'

কাল বাদে পরশু। ২০ মার্চ, ১৯৯১। বুধবার। ব্যারাকপুর স্টেশনে সকালে দেখা করলেন সুদীপা ও রণধীর। ট্রেনে করে শিয়ালদা। সেখান থেকে বাসে ধর্মতলা। কে সি দাশের মিষ্টির দোকান থেকে পাঁচটা কালোজাম আর একশো গ্রাম সীতাভোগ কিনলেন রণধীর। দুপুরের খাওয়াটা দু'জনে সারলেন তালতলার এক হোটেলে। খেতে খেতেই সুদীপাকে পাখিপড়া করে বোঝালেন প্ল্যানের খুঁটিনাটি। শেষে বললেন, 'মনকে শক্ত করো। দেখবে, আমরা নতুন করে বাঁচব।'

উত্তর দিতে গিয়ে গলা সামান্য কেঁপে গেল সুদীপার, 'হ্যাঁ।' সে কম্পন টের পেলেন রণধীর এবং উপেক্ষা করলেন। ফিরে যাওয়ার আর রাস্তা নেই। সব ঠিকঠাক চললে পালবাড়ির যাবতীয় সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ আসতে চলেছে তাঁর হাতে।

নোয়াপাড়া ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল রণধীর-সুদীপার। বাড়ি ফিরলেন দু'জনেই। পালবাড়ির সদর দরজা সাধারণত রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার আগে বন্ধ হয় না। ভেজানোই থাকে দরজা। রাত পৌনে আটটায় রণধীর ঢুকলেন পালবাড়িতে। হাতে দুটো মিষ্টির বাক্স। কাঁধে একটা ব্যাগ। সুলেখা তখন একতলার রান্নাঘরে। একতলাতেই নিজেদের ঘরে রয়েছেন দেবেন্দ্র-লতিকা। টিভি দেখছেন। সুভাষ আছেন দোতলায় নিজেদের শোবার ঘরে। কাজ সেরে ফিরেছেন একটু আগে। খাটে শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন।

রণধীর সোজা উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সুদীপা অপেক্ষাতেই ছিল। প্ল্যানমতো রান্নাঘর থেকে আগেই একটা থালা এনে রেখে দিয়েছিল নিজের দোতলার ঘরে। থালা হাতে মেয়ে আর মিষ্টির প্যাকেট হাতে গদু মাস্টার, দু'জনকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসলেন সুভাষ। অবাক যতটা, তার থেকেও বেশি বিরক্ত। টিউশনি ছাড়িয়ে দেওয়ার পর এই প্রথম রণধীর এলেন এবাড়িতে। কোনওরকম যোগাযোগ না রাখতে তিনি যথেষ্ট কড়াভাবেই বলে দিয়েছিলেন রণধীরকে। তা সত্ত্বেও এভাবে বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ হাজির?

BanglaBook.org

—না জানিয়ে এভাবে চলে এলাম সুভাষবাবু, ক্ষমা করবেন। আসলে আমি নতুন কাজ পেয়েছি একটা। বেলঘরিয়ার একটা স্কুলে হেড মাস্টারের চাকরি। আগামী পরশু জয়েন করব। আপনাদের বাড়ির সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক, তাই একটু মিষ্টি নিয়ে এলাম। আমি আর কখনও এই বাড়িতে আসব না, কথা দিচ্ছি। কোনও ভুল-বোঝাবুঝি রাখবেন না মনে প্লিজ।

রণধীরের কথায় সুভাষ সামান্য অপ্রস্তুত। ততক্ষণে মিষ্টির বাক্স খুলে ফেলেছেন রণধীর। কালোজাম আর সীতাভোগ সুদীপা দ্রুত সাজিয়ে ফেলেছে থালায়। একটা কালোজাম সুভাষের হাতে ধরিয়েও দিয়েছে সুদীপা। মিষ্টি মুখে পুরলেন সুভাষ। এবং তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে মুখ বিকৃত হয়ে গেল যন্ত্রণায়। নীলাভ হয়ে এল শরীর। প্রতিটা কালোজামের উপরের পুরু অংশটা অল্প একটু ভেঙে সোডিয়াম সায়ানাইড আর মারকিউরিক ক্লোরাইড ভিতরে ভরে এনেছিলেন রণধীর। সীতাভোগেও ছিল বিষ মাখানো।

বিষ কাজ করল অব্যর্থ। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না সুভাষ। ঢলে পড়লেন খাটেই। সুদীপা নির্বিকার সাক্ষী থাকল বাবার মৃত্যুর।

এবার টার্গেট সুলেখা। রান্নাঘরে রণধীর-সুদীপাকে ঢুকতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন সুলেখা। সুভাষকে যা বলেছিলেন একটু আগে, সেটাই রণধীর বললেন সুলেখাকে। সঙ্গে যোগ করলেন, 'আমি সত্যিই অনুতপ্ত বউদি, প্লিজ রাগ করে থাকবেন না। একটা মিষ্টি অন্তত খান, না হলে খুব দুঃখ পাব।' সুলেখাও অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন রণধীরকে দেখে। তবু ভদ্রতার খাতিরে থালা থেকে একটা কালোজাম নিয়ে কামড় দিলেন। সুলেখা চিৎকার করতে পারেন, এই আশঙ্কায় ক্লোরোফর্মে ভেজানো রুমাল ব্যাগে এনেছিলেন রণধীর। সেটাও চেপে ধরলেন সুলেখার মুখে। স্বামীর মতোই পরিণতি হল সুলেখার। মৃত্যু এল চকিতে। সাক্ষী থাকল একমাত্র সন্তান।

রইল বাকি দুই। দেবেন্দ্রমোহন আর লতিকা। নাতনির সঙ্গে রণধীরকে ঢুকতে দেখে অবাক ওঁরাও। ওই একই নতুন চাকরির গল্প শোনালেন রণধীর। এবং ঠাকুমার মুখে কালোজাম গুঁজে দিল নাতনি। স্ত্রীর সারা শরীর যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে দেখে বিপদের আঁচ পেলেন দেবেন্দ্রমোহন। আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। উঠে বসতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। রণধীর এক ধাক্কায় ঠেলে শুইয়ে দিলেন খাটে। চেপে ধরলেন হাত দুটো। জোর করে দাদুর মুখে সীতাভোগ ঠুসে দিল সুদীপা।

চারজন জলজ্যান্ত মানুষ মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই লাশ হয়ে গেলেন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল প্রায় একটা আস্ত পরিবার। সেই পরিবারেরই নাবালিকা মেয়ে আর তার প্রৌঢ় মাস্টারমশাইয়ের ষড়যন্ত্রে!

কাজ তখনও বাকি ছিল। ছকও কষাই ছিল। কাঁধের ব্যাগ থেকে রণধীর বের করলেন তামার তারের গোছা। পেঁচিয়ে বাঁধলেন চারজনের দেহে। তারের অন্য প্রান্ত গুঁজে দিলেন কাছাকাছির ইলেকট্রিক প্লাগ পয়েন্টে। যাতে মনে হয়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই মৃত্যু। পুড়ে গেল দেহগুলোর কিছু

BanglaBook.org

অংশ। এরপর একতলা-দোতলায় যত আলমারি-দেরাজ ছিল, তা থেকে জিনিসপত্র বের করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলেন রণধীর। পুরোটাই করলেন সঙ্গে আনা গ্লাভস পরে, যাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট না পাওয়া যায় কোথাও। ডাকাতির চেহারা দেওয়া হল গোটা বাড়িতে।

সুদীপা মিষ্টির থালাটা সন্তর্পণে ফেলে এল বাড়ি-সংলগ্ন মাঠের এক প্রান্তে, ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে। তারপর ব্যাগে রাখা দড়ি দিয়ে সুদীপাকে পিছমোড়া করে বাঁধলেন রণধীর। মুখেও বাঁধলেন কাপড়। যা নিয়ে এসেছিলেন ব্যাগেই। রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ সদর দরজার বাইরে ফেলে এলেন সুদীপাকে, 'আমি চললাম, আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক চুপচাপ থেকে তারপর আওয়াজ কোরো। পুলিশকে কী বলতে হবে, ভুলে যেয়ো না।'

আওয়াজের উৎস প্রতিবেশীরা আবিষ্কার করলেন মধ্যরাতে। পুলিশ এল। সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের চারজন খুন। বাড়ির একমাত্র কিশোরী কন্যা উদ্ধার হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায়। শোরগোল পড়ে গেল। ঘটনার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মামলার দায়িত্ব নিল সিআইডি। ইছাপুরের 'পালবাড়ি' রাতারাতি পরিণত হল দ্রষ্টব্য স্থানে।

সিআইডি-র তরফে তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন সাব-ইনস্পেকটর দুলাল সোম। ইনস্পেকটর দেবব্রত ঠাকুর ছিলেন তত্ত্বাবধানে। ক্লোরোফর্মের একটা শিশি, কিছু তুলো আর লাশে জড়ানো তামার তার ছাড়া বলার মতো উল্লেখযোগ্য কিছু বাজেয়াপ্ত হয়নি পালবাড়ি থেকে। ভাবা গিয়েছিল, হাতের ছাপ কিছু অন্তত পাওয়া যাবে ঘরের আলমারি-দেরাজ থেকে। পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট ধোঁয়াশা ছিল। বলা হয়েছিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেহের কাটাছেঁড়া করে যা দেখা গেছে, বিষক্রিয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিশ্চিত হওয়ার জন্য 'viscera' (দেহের অঙ্গাংশ, মূলত বুক এবং পেটের) সংরক্ষিত করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট মতামত মেলেনি প্রাথমিক পোস্টমর্টেম রিপোর্টে। বিভ্রান্তি থেকেই গিয়েছিল।

বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছিল সুদীপাও। ঘটনার পরের দিন পিসি-পিসেমশাই নিজেদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন সুদীপাকে। কখনও সেখানে গিয়ে সুদীপার সঙ্গে কথা বলতেন তদন্তকারীরা, কখনও গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসা হত সিআইডি-র নৈহাটির অফিসে। সুদীপাই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী আপাতদৃষ্টিতে। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কল্পনাতীত ছিল, প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের মা-বাবা-দাদু-ঠাকুমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে সতেরো বছরের কোনও নাবালিকা! আততায়ীদের সন্ধান পেতে সুদীপার বয়ানের উপরেই ভরসা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না পুলিশের। যখন নৈহাটির

BanglaBook.org

অফিসে সুদীপার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন অফিসাররা, খুবই সতর্ক থাকতেন, যাতে মেয়েটির মনের উপর কোনওরকম চাপ না পড়ে। যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা যায় সদ্য পরিবার-হারা কিশোরীকে, সে চেষ্টায় ত্রুটি রাখতেন না তদন্তকারীরা। 'আহা রে, একেবারে অনাথ হয়ে গেল বেচারি'—এই ছিল মনোভাব।

সুদীপা শুরুতে গল্পটা যেভাবে সাজিয়েছিল, বলি। সাত-আটজন দশাসই চেহারার লোক রাত্রে ঢুকে পড়েছিল বাড়িতে। সবার হাতে ছুরি বা পিস্তল ছিল। এদের সবারই মুখ বাঁধা ছিল। এদের সঙ্গে সুভাষের তর্কাতর্কি হয় চোরাই সোনাদানা নিয়ে। সুভাষ নাকি গোপনে সোনার চোরাচালানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রাতের দিকে মাঝেমাঝেই সুভাষের কাছে কিছু লোক আসত। চোরাই জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করত। এরাই সম্ভবত এসেছিল। ওরা সুভাষের কাছে পাওনাগন্ডার হিসেব চায়। তর্কাতর্কি হয় কিছুক্ষণ। তারপর ওরা ছুরি-পিস্তল তুলে সবাইকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। ঘরদোরের আলমারি সব তছনছ করে। টাকাপয়সা-গয়নাগাটি সব নিয়ে ব্যাগে পুরে নেয়। সুভাষ একসময় বলেন, 'পুলিশকে জানিয়ে দিলে তোরা বাঁচবি ভেবেছিস?' তখন ডাকাতরা বাবা-মা-দাদু-ঠাকুমার মুখ চেপে ধরে শরীরে তামার তার জড়িয়ে প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে দেয়। আর সুদীপাকে বেঁধে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে যায়।

এই প্রাথমিক বয়ানে সুদীপা অনড় ছিল দিন দশেক। তারপর ফের গল্প ফাঁদে কোনও এক 'স্বপন'-এর। বলে, এখন মনে পড়েছে, যারা এসেছিল ডাকাতি করতে, তাদের মধ্যে একজনকে নাকি সুভাষ 'স্বপন' বলে ডেকেছিলেন। 'স্বপন' নামে কোনও দাগি ডাকাত আছে কিনা, সেই খোঁজে ছুটে বেড়ালেন সিআইডি অফিসাররা। তুলেও আনা হল ডাকাতির পূর্ব-ইতিহাস থাকা দু'জন 'স্বপন'-কে। যাদের জেরা করে আধঘণ্টার মধ্যেই বোঝা গেল, কোনওভাবেই এরা যুক্ত নয় এই ঘটনার সঙ্গে।

'স্বপন'-পর্ব মিটে গেলে সুদীপার মুখে উঠে এল কোনও এক 'খান্না আঙ্কল'-এর কথা। যাঁর সঙ্গে সুভাষ নাকি পাথরের ব্যবসায় নামার কথা ভাবছিলেন। বিনিয়োগও করেছিলেন মোটা অঙ্কের টাকা। খোঁজখবর করা হল এ নিয়েও। কিছুই পাওয়ার কথা ছিল না। পাওয়া গেলও না।

নৈহাটির অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের সময় রণধীর প্রায়ই দেখা করতে আসতেন সুদীপার সঙ্গে। দীর্ঘদিনের গৃহশিক্ষক ছিলেন, বয়সে পিতৃতুল্য, আসতেই পারেন, একেবারে শুরুর দিকে এমনই ভেবেছিল পুলিশ। কয়েকদিন পরেই অবশ্য স্থানীয় মানুষের কানাঘুষোয় তদন্তকারী অফিসাররা জানলেন, শিক্ষক-ছাত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের গণ্ডি ছাড়িয়েছিলেন রণধীর-সুদীপা। এ নিয়ে পালবাড়ির সামনে প্রকাশ্য অশান্তিও করেছিলেন রণধীর-পত্নী অলকা।

পুলিশ বুঝতে পারছিল, সুদীপার এই ঘনঘন বয়ান বদলানো মোটা অত্যন্ত গোলমেলে। মেয়েটা মিথ্যে বলছে, লুকচ্ছে অনেক কিছু। একবার বলছে, বাবা চোরাই সোনাদানার ব্যবসায় যুক্ত

BanglaBook.org

ছিল। একবার বলছে, বাবার পাথরের ব্যবসাও ছিল। কখনও 'স্বপন'-এর নাম বলছে, কখনও আবার 'খান্না আঙ্কল'-এর, যাদের কারও অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া ডাকাতরা এসে একটা পরিবারের চারজনকে মেরে লুঠপাট করে গেল, অথচ পরিবারেরই একজনকে ছেড়ে দিয়ে গেল? যে কিনা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, যাকে বাঁচিয়ে রাখলে বরং চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা? সুদীপার গল্পে গোড়াতেই গলদ ছিল বিস্তর। কিন্তু শোকে মুহ্যমান এক নাবালিকাকে কড়া ধাঁচের পুলিশি জেরাও করা যাচ্ছিল না। দুটোর বেশি তিনটে পালটা প্রশ্ন করলেই কেঁদে ফেলছিল।

রণধীরের সঙ্গে সম্পর্কজনিত কোনও গল্প আছে ঘটনার নেপথ্যে? যদি বা থাকে, প্রমাণ কই? তা ছাড়া ওই পঞ্চান্ন বছরের একটা সিড়িঙ্গেমার্কা লোক আর সতেরো বছরের একটা মেয়ে মিলে চার-চারটে লোককে মেরে ফেলা কি সোজা নাকি? কীভাবে মারবে? কোনও চিৎকার-চেঁচামেচি কেউ শুনল না, কেউ কোনও প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন না, চারটে মানুষ স্রেফ লাশ হয়ে গেলেন? কীভাবে সম্ভব?

কীভাবে সম্ভব, তার একটা আভাস প্রথম পেলেন সিআইডি-র তরুণ সাব-ইনস্পেকটর প্রবীর সান্যাল। যিনি তদন্তকারীদের 'কোর' টিমে যোগ দিয়েছিলেন ঘটনার মাসখানেক পর। প্রবীরের সুবিধে ছিল, বাড়ি নৈহাটিতে। নোয়াপাড়া-জগদ্দল-নৈহাটি, এই অঞ্চলের বহু মানুষকে চিনতেন, জানতেন। পরিচিতি ছিল সর্বস্তরে। এমনই এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন সান্ধ্য আলাপচারিতার মধ্যে কথায় কথায় বেরিয়ে এল না-জানা তথ্য। ভদ্রলোক বললেন, 'কী ট্র্যাজিক, না? একটা পরিবার শেষ হয়ে গেল। একটা মেয়ে একরাতের মধ্যে অনাথ হয়ে গেল পুরোপুরি। আমরা তো ওই পাড়াতেই থাকি। মেয়েটার সঙ্গে রেবার দেখা হয়েছিল ইনসিডেন্টটার কয়েকদিন আগেই। পালবাড়ির পাশের মাঠে মর্নিং ওয়াকের সময়। কী একটা গিনিপিগ না কি ফেলতে এসেছিল।'

গিনিপিগ? সুদীপা ফেলতে এসেছিল বাড়ির পাশের মাঠে? স্নায়ু মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছিল প্রবীরের। রেবা মানে ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী, যাঁর সঙ্গে সেদিনই কথা বললেন প্রবীর, ঠিক কী হয়েছিল? রেবা জানালেন, পালবাড়িতে ওই মর্মান্তিক ঘটনার কয়েকদিন আগে মর্নিং ওয়াকের সময় মাঠে সুদীপার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সুদীপা একটা পলিথিনের প্যাকেট থেকে মাঠে কিছু একটা ফেলছিল। রেবা স্বাভাবিক কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী রে, কী খবর? কী ফেলছিস?' সুদীপা বলেছিল, 'এই তো কাকিমা, বায়োলজির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য দুটো গিনিপিগ ছিল বাড়িতে। মরে গেছে। ফেলতে এসেছি।'

ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে এসে গিয়েছিল ফরেনসিক-বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর ড. রবীন বসুর রিপোর্ট। যাতে পরিষ্কার লেখা ছিল, ভিসেরায় বিষক্রিয়ার স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়নি ঠিকই। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে বিষ প্রয়োগ হয়নি। সময়ের ব্যবধানে ভিসেরায় না-ই পাওয়া যেতে পারে

BanglaBook.org

বিষচিহ্ন, কিন্তু সেক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে ময়নাতদন্তের সময় দেহে পাওয়া লক্ষণসমূহে। যা এক্ষেত্রে পরিষ্কার জানান দিচ্ছে, 'সায়ানাইড' গোত্রের বিষ মৃতদের দেহে ঢুকেছিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নয়, বিষেই মৃত্যু। কীভাবে মেশানো হল বিষ? আর সুদীপার বাড়িতে গিনিপিগই বা এল কী করে? পোষার জন্য কেউ গিনিপিগ রাখে না বাড়িতে। তা ছাড়া স্কুল থেকে কখনও গিনিপিগ সরবরাহ করা হয় ছাত্রছাত্রীদের, বাড়িতে কাটাছেঁড়ার জন্য? কেউ কখনও শুনেছে? গিনিপিগগুলো মরলই বা কী করে? পরীক্ষানিরীক্ষা? বিষ প্রয়োগ?

যে সুদীপা এতদিন নানা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে চলেছিল লাগাতার, কখনও কেঁদে, কখনও সারাদিন অভুক্ত থেকে, কখনও শোকস্তব্ধতার অভিনয় করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করে চলেছিল, 'গিনিপিগ-প্রসঙ্গ' উঠতেই সেই সুদীপা আমতা-আমতা করতে শুরু করল। চোখেমুখে স্পষ্টতই দেখা দিল ভয়-দুশ্চিন্তা-আতঙ্ক। এরপর ঘণ্টাখানেকের জিজ্ঞাসাবাদ এবং স্বীকারোক্তি। স্তব্ধ হয়ে শুনলেন অফিসাররা। এমন ঘটনা এরাজ্যে এর আগে হয়নি নিশ্চিত। সম্ভবত দেশেও হয়নি। কী-ই বা বিশেষণ ব্যবহার করা যায়, 'বিরলতম' ছাড়া?

যে থালায় কালোজাম-সীতাভোগ সাজিয়েছিল সুদীপা, সেটা উদ্ধার হল বাড়ির লাগোয়া মাঠের ঝোপের মধ্যে থেকে। ফরেনসিক পরীক্ষায় সেই থালায় পাওয়া গেল সায়ানাইড গোত্রের বিষকণা। গ্রেপ্তার হলেন সুদীপা-রণধীর-কৃষ্ণেন্দু। খুন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অপরাধে সহায়তা এবং প্রমাণ লোপাটের মামলা দায়ের হল তিন ধৃতের বিরুদ্ধে। রণধীর-কৃষ্ণেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনওরকম সংস্রব।

সুদীপা সবটাই খুলে বলেছিলেন পুলিশকে দেওয়া জবানবন্দিতে। কিন্তু মুশকিল হল, পুলিশকে দেওয়া বয়ান আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয় না, যদি না সেই বয়ানের সত্যতা অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুদীপা এখন যা বলছে, সেটা পরে কোর্টে অস্বীকার করলে মামলা বিশ বাঁও জলে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এখন পর্যন্ত যা খেল দেখিয়েছে এই মেয়ে, কিছুই অসম্ভব নয়। সুদীপার স্বীকারোক্তিই এই মামলার বুনিয়াদ। যা একেবারেই অটুট থাকবে না, যদি সুদীপা কোর্টে হেরফের করে বয়ানের। দোষীদের সাজা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এক ধাক্কায়। আবার, পুলিশকে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে অনড় থাকলে নিজেকেও যে জেলে পচে মরতে হবে, সেটা না বোঝার মতো বোকা ছিল না সুদীপা। বারবার বলত প্রবীরকে, 'আমি তো সব স্বীকার করেছি... সব বলে দিয়েছি... কিন্তু সে জন্য আমার ফাঁসি হবে না তো?' অফিসাররা আশঙ্কায় ছিলেন সুদীপার মতিগতি নিয়ে।

একটাই উপায় ছিল এই আশঙ্কা দূর করার। সেটাই প্রয়োগ করা হল। দেবব্রত-দুলাল-প্রবীররা বোঝালেন সুদীপাকে, 'সারাটা জীবন পড়ে আছে তোমার সামনে। সেটা যাতে জেলে পচে নষ্ট না হয়, সেটা নিশ্চিত করার একটাই পথ আছে। রাজসাক্ষী হয়ে যাও। আদালতে নিজের দোষ স্বীকার করো। আইনে বিধি আছে, রাজসাক্ষীদের অপরাধ মকুব হয়ে যায়। ভেবে দেখো ভাল

BanglaBook.org

করে। যা করেছ, সাজা হবেই। হয় ফাঁসি, নয় যাবজ্জীবন। তার চেয়ে দোষ স্বীকার করে নেওয়া ভাল নয় কি? বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত জেলে থাকতে হবে, এই যা। মাত্র কয়েক বছরের ব্যাপার। তারপরই ছাড়া পেয়ে যাবে। সেটাই নিয়ম।'

সুদীপা রাজি হল। রাজসাক্ষী হিসেবে বয়ান দিল আদালতে। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারার প্রয়োগে সুদীপাকে ক্ষমা করলেন বিচারক। আইনি পরিভাষায় যাকে বলে 'Tender of pardon'। এই মামলায় সুদীপা আর অভিযুক্ত থাকল না আইন অনুযায়ী। ক্ষমাপ্রাপ্তির পর স্রেফ সাক্ষী। শুধু সাক্ষী নয়, রাজসাক্ষী।

তদন্তকারী অফিসার দুলাল সোম ৯১-এর ২০ ডিসেম্বর পেশ করেছিলেন চার্জশিট। যে চার্জশিটের মূল ভিত্তিভূমিই ছিল রাজসাক্ষী সুদীপার স্বীকারোক্তি। যে বয়ানের সমর্থনে সংগৃহীত হয়েছিল প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ।

ফুলবাগানের যে দোকান থেকে গিনিপিগ কিনেছিলেন রণধীর-কৃষ্ণেন্দু, তার মালিক আদালতে চিহ্নিত করেছিলেন দুই অভিযুক্তকে। কে সি দাশ-এর দোকানের এক কর্মচারীও মনে করতে পেরেছিলেন এক দোহারা চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোককে, যাঁর সারা মুখে শ্বেতির দাগ। এক কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে এসে যিনি কালোজাম আর সীতাভোগ কিনেছিলেন মার্চের এক দুপুরে। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য আরও ছিল। সুদীপার স্কুলের অ্যাটেনডেন্স শিট, রণধীরের স্কুলের হাজিরা-খাতা। পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যাচ্ছিল, একই দিনে 'অ্যাবসেন্ট' হতেন দু'জন। অলকা যে পালবাড়িতে অশান্তি করেছিলেন দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তার।

রণধীরের বাড়ি থেকে তামার তারও পাওয়া গিয়েছিল কয়েক গোছা, যা মৃতদেহগুলির সঙ্গে পেঁচিয়ে রাখা তারের গঠনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল হুবহু। সুদীপা বাড়ির যে সব গয়না চুরি করে দিত স্যারকে, সেগুলো স্থানীয় এক দোকানে বন্ধক রেখে টাকা নিতেন রণধীর। চিহ্নিত হয়েছিল সেই দোকান। উদ্ধার হয়েছিল গয়না। সাক্ষ্য দিয়েছিলেন দোকানি।

The facts in the connected case Jeadtng to the projection of a scenario give us a glimpse of commission of calculated murder of four persons to wipe out the family with the design of avarice. The same is not only cruel but also calculated with sinister design. This court feels pained to come across such rarest of rare cases where we find that our existence in a civilised society is tinctured with frailties of human nature where human values of life are made a casualty at the altar of the design of crusader against all virtues of co-operative in stinct of human existence in civilised society. Accordingly, we are constrained to confirm the award of death penalty given to accused appellant No. 1 and, as such, conviction and sentence awarded to Ranadhir Basu of the offence under sections 302, 302/120B and 201 and also for the offence under section 302 IPC are hereby confirmed and we approve of the award of death penalty meted out to accused No. 1 Accordingly, Criminal Appeal No. 257 of 1996 stands dismissed on contest.

মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছিল হাইকোর্ট

প্রায় পাঁচ বছরের বিচারপর্ব শেষে জেলা আদালত রায় দিয়েছিল ৯৬-এর ৯ অগস্ট। রণধীর-কৃষ্ণেন্দুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন বিচারক। রাজসাক্ষীদের ক্ষেত্রে যা প্রথা, বিচারপর্ব শেষে সুদীপা মুক্তি পেয়েছিল জেলজীবন থেকে। রণধীর-কৃষ্ণেন্দু হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। যেখানে বহাল থেকেছিল ফাঁসির হুকুম। সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দুই সাজাপ্রাপ্ত। সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল-জবাব চলেছিল প্রায় দেড় বছর। ফাঁসির সাজা শেষ পর্যন্ত কমে দাঁড়িয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসে।

একদিকে রণধীর-কৃষ্ণেন্দুর দোষী সাব্যস্ত হওয়া, অন্যদিকে রাজসাক্ষী সুদীপার মুক্তি, কম বিতর্ক হয়নি সে সময় এ নিয়ে। এটা কেমন বিচার হল? মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে চক্রান্ত করে একটা সতেরো বছরের মেয়ে ঠান্ডা মাথায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল মা-বাবা-দাদু-ঠাকুমাকে, তারপর দোষ স্বীকার করে নিল বলে চার খুন মাফ? যত দোষ শুধু রণধীর-কৃষ্ণেন্দুর? এবার থেকে তা হলে ষড়যন্ত্র করে মানুষ খুনেও বাধা নেই, দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়ে গেলেই যখন ক্ষমা করে দেবে আদালত?

By fulfilling the terms of her pardon approver Sudipa Pal, who has been detained in custody, earns her discharge with the termination of trial of this case.

জেলা আদালতে বিচার শেষের পর রাজসাক্ষী সুদীপার মুক্তির আদেশ

সুদীপার মুক্তিপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ারও চেষ্টা হয়েছিল তখন, বিক্ষিপ্ত কিছু বিক্ষোভ-আন্দোলনে। কিন্তু আইন আইনই। আদালতও আদালতই। তার রায়ের উপর কথা চলে না। বিচারক সবদিক বিবেচনা করে মনে করেছিলেন, ক্ষমা প্রাপ্য সুদীপার। ক্ষমা করেছিলেন ফৌজদারি বিধির আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসারেই। সে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বা যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনুচিত। অসংগতও।

রণধীর বসু। এক প্রৌঢ় শিক্ষক। যিনি অর্থকষ্ট থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজতে চেয়েছিলেন মোহগ্রস্ত কিশোরী ছাত্রীর মাধ্যমে। লোকলজ্জাকে বন্ধক রেখেই। চারজন নিরপরাধ মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চিত্রনাট্য সাজিয়েছিলেন ঠান্ডা মাথায়।

সপ্তদশী সুদীপা পাল। মায়ের শাসনে যার ক্ষোভ জমতে জমতে পরিণত হয়েছিল ক্রোধে-আক্রোশে-জিঘাংসায়। মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল অসমবয়সি প্রেমে। জড়িয়ে পড়েছিল মা-বাবা-দাদু-ঠাকুমাকে খুনের চক্রান্তে।

BanglaBook.org

কুড়ি বছরেরও বেশি কারাবাসের পর ২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিলেন রণধীর। লালবাগ সংশোধনাগারে যখন ছিলেন, বন্দিদের অঙ্ক শিখিয়ে সময় কাটাতেন। জেলেই খুলেছিলেন কোচিং ক্লাস।

সুদীপা? '৯১-৯৬, পাঁচ বছর জেলে থাকাকালীন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন এক বন্দির সঙ্গে। কারাবাসেই ভেঙে গিয়েছিল সে সম্পর্ক। জেল থেকে মুক্তির পর যে জীবন বাইশ বছরের সুদীপার অপেক্ষায় ছিল, তা সুখের হয়নি। রণধীর কৃতকর্মের ফল জেলের ভিতরে ভোগ করেছিলেন। সুদীপা বাইরে। দারিদ্র্য-অসম্মান-লাঞ্ছনা-গঞ্জনার যে ধারাবাহিক ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে সুদীপাকে যেতে হয়েছিল, যেতে হচ্ছে এখনও, তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কোথায় আছেন এখন, কীভাবে আছেন, সে বৃত্তান্তও না হয় থাক।

যা গেছে তা যাক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মিতিনমাসিও সত্যি

—উড ইউ কেয়ার ফর অ্যানাদার ড্রিঙ্ক?

মাথা নাড়লেন জুডিথ। ওয়াইন এমনিতে তাঁর বরাবরের পছন্দের। কিন্তু আজ আর ইচ্ছে করছে না। ক্লান্ত লাগছে ভীষণ। আচ্ছন্ন লাগছে। ঝিম ধরছে। অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে আজ। এতটা না খেলেই হত বোধহয়। কিন্তু একটু বেনিয়ম হয়ে তো যায়ই এক একটা বিশেষ দিনে। কী আর করা? শরীরের প্রতিটা কোষ একটাই দাবি করছে এখন। ঘুম, নিশ্চিন্ত ঘুম। বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে কোনওমতে বলতে পেরেছিলেন, 'গুড নাইট সুজয়।' একুশ বছরের জুডিথ অলীক কল্পনাতেও ভাবেননি তখন, রাত্রি শুভ হওয়া তো দূরস্থান, চরম অভিশপ্ত হতে যাচ্ছে।

'ফিলিং স্লিপি বেবি?' বলে সুজয় যখন বিছানায় উঠে এসেছিল, হাত রেখেছিল গালে, ওই আধোজাগা অবস্থাতেও জুডিথ বুঝেছিলেন সহজাত নারী-ইন্দ্রিয়ে, এ স্পর্শ নিছক বন্ধুত্বের নয়। উঠে বসতে চেয়েছিলেন। পারেননি। শিরা-ধমনিতে অ্যালকোহলের দাপাদাপিতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। এবং সুজয় যখন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল গায়ের জোরে, আপ্রাণ প্রতিরোধও কাজে আসেনি। 'নো! প্লিজ নো... প্লিজ...', নিষ্ফল চিৎকারে এটুকু বলতে পেরেছিলেন শুধু, মনে আছে।

ওটুকুই। বাকিটা ব্ল্যাকআউট। 'ফরম্যাটিং' করে কেউ যেন পরিপাটি মুছে দিয়েছে মেমরি কার্ড থেকে।

BanglaBook.org

চ্যানেলে চ্যানেলে 'ব্রেকিং নিউজ' চলতে শুরু করল দুপুর আড়াইটে-পৌনে তিনটে থেকে। যে খবর নেহাতই মামুলি এবং সবার জানা হয়ে গেছে, তাতে হরেক মালমশলা মিশিয়ে 'ব্রেকিং' বলে চালিয়ে দেওয়ার যে ফর্মুলা চালু আছে বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে, তার অনুসারী নয় এ ঘটনা। উদ্বেগ-আশঙ্কা-চাঞ্চল্য-ঔৎসুক্য... যাবতীয় উপাদান মজুত এই খবরে। আক্ষরিক অর্থেই 'ব্রেকিং'।

সুজয়ের বাড়িতে ঢোকার প্রবেশপথ

'দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে বিদেশিনীকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেফতার'..., 'ভোররাতে শারীরিক অত্যাচারের শিকার বিদেশিনী যুবতী, পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্ত'..., 'শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে লালবাজার, রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্র দফতরের'...।

অত্যাচারিতা যেহেতু বিদেশিনী, স্থানীয় সীমানা ছাড়িয়ে দ্রুত সর্বভারতীয় মিডিয়ায় নিজস্ব নিয়মে জায়গা করে নিল খবরটা। জাতীয় স্তরের চ্যানেলগুলোতেও সমান গুরুত্ব দিয়ে শুরু হল ঘটনার বিবরণ।

ঘটনার বিস্তারে ঢোকার আগে সামান্য দু'-চার কথা। গোয়েন্দা কাহিনিতে আসক্ত পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, 'রহস্যহীনতায় কে বাঁচিতে চায়!' যে মামলার কথা লিখছি, গোড়াতেই স্বীকার্য, তা সেই অর্থে রহস্যহীনই। অপরাধী যে আসলে কে, একাধিক সূত্রের পুলিস ছাড়ে সেটা আন্দাজ করার রোমাঞ্চ নিরুদ্দেশ এই কেসে। বরং উলটোটাই। অভিযুক্ত চিহ্নিত অপরাধে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই। এবং গ্রেফতারও অনতিবিলম্বে। তা হলে আর রহস্যের রইলটা কী?

লেখার এখানে এটুকুই, গুরুতর মামলার তদন্ত মোটেই সীমায়িত নয় স্রেফ অপরাধী চিহ্নিতকরণে। শাস্তিবিধান নিশ্চিত করাতেই তার পূর্ণতা। বাস্তবের তদন্ত ছোটগল্প নয়, 'শে হয়ে হইল না শেষ'-এর অমোঘ মোচড় কেস ডায়েরিতে আশা করা। তদন্ত তুলনীয় নয় উপন্যাসে সাঙ্গও, চরিত্রের চালচিত্র বা ঘটনার ঘনঘটায় যা আমূল নাড়িয়ে দেবে পাঠককে। কোনও কেসে

BanglaBook.org

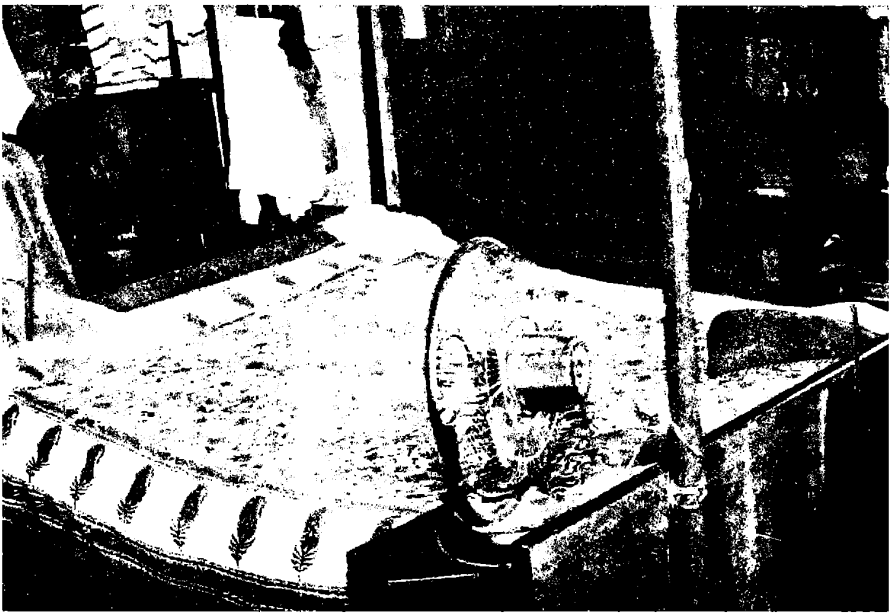

যে ঘরে ঘটনা ঘটেছিল

সমাধান-পরবর্তী তদন্ত আপাত-নীরস প্রবন্ধের মতো। যার অনাড়ম্বর গতিপথে আসলে লুকিয়ে থাকে বহু চড়াই-উতরাই। আলোচ্য মামলাটি যেমন। তদন্তকারীদের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের নিরিখে শুধু কলকাতা নয়, দেশের তদন্ত-ইতিহাসেও এই কেস দিক্‌চিহ্নস্বরূপ।

কালীঘাট থানার মামলা। তারিখ, পয়লা জুন ২০১৩। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(১) ধারায়। অভিযোগ ধর্ষণের। অভিযোগকারিণী বিদেশিনী। আইরিশ যুবতী। নাম জুডিথ।

জুডিথ ফ্লোরেন্স। আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি কাভানের কাছে বাল্টিমোরস ব্রিজ বলে এক মফস্‌সল শহরের বাসিন্দা। মধ্যবিত্ত পরিবারের কলেজছাত্রী। বয়স কুড়ি ছাড়িয়ে একুশ ছোঁয়ার মুখে। আর পাঁচটা ওই বয়সের তরুণী যেমন হন, তেমনই। উচ্ছল, প্রাণবন্ত। হাসিখুশি আমুদে স্বভাবের জন্য বন্ধুবৃত্তে তুমুল জনপ্রিয়। সপ্তাহান্তে বন্ধুদের 'গেট টুগেদার'-এর হইহুল্লোড় থেকেই না জুডিথকে ছাড়া।

কলেজের পড়াশুনো আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার পাশাপাশি সমাজসেবাতেও কিশোরীবেলা থেকেই ঝোঁক জুডিথের। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন সময়-সুযোগ হলেই। মাদার টেরিজার কথা শুনে এসেছেন ছোটবেলা থেকে। ইচ্ছে, মাদারের 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-র সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত হওয়ার। সেটার মূল কর্মকাণ্ড অবশ্য ইন্ডিয়ায়, ক্যালকাটা

BanglaBook.org

বলে একটা শহরে। ওয়েস্টবেঙ্গল বলে স্টেটে। হলই বা বহুদূরের বিদেশবিভুঁই, যাওয়া যায় না একবার?

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়ই। হলও। ডাবলিনের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ কলকাতার 'মাদার হাউস'-এর। যে সংস্থা প্রতি বছরই ইউরোপের একাধিক শহর থেকে বাছাই করা জনা বিশেক তরুণ-তরুণীকে নিয়ে যায় কলকাতায়, হাতেকলমে 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। জুডিথ গিয়ে ধরলেন এই এনজিও-র কর্তাদের। ইন্টারভিউ হল একটা, যাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া নিয়ে জুডিথের সামান্যতম সংশয়ও ছিল না। নির্বাচিতদের প্রশিক্ষণ পর্ব চলল আয়ারল্যান্ডেই, সপ্তাহদুয়েক ধরে। জনা কুড়ির গ্রুপ। সমবয়সি প্রায় সবাই। অধিকাংশের সঙ্গে অল্পদিনেই গলায়-গলায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল জুডিথের। চনমনে যুবক উইলিয়ামস আর ফিটনেস-ফ্যানাটিক মনিকার সঙ্গে তো প্রায় 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'-এর রসায়ন!

দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়ে গেল ভারত-যাত্রার। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যাওয়া, জুলাইয়ের মাঝামাঝি ফেরা। ওই সময়টা সচরাচর ভ্যাকেশন থাকে বেশিরভাগ কলেজে। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সুবিধে। ডাবলিন বিমানবন্দরে যখন চেক-ইন করছেন ভারতগামী উড়ানে পা রাখার জন্য, জুডিথ দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, এটাই ইন্ডিয়ায় প্রথম এবং শেষবারের মতো যাওয়া। আয়ারল্যান্ডের ফিরতি উড়ান ধরতে হবে মাসখানেকের মধ্যেই।

কলকাতায় এসে জুডিথরা ঠিক করলেন, 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-র কাছাকাছি হোটেলে থাকাই ভাল। সুবিধে হবে যাতায়াতের। জুডিথ উঠলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের 'হোটেল সার্কুলার'-এ। মনিকা, উইলিয়ামস আর বাকিরাও কাছেপিঠের হোটেল বা গেস্টহাউসে।

সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরেই দৌড়নো 'মাদার হাউসে'। সিস্টারদের কাছে ইন্ডোর ট্রেনিং নেওয়া, হাতে-কলমে কাজ শেখা দিনভর, ওয়ার্কশপ-ফিল্ড ট্রেনিং সেরে হোটেলে ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে। 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-র সঙ্গে অবৈতনিকভাবে যুক্ত একাধিক ডাক্তারের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেল দিব্যি।

কলকাতা শহরটাকে অল্পদিনেই ভাল লাগতে শুরু করল জুডিথের। ট্রেনিং শিডিউল অনুযায়ী শনিবার বিকেল থেকে ছুটি। ফের কাজ শুরু সোমবার থেকে। উইকেন্ডে বন্ধুদের সঙ্গে শহরটা অনেকটাই ঘুরে দেখেছে জুডিথ। ভিক্টোরিয়া, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, টেম্পল অফ গডেস কালী, নোবেল লরিয়েট পোয়েট টেগোরের বাড়ি...। ক্যালকাটার মানুষজনকে খুব হেল্পফুল লেগেছে জুডিথের। কোথায় কোন্‌দিক দিয়ে যেতে হবে, সেটা পথচলতি কাউকে জিজ্ঞেস করলে কারও কোনও বিরক্তি নেই। হাসিমুখে বলে দেয়। লাইফ আছে শহরটায়। ঘুরে-টুরে অবশ্য জুডিথের সবথেকে ভাল লেগেছে সন্ধে-রাতের পার্ক স্ট্রিট। আলো ঝলমল রাস্তাটা যেন ফুটছে সবসময়। আর দিনকয়েক পরেই তার জন্মদিন। দেশের বাইরে জন্মদিন

BanglaBook.org

কাটানো এই প্রথম। এই পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তোরাঁ বা পাবে একটা ছোটখাটো বার্থডে পার্টি করলে কেমন হয়?

৩১ মে, ২০১৩। বার্থডে পার্টি, জুডিথের একুশতম জন্মদিন। পার্ক হোটেলের নাইটক্লাব 'তন্ত্র' নাকি বেশ জমজমাট জায়গা উইকেন্ড পার্টির জন্য, শুনেছিলেন কলকাতায় সদ্যপরিচিতদের মুখে। যে হোটেলে আছেন, তার ম্যানেজারকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনিও কাছেপিঠের মধ্যে তন্ত্র-র কথাই বলেছিলেন। বেশ, ওখানেই হোক। রাত দশটা থেকে দুটো অবধি তন্ত্র-তে জায়গা বুক করেছিলেন জুডিথ। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা তো বেশি নয়,এই অজানা শহরে চেনেনই বা ক'জনকে? আয়ারল্যান্ড থেকে আসা গ্রুপের মধ্যে দশজন। আর 'মাদার হাউসে' আলাপ হওয়া ডাক্তার বন্ধু আফরোজ আলম। সব মিলিয়ে জনা বারো।

সকালে কেক কিনে এনেছিল মনিকা। মজা-হইহল্লা বিস্তর হয়েছে হোটেলের ঘরেই। স্কাইপে কথাও হয়েছে মা-বাবা-দাদার সঙ্গে। ফুরফুরে মেজাজে সেজেগুজে রাতের পার্টির জন্য উইলিয়ামসের সঙ্গে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরিয়েছিলেন জুডিথ। লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড়ে এসে যখন ট্যাক্সি খুঁজছেন, ট্র্যাফিক সিগন্যালের লালে থেমে আছে গাড়ি, পাশের একটা গাড়ি থেকে ছিটকে আসা আওয়াজে ফিরে তাকিয়েছিলেন জুডিথ।

'হাই উইলিয়ামস! হোয়াটস আপ?'

মিনিটখানেকের মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল, ওই গাড়ির চালকের নাম অভিষেক ওরফে অ্যাবি। উইলিয়ামসের সঙ্গে যার খুচরো আলাপ হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে, নিউ মার্কেটের একটা জুতোর দোকানে। এবং আদানপ্রদান হয়েছে ফোন নম্বরের। অ্যাবি স্বাভাবিক সৌজন্যে জানতে চেয়েছিল, কোথায় যাচ্ছে উইলিয়ামসরা।

'তন্ত্রা? বার্থডে ব্যাশ? হপ ইন গাইজ! আইল গিভ ইউ আ রাইড।'

উইলিয়ামসের পরিচিত, যাওয়ার পথে ড্রপ করে দিতে চাইছে পার্ক হোটেলে। গাড়ির পিছনের সিটে নির্দ্বিধায় উঠে পড়েছিলেন দু'জনে। সামনে স্টিয়ারিংয়ে ছিল অ্যাবি। পাশে আরেকজন। সপ্রতিভ, দেখে মনে হয়, মিড-থার্টিজ। পিছনে তাকিয়ে মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল. 'হাই, দিস ইজ সুজয়। সুজয় মিত্র।'

লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে কতটাই বা দূরে আর পার্ক হোটেল? খুচরো আলাপের মধ্যেই গাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল পার্ক স্ট্রিটে। স্বাভাবিক সৌজন্যবশত জুডিথ বলেছিলেন নামার সময়, 'হোয়াই ডোন্ট ইউ গাইজ জয়েন আস?' বিনা বাক্যব্যয়ে রাজি হয়ে গিয়েছিল সুজয় আর অ্যাবি। কে জানত তখন, ওই সৌজন্য-প্রস্তাবের জন্য আজীবন আফশোস করতে হবে?

'তন্ত্র' জায়গাটা সত্যিই জমজমাট। যাকে বলে হ্যাপেনিং। ইউরোপের যে-কোনও নাইটক্লাবের মতোই। পছন্দ হয়েছিল জুডিথের। ডিজে একের পর এক চার্টবাস্টার গান বাজাচ্ছে উদ্দাম। পা নড়তে বাধ্য তালে তালে। সুজয় ছেলেটাও মজার। ভাল লেগেছিল জুডিথের। এমন

BanglaBook.org

সুজয় মিত্র

সহজভাবে মিশে যাচ্ছিল সবার সঙ্গে। কে বলবে অপরিচিত, কে বলবে অন্য ইনভাইটিজদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সবেমাত্র? দুর্দান্ত সেন্স অফ হিউমার, জোকসের স্টক অফুরান। আর ইংরেজিটা বলে তুখোড়, নিখুঁত ইউরোপিয়ান অ্যাকসেন্টে। ইন্ডিয়ার বাইরে ছিল কখনও?

অ্যাবি বেশিক্ষণ ছিল না পার্টিতে। আধঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল। সুজয় থেকে গিয়েছিল। আর সুজয়ই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মাইকেলের সঙ্গে। যে হঠাৎই এসে যোগ দিয়েছিল ওদের গ্রুপটার সঙ্গে। যার হাবভাব দেখেই মনে হয়, নিয়মিত যাতায়াত আছে এখানে। পেটানো চেহারা, লম্বায় অন্তত ছ'ফুট প্লাস, কায়দার পনিটেল। 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস' বলার পরেই মাইকেল সিগারেট ধরাল একটা। ধরাল নয়, বানাল। সিগারেটের মধ্যে অন্য কিছু ঠুসে। যেটা সুজয়-মাইকেলের হাতে হাতে ঘুরতে থাকল মধ্যরাতের মাতোয়ারায়, তিন গ্লাস ওয়াইন খাওয়ার পরেও দিব্যি বুঝতে পারছিলেন জুডিথ, ওগুলো সিগারেট নয়। জয়েন্ট। ড্রাগ জায়গা বদল করে নিয়েছে তামাকের সঙ্গে। সে ওরা যা করছে করুক, ভেবেছিলেন জুডিথ। মাথাটা হালকা লাগছে, বেশি ভেবে লাভ নেই। তাই সুজয় যখন এসে বলেছিল, 'হেই.. হোয়াট অ্যাবাউট আ ডান্স?', বিনা দ্বিধায় ডান্স ফ্লোরে পা রেখেছিলেন জুডিথ। ডিজে-র ডিস্কে তখন বাজছিল, 'দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়াং...'। খুব পছন্দের গান জুডিথের। নাচছিলেন প্রাণ খুলে। জানতেন না, রাত আজ সত্যিই বাকি। এবং অনেকটাই।

অন্যান্য নাইটক্লাবে যা নিয়ম থাকে সচরাচর, এখানেও তাই। বন্ধ হওয়ার আধঘণ্টা আগে 'লাস্ট ড্রিঙ্ক'-এর অর্ডার নেওয়া হয়। নেশার মাত্রা বেশি হয়ে যায় কারও কারও। ক্লাব বন্ধ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বার কাউন্টারে গিয়ে হইহুল্লা এসব জায়গায় নিত্যনৈমিত্তিক। ঝামেলা সামলানোর জন্য মুশকো চেহারার 'বাউন্সার'-ও থাকে একাধিক। বাড়াবাড়ি হলেই অর্ধচন্দ্র দেওয়ার জন্য তৈরি।

ঝামেলায় অবশ্য জড়াল না জুডিথদের গ্রুপের কেউই। সুজয় আর মাইকেল শুধু ম্যানেজারকে অনুরোধ করল আর একটা ড্রিঙ্কের জন্য। ম্যানেজার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন, 'নো।' জুডিথের

BanglaBook.org

আরও একটু থাকতে ইচ্ছে করছিল। দারুণ কেটেছে সময়টা। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে গেল। এই তো কিছুক্ষণ আগে ঢোকা হল, এর মধ্যে দুটো বেজে গেল! নামে নাইটক্লাব, তা হলে সারারাত কেন খোলা রাখে না এরা? রাত দুটোয় রাত শেষ হয়ে যায় বুঝি?

ক্লাব থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটে যখন পা রাখলেন জুডিথরা, ঘড়ির কাঁটা সদ্য দুটো ছুঁয়েছে। সকলেরই নেশা হয়েছে কমবেশি। পা টলমল অল্পবিস্তর। যে যার বাড়ি বা হোটেলে ফেরার ট্যাক্সি খুঁজছে যখন, মাইকেলই প্রস্তাবটা দিল, 'মাই প্লেস ইজ ক্লোজবাই। হোয়াই ডোন্ট ইউ গাইজ ড্রপ ইন ফর সাম মোর ফান? হেই বার্থডে গার্ল, হোয়াট সে?' সোৎসাহে সায় দিল সুজয়ও, ইয়েস ইয়েস.. হোয়াই নট?' জুডিথ বন্ধুদের দিকে তাকালেন। উইলিয়ামস বলল, 'ইয়োর কল, উই আর টু টায়ার্ড ফর দিস।' জুডিথ তখন দোটানায়। অত্যন্ত ভদ্রভাবে বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ পার্টি করার প্রস্তাব দিচ্ছে মাইকেল। গত কয়েক ঘণ্টায় সুজয় বা মাইকেল, কেউই কোনওভাবে শালীনতার গণ্ডি পেরোয়নি কোনও অছিলায়। আর জন্মদিনের রাত তো বছরে একবারই আসে। দ্বিধাগ্রস্ত জুডিথ একটু ভেবে বলে ফেললেন, 'ওকে ফাইন।' বোঝেননি, ওই মুহূর্তের দ্বিধা এবং সম্মতি কী ঘোর সর্বনাশ ডেকে আনতে যাচ্ছে। বোঝেননি, নেশাকাতর অবস্থায় সব প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলতে নেই। সে যতই থাকুক সাময়িক ভাল-লাগা।

বাকিরা বেরিয়ে গেল যে যার মতো। মাইকেলের ফ্ল্যাট কাছেই। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পাশের রাস্তায়। হেঁটেই সুজয়-মাইকেলের সঙ্গে ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন জুডিথ। রাত তখন কত হবে? প্রায় আড়াইটে। ছোট্ট দু'-কামরার অগোছালো ফ্ল্যাট। ঢুকেই মাইকেল বসার ঘরের একটা ক্যাবিনেট থেকে বার করল ওয়াইনের বোতল, 'লেটস হ্যাভ আ ফিউ মোর।' প্রথম গ্লাসটা অর্ধেক শেষ করতে না করতেই ওয়াশরুমে ছুটতে হল জুডিথকে। খাদ্য-পানীয় যা যা উদরস্থ হয়েছিল সন্ধে থেকে, সব বেরিয়ে গেল। পরের একঘণ্টা আচ্ছন্নের মতো সোফায় বসেছিলেন জুডিথ। মনে আছে, মাইকেল জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল, 'ইউ ওকে?' মনে আছে, সুজয়-মাইকেল 'জয়েন্ট' ধরাচ্ছিল একের পর এক। ধোঁয়ার চোটে দমবন্ধ লাগতে শুরু করেছিল জুডিথের। সাড়ে তিনটে নাগাদ একরকম জোর করেই উঠে পড়েছিলেন, 'আই নিড টু গো নাউ।' উঠে পড়েছিল সুজয়ও, 'শিয়োর, আইল ড্রপ ইউ হোম।' সুজয়ের সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওঠার পর পিছনের সিটে নিজেকে এলিয়ে দেওয়া মাত্র চোখ আপনিই বুজে এসেছিল জুডিথের।

চোখ খুলেছিল ট্যাক্সির ব্রেক কষার শব্দে। বিল মেটাতে মেটাতে সুজয় বলছিল, 'লেটস গো জুডিথ, উই আর হোম।' মানে? 'হোম' মানে? হোটেলে ফেরার কথা তো এটা কোথায়? একটা বড় রাস্তা। তার উপর তিনতলা একটা বাড়ি। যেটা দেখিয়ে সুজয় বলছে, 'দিস ইজ মাই প্লেস। ইউ লুক টায়ার্ড। ফ্রেশেন আপ আ বিট... আই উইল ড্রপ ইউ ব্যাক টু দ্য হোটেল।'

এটা কী হল? ওই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বিপদসংকেত টের পাচ্ছিলেন জুডিথ। কিন্তু সে সংকেতে সাড়া দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছিল না শরীর। অত রাতের ওই শুনশান অজানা-অচেনা রাস্তায় কী

BanglaBook.org

করবেন? চিৎকার করার মতো শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই শরীরে। নেশার দাপটে যেন অসাড় হয়ে গেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব। সুজয় হাত ধরে জুডিথকে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িটার তিনতলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ঠোক্কর খেয়েছিলেন বারকয়েক। সুজয় কোমরে হাত দিয়ে সামলে নিয়েছিল।

ছিমছাম পরিপাটি একটা ঘর। ঢুকেই বেশ জোরে মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে দিয়েছিল সুজয়। আর খুব কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'উড ইউ কেয়ার ফর অ্যানাদার ড্রিঙ্ক?' জুডিথ মাথা নেড়েছিলেন। এলিয়ে পড়েছিলেন বিছানায়। সুজয় যখন উঠে এসেছিল বিছানায়, হাত রেখেছিল গালে, ওই আধোজাগা অবস্থাতেও সহজাত নারী-ইন্দ্রিয় জানান দিয়েছিল, এ স্পর্শ নিছক বন্ধুত্বের নয়। সুজয় যখন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল গায়ের জোরে, আপ্রাণ প্রতিরোধে জুডিথ শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'নো... প্লিজ নো...'। বাকিটা ব্ল্যাকআউট।

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটেছিল সকালে। শরীরী প্রতিক্রিয়া এবং বিস্রস্ত পোশাক জানান দিয়েছিল জুডিথকে, নেশাতুর অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলপূর্বক সহবাস করেছে সুজয়, একাধিকবার। সোজা ভাষায়, 'রেপ'। চূড়ান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় কোনওভাবে নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পথ আটকেছিল সুজয়। যার হাতে তখনও, ওই ভোর সাতটায় মদের গ্লাস, ঠোঁটে সিগারেট। চোখেমুখে অনুতাপের চিহ্নমাত্র নেই। স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, 'হোয়াটস রং? আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু গেট ইউ গোয়িং।'

বাকিটা পড়ুন জুডিথের বয়ানে, যে বয়ান দিয়েছিলেন তদন্তকারী অফিসারদের।

'আমার যতটা না রাগ হচ্ছিল, তার থেকে বেশি ভয় হচ্ছিল। তিনতলার ওই ফ্ল্যাটটায় একটা বারান্দা ছিল। একবার এ-ও ভেবেছিলাম, ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিই নীচে। মাথা কাজ করছিল না। শুধু ভাবছিলাম, কেন রাজি হলাম মাইকেলের ফ্ল্যাটে যেতে গত রাতে? হোয়াই ডিড আই এগ্রি? কেন এভাবে ড্রাঙ্ক হয়ে গেলাম? কেন রাজি হলাম ওদের কথায়?

সুজয়কে ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করলাম সর্বশক্তিতে,'জাস্ট গেট লস্ট!' একটু থতমত খেয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল সুজয়। আর আমি দরজা খুলে দৌড়লাম নীচে। বড় একটা রাস্তা, পাশেই মেট্রো স্টেশন। নামটা পড়লাম। কালীঘাট। কালীঘাট? এই স্টেশনেই তো এসেছিলাম পার্ক স্ট্রিট মেট্রো থেকে, গডেস কালীর টেম্পল দেখতে!

সকাল হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে ছ'টা বাজে প্রায়। গাড়িঘোড়ার চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকজনও বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। কৌতূহল নিয়ে দেখছে আমাকে। অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। একটা ট্যাক্সি থামালাম। উঠে ঠিকানা বললাম হোটেলের। গাড়ি যখন চলছে, ফোন করলাম মনিকাকে। তুলল না। উইলিয়ামসকে করলাম, আফরোজকে করলাম। নো রেসপন্স। লেট নাইটের পরে ন্যাচারালি ঘুমচ্ছে নিশ্চয়ই সবাই। তিনজনকেই এসএমএস করলাম, 'প্লিজ রেসপন্ড, আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার।'

BanglaBook.org

সেই এসএমএস প্রথম দেখলেন মনিকা। ধড়মড়িয়ে উঠে ফোন করলেন জুডিথকে। ঘটনা জানার পর মনিকা-আফরোজ-উইলিয়ামস যখন পৌঁছলেন 'হোটেল সার্কুলার'-এ, সকাল তখন প্রায় সাড়ে দশটা। নিজের ঘরে বসে কেঁদে চলেছেন জুডিথ। যাঁকে কিছুটা ধাতস্থ করতেই লাগল ঘণ্টাদেড়েক। জুডিথকে নিয়ে বন্ধুরা পার্ক স্ট্রিট থানায় পৌঁছলেন সোয়া বারোটা নাগাদ। ওসি শুনলেন সব, ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে সময় নিলেন না একটুও। জুডিথদের নিয়ে নিজেই গেলেন কালীঘাট থানায়। জমা পড়ল সুজয় মিত্রের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ।

সুজয়ের বাড়ির যেটুকু বর্ণনা জুডিথ দিতে পারলেন, পুলিশের পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল বাড়িটা দ্রুত চিহ্নিত করতে। কালীঘাট মেট্রো স্টেশন, বড় রাস্তা, তিনতলা বাড়ি। ১৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের বাড়িটাকে শনাক্ত করলেন জুডিথ। হ্যাঁ, এটাই। তিনতলার ঘরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শুয়ে থাকা সুজয়ের নাগাল পাওয়া গেল সহজেই। ফরেনসিক পরীক্ষার প্রয়োজন পড়বে এই ঘরে। দরকার হবে খুঁটিয়ে তল্লাশির। ঘরটা 'সিল' করে দিয়ে দুপুর দুটো নাগাদ যখন সুজয়কে নামিয়ে এনে ভ্যানে তুলছে কালীঘাট থানার পুলিশ, তখন ভিড় জমে গেছে বাড়ির সামনে। খবর ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত। জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) সহ পদস্থ অফিসাররা রওনা দিয়েছেন কালীঘাট থানার উদ্দেশে।

টিভি-র পরদায় 'ব্রেকিং নিউজ' চলতে শুরু করল ঘণ্টাখানেক পর থেকেই। একের পর এক ওবি ভ্যান এসে ভিড় জমাল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের সেই বাড়ির সামনে, 'এই সেই বাড়ি, যেখানে গতরাতে ধর্ষিতা হয়েছেন এক আইরিশ যুবতী। গ্রেফতার হয়েছেন অভিযুক্ত। নাম সুজয় মিত্র।'

অল্প কথায় এবার সুজয়ের পরিবার-পরিচয়। দক্ষিণ কলকাতার বনেদি বিত্তশালী পরিবার সুজয়দের। ইলেকট্রনিক গুডসের পুরনো এবং রমরমা পারিবারিক ব্যবসা। সুজয়ের বাবাই দেখাশোনা করেন ব্যবসার। দুই ছেলে। সুজয় বড়, বয়স ছত্রিশ। ছোটভাইও তিরিশের কোঠায়। কনভেন্ট-শিক্ষিত সুজয় গ্র্যাজুয়েশনের পর এমবিএ করেছিলেন। আমেরিকাতে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। সেখানেই এক মার্কিন সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে। সস্ত্রীক দেশে ফিরেছিলেন, কিন্তু বিয়েটা টেকেনি বেশিদিন। স্ত্রী ফিরে গিয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে। সরকারি ভাবে বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি, কিন্তু দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ বা সম্পর্ক, কোনওটাই বেঁচে নেই আর। কাজ বলতে কালেভদ্রে নাম-কা-ওয়াস্তে বাবাকে ব্যবসায় সাহায্য করা। আসল 'কাজ' অবশ্য পার্টি-মদ-মহিলা-ড্রাগে বুঁদ হয়ে থাকা।

তিনতলা বাড়ির একতলাটা ব্যবহৃত হয় ব্যবসার কাজে। দু'তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে। মিত্র পরিবারের সদস্যরা থাকেন তিনতলায়। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যথেষ্ট প্রশস্ত, অন্তত দুই হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা। চারটে ঘরের একটায় সুজয়ের মা-বাবা থাকেন। একটা মোটামুটি খালিই পড়ে থাকে। বাড়িতে গেস্ট এলে ব্যবহার হয়। বাকি দুটো ঘরে দুই ভাই। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকে

BanglaBook.org

সঙ্গে কাছেই। সুজয় যখন সেই রাতে ফ্ল্যাটে ফিরে নিজের ঘরে জুডিথকে নিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বাড়ির অন্যরা তখন গভীর ঘুমে। সকাল সোয়া ছ'টা নাগাদ যখন জুডিথ ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙেছিল সুজয়ের মা-বাবা-ভাইয়ের। পুলিশ যখন দুপুরবেলা তালাবন্ধ করে দিচ্ছে বড়ছেলের ঘর, নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মা-বাবা। ওসি-কে শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন সুজয়ের মা, 'কী করেছে ও?'

জুডিথের কাছে ঘটনার বিবরণ শোনার পরেই থানার একটা টিম বেরিয়ে গিয়েছিল মাইকেলের খোঁজে। সদর স্ট্রিটে স্থানীয় 'পেয়িং-গেস্ট অ্যাকোমোডেশন'গুলোয় মাইকেলের চেহারার বিবরণ দিয়ে একটু খোঁজখবর করতেই হদিশ মিলেছিল মাইকেলের দু'কামরার ঘিঞ্জি ফ্ল্যাটের। ভাড়ার ফ্ল্যাট। তালাবন্ধ। তালা ভেঙে কয়েকটা খালি ওয়াইনের বোতল আর সামান্য পোশাক-আশাক ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি।

জানা গিয়েছিল, মাইকেল আদতে ড্রাগ-পেডলার। রাতবিরেতের হাই-প্রোফাইল পার্টিতে বা ক্লাবে চড়া দামে ড্রাগ সরবরাহ করাটাই পেশা। মাইকেলের নাগাল পাওয়া যে কঠিন হবে এবার, বুঝেছিলেন অফিসাররা। ফ্ল্যাটে 'রেইড' হয়েছে, খবর ঠিকই পেয়ে যাবে। এবং এমুখো আর হবেই না। মাইকেলকে ধরা অবশ্য পুলিশের অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল না। জুডিথ কোনও অভিযোগ করেননি মাইকেলের বিরুদ্ধে। এই মামলায় মাইকেলকে গ্রেফতার করার কোনও কারণ ছিল না। ওকে প্রয়োজন হতে পারে সাক্ষী হিসেবে। সে পরে দেখা যাবে। অনেক বেশি জরুরি কাজ এখন পড়ে আছে হাতে।

প্রথম কাজ সুজয়ের ঘরের তল্লাশি। বাজেয়াপ্ত হল বেশ কিছু গর্ভনিরোধকের প্যাকেট, মদের বোতলও একাধিক, বিছানার চাদর। কাজ নম্বর দুই, অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী, দু'জনেরই ডাক্তারি পরীক্ষা, পরিভাষায় 'মেডিক্যো-লিগাল একজামিনেশন'। ঘটনার সময় দু'জনে যা পোশাক পরেছিলেন, তা বাজেয়াপ্ত করা হল। পাঠানো হল ফরেনসিক পরীক্ষায়।

সুজয় আগাগোড়াই অভিযোগ অস্বীকার করলেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে। বলে গেলেন, 'ইট ওয়াজ় কনসেনসুয়াল।' যা হয়েছে, উভয়ের সম্মতিতেই হয়েছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় উড়ে গেল আত্মপক্ষ সমর্থনে সুজয়ের এই দাবি। রিপোর্ট জানাল, জুডিথের শরীরে 'ডিফেন্সিভ উন্ডস' (আত্মরক্ষাজনিত আঘাত) রয়েছে। রয়েছে বলপূর্বক সহবাসের অকাট্য প্রমাণ। 'কনসেনসুয়াল' নয়, 'রেপ'-ই। পোশাক-আশাকের ফরেনসিক পরীক্ষায়ও খারিজ হয়ে গেল সুজয়ের 'সম্মতিমূলক শরীরী মিলন'-এর তত্ত্ব।

এই কেসের তদন্তের দায়িত্ব যে গোয়েন্দাবিভাগের উপর পড়বে, জানাই ছিল। ৬ জুন মামলার তদন্তভার নিল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। গোয়েন্দাপ্রধান গঠন করলেন বিশেষ টিম। সাব-ইনস্পেকটর তৃষ্ণা বসু (বর্তমানে ইনস্পেকটর) নিযুক্ত হলেন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে।

BanglaBook.org

তাঁকে সাহায্য করার জন্য রইলেন ইনস্পেকটর গৌরী মুখোপাধ্যায় (পদোন্নতি হয়ে বর্তমানে গোয়েন্দাবিভাগেই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার) এবং ইনস্পেকটর পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য।

জুডিথ নিজেই ফের বয়ান দিতে চাইলেন তদন্তকারীদের কাছে। জানালেন, এফআইআর-এ যা লিখেছিলেন, সেটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। তখনকার মানসিক অবস্থায় খুব বিস্তারিত লিখতে পারেননি। ক্লাইভ স্ট্রিটে আইরিশ দূতাবাসের অফিসে নেওয়া হল জুডিথের বিস্তারিত বয়ান, যাতে সেদিন সন্ধে থেকে কী কী, কীভাবে, কখন ঘটেছিল, তা আরও বিস্তারে জানালেন জুডিথ। এই বিবৃতি রেকর্ড করা হল জুডিথের মা এবং দাদার উপস্থিতিতে। যাঁরা ঘটনার কথা জানার পরের দিনই ডাবলিন থেকে ফ্লাইট ধরেছিলেন ভারতের। দিল্লির আইরিশ দূতাবাসের মূল অফিস থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি ক্যাটি মরিসরো। তিনিও থাকলেন বয়ান নথিভুক্ত করার সময়। আদালতেও গোপন জবানবন্দি দিলেন জুডিথ, ফৌজদারি বিধির ১৬৪ ধারায়। এবং মা-দাদার সঙ্গে দেশের ফ্লাইট ধরলেন ১৩ জুন। বিচারের সময় আরেকবার আসতে হবে, যাওয়ার আগে জুডিথকে বললেন তৃষ্ণা। জুডিথ বললেন, 'শিয়োর।'

আয়ারল্যান্ড দূতাবাস থেকে মামলার অগ্রগতি জানতে চেয়ে সপ্তাহে একটা করে চিঠি আসতে শুরু করল। স্বাভাবিক। নিজের দেশের কোনও নাগরিক 'টুরিস্ট ভিসা' বা 'স্টুডেন্ট ভিসা' নিয়ে বিদেশ গিয়ে যৌননিগ্রহের শিকার হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটা অস্বস্তি তো মাথাচাড়া দেবেই। তদন্তকারীদের উপর চাপ বাড়তে শুরু করল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চার্জশিট দেওয়ার।

সেই চাপ সামলানো দুরূহ হল না তেমন। ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণ প্রমাণিত। দু'জনের সে-রাতের পোশাক-আশাকের ফরেনসিক পরীক্ষাতেও সমর্থন মিলেছে ডাক্তারের রিপোর্টের। পার্ক হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজেও 'তন্ত্র'-য় সেদিনের পার্টিতে সুজয়ের উপস্থিতির প্রমাণ রয়েছে। পার্টির পর সুজয়-মাইকেলের সঙ্গে জুডিথের হেঁটে বেরিয়ে যাওয়ার একাধিক সাক্ষী রয়েছে। রয়েছে সুজয়-জুডিথের ফোনের টাওয়ার লোকেশন, যা খাপে খাপে মিলিয়ে দিচ্ছে সদর স্ট্রিটে মাইকেলের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়া থেকে ভোর সোয়া ছ'টা পর্যন্ত দু'জনের একত্রে অবস্থান। আছে আদালতে দেওয়া জুডিথের জবানবন্দি। পয়লা জুনের সকালে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো পোশাকে ট্যাক্সি খুঁজছেন এক বিদেশিনী যুবতী, এই দৃশ্যেরও স্থানীয় সাক্ষী রয়েছে একাধিক।

কী বাকি থাকে আর? সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্রিত করে তৃষ্ণা চার্জশিট পেশ করলেন ১১ জুলাই। ঘটনার ঠিক একচল্লিশ দিনের মাথায়। এবার নতুন টার্গেট, বিচারপর্ব দ্রুত শেষ করতে আদাজল খেয়ে লেগে থাকা। এই মামলায় শাস্তি হওয়াটাই যথেষ্ট নয় শুধু, হতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

কিন্তু টার্গেট স্থির করা এক, আর সেটা পূরণ করা আরেক। গোয়েন্দাবিভাগ প্রথম হোঁচটটা খেল খোদ জুডিথেরই কাছ থেকে। ভারত ছাড়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিচারপর্বে

BanglaBook.org

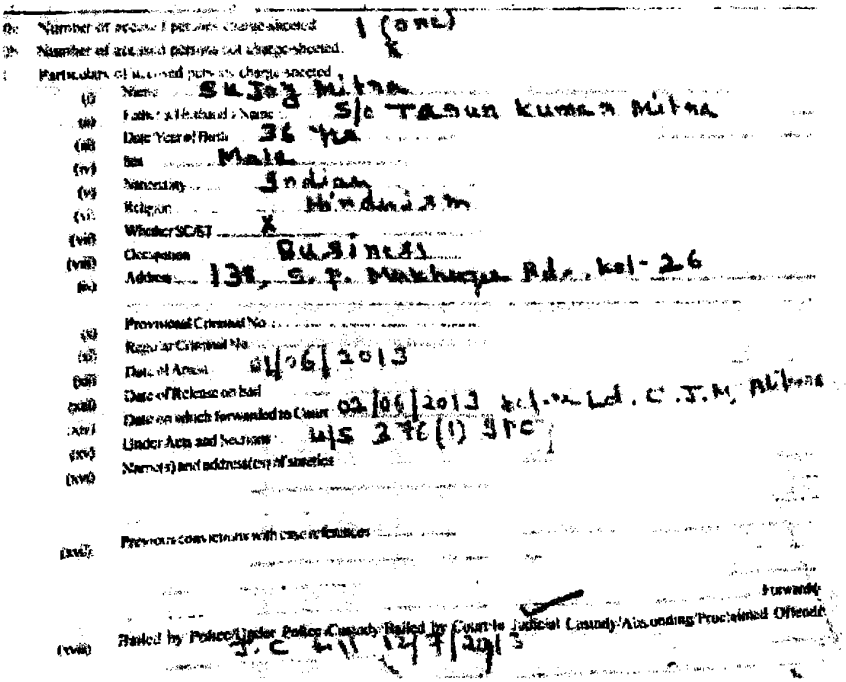

Number of accused persons charge-sheeted 1 (one)
Number of accused persons not charge-sheeted X
Particulars of accused persons charge-sheeted
(i) Name Sujoy Mitra
(ii) Father's/Husband's Name S/o Tarun Kumar Mitra
(iii) Date/Year of Birth 36 yrs
(iv) Sex Male
(v) Nationality Indian
(vi) Religion Hinduism
(vii) Whether SC/ST X
(viii) Occupation Business
(ix) Address 131, S. P. Mukherjee Rd., Kol-26
(x) Provisional Criminal No.
(xi) Regular Criminal No.
(xii) Date of Arrest 01/06/2013
(xiii) Date of Release on bail
(xiv) Date on which forwarded to Court 02/06/2013 before Ld. C.J.M. Alipore
(xv) Under Acts and Sections U/S 376(1) IPC
(xvi) Name(s) and address(es) of sureties
(xvii) Previous convictions with case references
Forwarded/
(xviii) Bailed by Police/Under Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender

চার্জশিটের প্রতিলিপির অংশ

কিছুদিনের জন্য ফিরে আসার। কেস এবার 'ট্রায়াল স্টেজ'-এ, জুডিথকে মেল করে জানানো হল। প্রত্যুত্তরে জুডিথ জানালেন, বিচারপর্বে আসতে পারবেন না ভারতে। আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম। তৃষ্ণা ফের অনুরোধ করলেন জবাবি মেলে, অন্তত দিন পনেরোর জন্য এলেই যথেষ্ট। বিদেশে বেশিদিন থাকা যে অসুবিধের, সেটা বিচারক নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন, তাড়াতাড়িই মিটে যাবে সাক্ষ্যদান-পর্ব। কিন্তু জুডিথ অনড়। আর ইন্ডিয়ায় আসবেন না কিছুতেই। আয়ারল্যান্ডে ফোন করেও বিস্তর বোঝানোর চেষ্টা করলেন গৌরী-তৃষ্ণা। কিন্তু জুডিথের এক কথা, সশরীরে ওই সুজয় মিত্রের মুখোমুখি হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওই রাতের ঘটনা নিয়ে আদালতে প্রকাশ্য কাটাছেঁড়া সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি আর অবশিষ্ট নেই তাঁর।

এবার? ধর্ষণের মামলায় অভিযোগকারিণীর সাক্ষ্যদান এবং অভিযুক্তকে চিহ্নিতকরণ একেবারে ন্যূনতম পূর্বশর্ত। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে এ মামলার নিষ্পত্তি অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। দীর্ঘ বৈঠকে বসলেন জয়েন্ট কমিশনার(ক্রাইম)। যে বৈঠকে জুডিথের অসহযোগিতা নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না তদন্তকারী টিমের অফিসাররা।

রীতিমতো হতাশই শোনাচ্ছিল তৃষ্ণাকে, 'এভাবে হয় স্যার, বলুন? বারবার বললাম, জাস্ট

BanglaBook.org

দু'সপ্তাহের জন্য আসুন। কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। ভিক্টিমের এগজামিনেশন না হলে তো মামলা বেশ বাঁও জলে চলে যাবে।'

গৌরীও যোগ দিলেন আলোচনায়, 'একজ্যাক্টলি। একদিকে ওদের এমব্যাসি থেকে চিঠি এসেই চলেছে কেসের প্রোগ্রেস জানতে চেয়ে, অথচ ভিক্টিম কোর্টে সাক্ষী দিতে আসবে না! এটা কিন্তু আনফেয়ার স্যার। জাস্টিস দেওয়ার জন্য আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছি আমরা, এভিডেন্স যা আছে, কনভিকশন হবেই। কিন্তু জাস্টিস পেতে গেলে ভিক্টিমকেও তো মিনিমাম কো-অপারেশন করতে হবে!'

পৃথ্বীরাজও ক্ষোভ গোপন করলেন না, 'সেটাই। মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপে জানা নেই-শোনা নেই, এমন দু'জন লোককে বিশ্বাস করে কেউ ওভাবে অত রাতে বেরিয়ে যায়? কই, আর কেউ তো যায়নি। বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে ফিরে গেলে ঘটনাটাই ঘটত না। আর ঘটে যখন গেছেই, কালপ্রিটের শাস্তি নিশ্চিত করতে আর একবার আসা যায় না ট্রায়ালের সময়? আমরা কার জন্য এত কিছু করছি? জুডিথের জন্যই তো! কিছু মনে করবেন না স্যার, সেই রাতে জুডিথ নির্বোধের মতো কাজ করেছিলেন। আর এখন অন্যায় জেদ করছেন।'

গোয়েন্দাপ্রধান চুপচাপ শুনছিলেন এতক্ষণ। বুঝছিলেন,অফিসারদের যুক্তি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। ক্ষোভও নয় পুরোপুরি অসংগত। সব শোনার পর মুখ খুললেন।

'একটা ব্যাপার বোঝো। জোর করে তো আমরা জুডিথকে ভারতে আসতে বাধ্য করতে পারব না। "আসবে না" ধরে নিয়েই অন্য রাস্তা ভাবতে হবে। আর শোনো, সেদিন রাতে জুডিথের আচরণ নিয়ে জাজমেন্টাল না হওয়াই ভাল। বোকামি তো নিশ্চয়ই করেছিল মেয়েটি। আর তার চরম মূল্যও চোকাতে হয়েছে। আসলে কী জানো, এই কুড়ি-একুশ বয়সটা অদ্ভুত। বিপদকে অ্যান্টিসিপেট করতে পারলেও সাধারণত বিশ্বাস করতেই বেশি উৎসুক থাকে ওই বয়সিরা। কাকে কখন বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা উচিত, সেই বোধটা খুব পরিষ্কারভাবে ঠিক তৈরি হয় না। বিশ্বাস করার মাশুল এভাবে দিতে হবে জানলে কি আর যেত?'

'মানলাম স্যার', তৃষ্ণা বলে ওঠেন, 'কিন্তু বিদেশবিভুঁইয়ে আরও অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকা উচিত ছিল। সমাজসেবা করতে এসে...'

গোয়েন্দাপ্রধান থামিয়ে দেন তৃষ্ণাকে, 'সে তো একশোবার। কেয়ারফুল ছিল না বলেই তো এত কিছু। কিন্তু ওই যে বললাম, বয়সটাই ঝুঁকি নেওয়ার। আর ভুলে যেয়ো না, শি ওয়াজ ড্রাঙ্ক। আর একটা কথা, সমাজসেবা করতে এসেছিল একটা প্যাশন থেকে। তার সঙ্গে তো বন্ধুদের নিয়ে হইহুল্লোড় করার কোনও বিরোধ নেই। মাদার টেরিজার সংস্থায় কাজ করতে এসেছিল বলে ওকেই মাদার টেরিজা বলে ভেবে নেওয়াটাও বোধহয় আনফেয়ার।'

পৃথ্বীরাজ না বলে পারেন না, 'তবু স্যার...।'

'শোনো পৃথ্বীরাজ, আরও একটা বেসিক জিনিস ভুলে যাচ্ছ তোমরা। দুটো সোসাইটির তফাত।

BanglaBook.org

ইউরোপ বা আমেরিকায় নারী-পুরুষে ফ্রি-মিক্সিংয়ে কোনও ছুঁতমার্গ নেই। যেটা আমাদের এখানে আছে। আমাদের দেশে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনও মেয়ে অপরিচিত দু'জন পুরুষের সঙ্গে হুট করে মধ্যরাতের পার্টিতে চলে যাওয়ার আগে হাজারবার ভাববে। ইউরোপ-আমেরিকায় মোটেই ভাববে না অতটা। কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ, সে তর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু দুটো সমাজ আলাদা। তাদের ভ্যালুসিস্টেম আলাদা। মাইন্ডসেট আলাদা। এটা তো ভুললে চলবে না। তা ছাড়া জুডিথ তো তোমাদের বলেওছে, কনসেনসুয়াল সেক্স হলে কোনও অসুবিধা ছিল না ওর। ওকে সুজয় ফোর্স করেছিল বলেই কমপ্লেনটা করেছে।'

'সে তো বুঝলাম স্যার, কিন্তু এখন কেসটার কী গতি হবে?' তৃষ্ণার চোখেমুখে উদ্বেগ ধরা পড়ছিল।

'ভেবে দেখলাম, একটাই রাস্তা পড়ে আছে।' গোয়েন্দাপ্রধান বললেন শান্তভাবে।

'কী স্যার?'

'ভিসি। ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং।'

'ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং?' পৃথ্বীরাজের গলায় ঠিকরে বেরয় সংশয়, 'রেপ কেসে ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং স্যার? ছোটখাটো কেসে ভিসি-র মাধ্যমে ট্রায়াল এর আগে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু রেপ কেসে বোধহয় এদেশে ভিসি-ট্রায়াল হয়নি স্যার। আমাদের রাজ্যে তো হয়ইনি। ডিফেন্স প্রচুর ঝামেলা করবে।'

'জানি। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় আছে কি কোনও? চেষ্টা তো একটা করতেই হবে। সব কিছুরই একটা প্রথমবার থাকে। এই কেসে কনভিকশন না করাতে পারলে শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, গোটা রাজ্যের মুখ পুড়বে। দেশেরও। তোমরা কালই জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলো। শেষ না দেখে ছাড়ার প্রশ্নই নেই।'

ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং-এর মধ্যস্থতায় অভিযোগকারিণীর সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া, তা-ও ধর্ষণের মামলায়, দেশে এই প্রথম। না অভিজ্ঞতা ছিল স্থানীয় আদালতের, না পুলিশের।

প্রথম কাজ আইরিশ দূতাবাসে মেল করে প্রস্তাবটা দেওয়ার। জেনে নেওয়া, এই পদ্ধতিতে জুডিথ আদৌ রাজি আছেন কিনা। মেলের উত্তর দিতে বেশ কিছুটা সময় নিলেন জুডিথ। অবশেষে আইরিশ দূতাবাস মারফত জানালেন, রাজি। তাঁর সমস্যা ভারতে আবার আসা নিয়ে। আসতে না হলে যে কোনও প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। কোনও আপত্তি নেই।

জুডিথের সম্মতি পাওয়ামাত্র জানানো হল আলিপুর কোর্টে। অনুমতি চাওয়া হল ভিসি-র মাধ্যমে জুডিথের সাক্ষ্যদানের । আদালত সম্মত হল, সরকার পক্ষের আইনজীবীকে নির্দেশ

BanglaBook.org

দিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থেকে চিঠি গেল রাজ্য সরকারের আইনমন্ত্রকে। অনুরোধ, সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দফতর যেন সাহায্য করে আদালতে ভিসি-র প্রক্রিয়ার সুবন্দোবস্তে। তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের পরামর্শ অনুযায়ী তৃষ্ণা-গৌরী ছুটলেন ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এনআইসি)-এ। ঠিক কী কী দরকার হবে আদালতে , পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা দিল এনআইসি।

লালবাজারের কম্পিউটার সেল, টেলিফোন বিভাগ, ওয়ারলেস দফতরের যৌথ সমন্বয়ে দ্রুতই তৈরি হয়ে গেল পরিকাঠামো। কম্পিউটার, প্রোজেক্টর-স্ক্রিন, স্পিকার-মাউথপিস, ফোর জি ডঙ্গেল... যা যা দরকার। খুব বেশি তো কিছু লাগে না একটা ভিসি-র আয়োজনে ।

জুডিথকে একটা 'স্কাইপ' অ্যাকাউন্ট খুলতে বলা হল। লালবাজারের 'উইমেন্স গ্রিভান্স সেল'-ও অ্যাকাউন্ট খুলল স্কাইপে। আদালতের নির্দেশে সাক্ষ্যগ্রহণের দিনগুলিতে জুডিথকে আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাসে উপস্থিত থাকতে বলা হল। সময়টা নির্ধারিত হল দু'দেশের 'টাইম ডিফারেন্স' মাথায় রেখে। আমাদের যখন সকাল দশটা, আয়ারল্যান্ডে তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা । ভারত সাড়ে চার ঘণ্টা এগিয়ে। জুডিথকে অনুরোধ করা হল আইরিশ সময় সকাল দশটায় দূতাবাসে আসতে। যাতে দুপুর আড়াইটে থেকে টানা সাক্ষ্য নেওয়া যায় কোর্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত ।

গোয়েন্দাবিভাগ এবং এনআইসি-র টেকনিক্যাল টিম সব ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর বিচারক নিজে খুঁটিয়ে দেখলেন সবটা। এবং নির্দিষ্ট দিনে ভিডিয়ো-কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হল আলিপুর টু আয়ারল্যান্ড। শুরু হল জুডিথ ফ্লোরেন্সের সাক্ষ্যগ্রহণ। জুডিথের সঙ্গে উপস্থিত থাকলেন আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি বেঞ্জামিন বেসরা। বিচারকের কাছে সরকারি আইনজীবী বিচারপর্বের শুরুতেই আবেদন করেছিলেন, মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী যেন জুডিথের সাক্ষ্যদান পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়। সম্মত হয়েছিলেন বিচারক।

তিন দফায়, দিন পনেরোর মধ্যেই প্রায় শেষ হয়ে এল জুডিথের 'একজামিনেশন-ইন-চিফ', (সাক্ষীকে বাদীপক্ষের উকিলের জেরা, যার উদ্দেশ্য হল প্রশ্নমালা সাজিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের সারবত্তা প্রমাণ করা)। এরপর পালা 'ক্রস-একজামিনেশন'-এর, যখন বিবাদী পক্ষের উকিলের প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে জুডিথকে। যতই চেষ্টা করুন অভিযুক্তের আইনজীবীরা, তথ্যপ্রমাণের জাল কাটিয়ে সুজয়ের বেরনো অসম্ভব, আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তৃষ্ণা-গৌরীরা। সেই বিশ্বাস সামান্য টোল খেল, যখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে সুজয়ের আইনজীবী 'ক্রস-একজামিনেশন'-এর আগেই পিটিশন করলেন কোর্টে। পিটিশনের সারবত্তা: ধর্ষণের এই মামলায় এভাবে ভিসি-র মাধ্যমে অভিযোগকারিণীর সাক্ষ্যগ্রহণের আইনি বৈধতা নেই। প্রক্রিয়াটাই তাই বাতিল করা হোক।

বাতিল করার সপক্ষে যুক্তি সাজালেন সুজয়ের আইনজীবী। এক, বিচারপর্বে হাজির থাকার

BanglaBook.org

জন্য সমন পাঠানো হয়নি জুডিথকে। দুই, যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনিই যে অভিযোগকারিণী, সে ব্যাপারে ওকালতনামা জমা নেওয়া উচিত ছিল কোর্টের। নেওয়া হয়নি। তিন, সাক্ষ্যগ্রহণের সময় জুডিথ এবং ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার ছাড়া অন্য কেউ যে উপস্থিত থাকছেন না, সেটা নিশ্চিত করা হয়নি। হতেই পারে, ওই ঘরে অন্য কেউ থাকছেন, যিনি ক্যামেরার আড়ালে থেকে জুডিথকে ইশারায় নির্দেশ দিচ্ছেন। চার, কথা বলার সময় ক্যামেরার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন কি না জুডিথ। সাক্ষীর শরীরী ভাষা স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়াটাও সাক্ষ্যমূল্য নির্ধারণের একটা শর্ত। সেই শর্ত পালিত হচ্ছে না।

আলিপুর কোর্ট মানল না এই যুক্তি। প্রশ্ন তুলল পালটা, এইসব ওজর-আপত্তি আগে তোলেননি কেন বিবাদী পক্ষের উকিল? প্রক্রিয়াগত ত্রুটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন প্রক্রিয়া অনেকটা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর? মানা যায় না এই হঠাৎ বোধোদয়। সুতরাং যেমন চলছে, তেমনই চলবে।

যেমন চলছিল, তেমন আর চলল কই? বিবাদী পক্ষ পত্রপাঠ দ্বারস্থ হল হাইকোর্টের। সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হওয়ার পর উচ্চ আদালতও খারিজ করে দিল সুজয়ের আইনজীবীদের দাবি।

খারিজ করার কারণ?

প্রথমত, সমন জারি করে আদালতে বিদেশিনী সাক্ষীর সশরীরে হাজিরা শুধু সময়সাপেক্ষই নয়, অনিশ্চিতও। ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং প্রক্রিয়ায় দেশে সাক্ষ্যদান হয়েছে একাধিক। অধিকাংশই যদিও দেওয়ানি মামলায়, ফৌজদারি মামলাতেও নজির আছে। ধর্ষণের মতো গুরুতর মামলায় এ যাবৎ হয়নি ঠিকই, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে যে-কোনও কেসেই ভিসি-প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যদানে কোনও আইনি বাধা নেই।

দ্বিতীয়ত, সাক্ষ্যদানের সময় ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলেন, যিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের দায়িত্বশীল অফিসার। তিনি অবশ্যই এটুকু নিশ্চিত করেছেন যে জুডিথের হয়ে অন্য কেউ সাক্ষ্য দিচ্ছেন না। জুডিথের ছবি আছে কেস ডায়েরিতে। সেই ছবির সঙ্গে বাস্তবের সাক্ষীর ন্যূনতম অমিলও খুঁজে পাননি নিম্ন আদালতের বিচারক। এই জুডিথই সেই জুডিথ কিনা, সেই প্রশ্ন তোলা তাই হাস্যকর। এবং ফার্স্ট সেক্রেটারির উপর এটুকু ভরসাও রাখতেই হবে যে তিনি জুডিথ ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকতে দেননি সাক্ষ্যদানের সময়।

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সাক্ষী দেওয়ার সময় একজন ধর্ষিতা ক্যামেরার দিকে কতটা তাকালেন বা না তাকালেন, সেটা মোটেই গ্রাহ্য নয় সাক্ষ্যের গুরুত্ব নির্ধারণে। একজন 'রেপ-ভিক্টিম'-এর পক্ষে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময় 'ট্রমাটাইজড' থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। অতএব যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দৈনিক ভিত্তিতে শেষ করতে হবে জুডিথের সাক্ষ্যদান।

হাইকোর্টের রায় বেরনোর যা অপেক্ষা! সুজয়ের আইনজীবীরা রায়ের বিপক্ষে দ্রুত আবেদন

BanglaBook.org

করলেন সুপ্রিম কোর্টে। সুজয়দের পরিবার যথেষ্ট অর্থবান। নামজাদা উকিলদের পিছনে জলের মতো টাকা খরচ করাটা কোনও সমস্যাই নয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ফের শুরু হল যুক্তি-পালটা যুক্তির আইনি লড়াই।

একটা ব্যাপার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চিত লক্ষ করবেন। এই যে লিখছি, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন হল হাইকোর্টে, রায় বহাল রাখল হাইকোর্ট, ফের আবেদন হল সুপ্রিম কোর্টে...ঘটনা-পরম্পরা ধরা থাকছে মাত্র কয়েকটা অনুচ্ছেদে। পড়লে হয়তো মনে হবে, ও আচ্ছা, এটার পর ওটা ঘটল। আর ওটার পর সেটা। বাস্তবের বিচারপর্ব সিনেমার 'কোর্টরুম ড্রামা' নয়। বরং, বিলম্বিত লয়। এটা-ওটা-সেটার যাত্রাপথে সময় কীভাবে চলে যায়, তদন্তকারীরাই জানেন। হাজার হাজার বিচারাধীন মামলা। হরেক তাদের চেহারা, হরেক তাদের চরিত্র। একটা নির্দিষ্ট মামলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও স্রেফ সংখ্যার চাপে উপায় হয় না আদালতের। মাসের পর মাস পেরিয়ে যায়, ক্যালেন্ডারে পালটে যায় বছর।

এবং ঠিক এখানেই তদন্তকারী অফিসারদের সিলেবাসে কঠিনতম চ্যাপ্টারের প্রবেশ। ধৈর্যের অনন্ত পরীক্ষা, অধ্যবসায়ের শেষ সীমান্ত ছুঁয়ে আসার চ্যালেঞ্জ। মগজাস্ত্রের প্রয়োগে কেসের সমাধান তো সিঁড়ির একটা ধাপ স্রেফ। জটিল মামলার বিচারপর্বে দাঁত কামড়ে লেগে থাকা তার থেকেও ঢের বেশি কঠিন।

গৌরী এবং তৃষ্ণা প্রাণপণ লড়ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ধেয়ে আসা বাউন্সারকে 'ডাক' করে পড়ে ছিলেন পিচ আঁকড়ে। উভয় পক্ষের তার্কিক স্নায়ুযুদ্ধ যখন চলছে সুপ্রিম কোর্টে, শুনানির পর শুনানিতে সুজয়ের আইনজীবীরা সাজাচ্ছেন ভিসি-প্রক্রিয়া বাতিল করার যুক্তিজাল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ দিল্লিতে কাটিয়েছিলেন গোয়েন্দাবিভাগের এই দুই মেধাবিনী তদন্তকারী। সরকার পক্ষের আইনজীবীদের সঙ্গে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠক করে সাজিয়েছিলেন পালটা যুক্তি। যখন সুপ্রিম কোর্টে জারি এই মামলার চাপান-উতোর, তার মাসখানেক আগেই স্বামীকে হারিয়েছিলেন তৃষ্ণা। সামনে ছিল ছেলের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। গৌরীর বাবাও সেই সময়েই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অবশ্য কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর দায়বদ্ধতা কবেই বা গ্রাহ্য করেছে সময়-অসময়-দুঃসময়কে?

রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। যে রায়ে খুশি হওয়ার কারণ ছিল। হতাশ হওয়ারও।

খুশি, কারণ সুপ্রিম কোর্ট শর্তাধীন বৈধতা দিল ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুডিথের সাক্ষ্যদানকে। কী শর্ত?

(ক) রাজ্য সরকারকে এনআইসি-র সহায়তা নিয়ে ' VC Location' নামক সফ্‌টওয়ারের মাধ্যমে ভিডিয়ো-কনফারেন্সিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এনআইসি এ বিষয়ে আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলবে এবং সুনিশ্চিত করবে উভয় পক্ষের প্রযুক্তিগত সাযুজ্য। আলিপুর কোর্টের বিচারক একটি বিশেষ ঘর চিহ্নিত করবেন, যেখানে চলবে সাক্ষ্যগ্রহণ

BanglaBook.org

that the postulated procedure was not fair to the appellant, the appellant has approached this Court.

We have heard learned counsel for the rival parties at some length, and are satisfied, that the following procedure should be adopted, in addition to the steps and safeguards provided in the impugned order, while recording the statement of PW5:

I) The State of West Bengal shall make provision for recording the testimony of PW5 in the trial Court by seeking the services of the National Informatic Centre (NIC) for installing the appropriate equipment for video conferencing, by using "VC Solution" software, to facilitate video conferencing in the case. This provision shall be made by the State of West Bengal in a room to be identified by the concerned Sessions Judge, within four weeks from today. The NIC will ensure, that the equipment installed in the premises of the trial Court, is compatible with the video conferencing facilities at the Indian Embassy in Ireland at Dublin.

II) Before recording the statement of the prosecutrix-PW5, the Embassy shall nominate a responsible officer, in whose presence the statement is to be recorded. The said officer shall remain present at all times from the beginning to the end of each session, of recording of the said testimony.

III) The officer deputed to have the statement recorded shall also ensure, that there is no other person besides the concerned witness, in the room, in which the testimony of PW5 is to be recorded. In case, the witness is in possession of any material or documents, the same shall be taken over by the officer concerned in his personal custody.

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে থাকা শর্তাবলির অংশ

প্রক্রিয়া। এজলাসে নয়, অন কোনও নির্দিষ্ট ঘরে।

(খ) আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস একজন দায়িত্বশীল আধিকারিককে চিহ্নিত করবে সাক্ষ্যগ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনিই একমাত্র জুডিথের সঙ্গে দূতাবাসে ভিসি-র জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে থাকবেন এবং নিশ্চিত করবেন কোনও তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতি। এবং এই শর্তগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে সে ব্যাপারে সাক্ষ্যগ্রহণের আগে কোর্টকে লিখিত হলফনামা দেবেন সংশ্লিষ্ট অফিসার।

(গ) সাক্ষ্যদানে যে যে প্রশ্নের উত্তরে যা যা বললেন জুডিথ পুরোটা স্ক্যান করে মেইল করতে হবে আইরিশ এমব্যাসিতে। জুডিথ সেটা পড়ে দেখে নেবেন, বয়ান নথিভুক্ত করায় কোনও ভুলভ্রান্তি হয়েছে কিনা। তারপর বয়ানে সই করবেন এবং সেই স্বাক্ষরিত বয়ানের এক কপি স্ক্যান করে মেইল করতে হবে আলিপুর কোর্টে। আর একটা কপি থাকবে ভারতীয় দূতাবাসের অফিসারের কাছে। বন্ধ খামে।

এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু খুশির পাশাপাশি হতাশারও উদ্রেক করল সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের শেষাংশ। যাতে বলা হল স্পষ্ট, এ যাবৎ জুডিথের যা সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা বাতিল করা হল। নতুন করে শুরু হবে সাক্ষ্যদান প্রক্রিয়া, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের শর্তাবলি মেনে, 'The instant parameters have to be adopted to record the testimony of the prosecutrix-PW-5, in addition to the procedure and safeguards provided for in the impugned order. Accordingly, it will be imperative to record her testimony afresh.'

মানে? ফের শূন্য থাকে শুরু? নিম্ন আদালতে এত যে কাড়াকড়ি, পোড়ানো, কলকাতা-দিল্লিতে এত যে দৌড়ঝাঁপ, এত যে মেইল-চালাচালি, সব কিছুর ফল শেষমেশ এই? এ তো অনেকটা সেইরকম হল, বল উইকেটে লাগল, কিন্তু বেল পড়ল না। নট আউট! আবার ফিরে যাও বোলি

BanglaBook.org

রান-আপে। শুরু করো নতুন করে। কী আর করা, ভাবলেন তৃষ্ণারা। শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক। এত কাছে এসে ফিরে যেতে নেই।

সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় শর্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে ফের শুরু হল নতুন করে জুডিথের সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া। প্রতিদিনই সুজয়ের সঙ্গে আদালতে হাজির থাকতেন তাঁর মা। একদিনও বাদ যেত না, ছেলের পাশে থাকতেন আগাগোড়া। সাক্ষ্যদান প্রক্রিয়ায় মাঝেমাঝেই 'মেন্টাল ব্রেকডাউন' হত জুডিথের। ক্যামেরার দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে ফের নামিয়ে নিতেন। কেঁদেও ফেলতেন কখনও কখনও।

গৌরী-তৃষ্ণা লক্ষ করছিলেন, 'আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য অ্যাকিউজ্‌ড' বা অভিযুক্তের চিহ্নিতকরণের দিন যত এগিয়ে আসছিল, নিজের চেহারায় সচেতনভাবে বদল আনছিলেন সুজয়। 'ক্লিন-শেভড' ছিলেন ঘটনার সময়। হঠাৎই দাড়িগোঁফ রাখতে শুরু করলেন। চুল কাটা বন্ধ করে দিলেন। 'হিপি'-দের মতো চেহারা করে ফেললেন। ঘটনার সময়ের চেহারার সঙ্গে যাকে মেলানো দায়। অঙ্ক পরিষ্কার, চেহারাকে এতটাই ভাঙচুর করা, যাতে চিহ্নিতকরণের দিন 'আইডেন্টিফাই' করতে অসুবিধা হয় জুডিথের। যিনি সুজয়কে দেখেছিলেন মাত্র সাত-আট ঘণ্টার জন্য। তারপর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে বছর চারেক।

চিহ্নিতকরণের দিন যা ঘটল, ধরা থাক তৃষ্ণার জবানিতে, 'ভীষণ টেনশনে ছিলাম আমরা। এতদিনে আমাদেরও এনার্জি ফুরিয়ে এসেছিল প্রায়। শুধু ভাবছিলাম শেষরক্ষা হবে তো? কয়েক মাস চুল-দাড়ি না কেটে একটা কিম্ভূত চেহারা করে ফেলেছিল সুজয়। বিচারক সেদিন মাত্র চোদ্দো-পনেরো জনকে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন ভিসি-রুমে। দু'পক্ষের আইনজীবী মিলিয়ে চারজন। আমি আর গৌরী। কোর্টের কর্মী পাঁচজন। এনআইসি-র দু'জন আধিকারিক। আর সুজয়। নির্দেশ ছিল, আইনজীবীরাও থাকবেন সাদা পোশাকে। প্রথাগত কালো গাউন পরে নয়। ঠিক পৌনে তিনটেয় ভিসি চালু হল। জুডিথকে দেখে খুব অস্থির মনে হচ্ছিল। আমরা শুধু ভাবছিলাম, পারবে তো?

'ক্যামেরা চলতে শুরু করল। বিচারক কোনও বাড়তি কথায় গেলেন না। সোজাসুজি বললেন, এই ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ভাল করে দেখুন। এবং দেখে বলুন, এঁদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি আছেন, যাঁর বিরুদ্ধে আপনি ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন? ভাল করে দেখুন। কোনও তাড়া নেই।

'সুজয় সেদিন সাদা শার্ট পরে এসেছিল। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম করছিল ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের উপর। সুজয়ের মুখের উপর থেকে যেই ক্যামেরা সরে ফোকাস করল বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর উপর, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জুডিথ, "হোল্ড ইট! ব্যাক প্লিজ!" ক্যামেরা ফিরল সুজয়ের মুখের উপর। সুজয় মুখ তুলছিল না। বিচারক ধমক দিলেন,

BanglaBook.org

"মুখ তুলুন!" ঘরে একটা দমবন্ধ অবস্থা তখন। সেকেন্ড দশেক বড়জোর, জুডিথ ফের চেঁচিয়ে উঠল, "ইটস হিম ! দ্য ওয়ান ইন দ্য হোয়াইট শার্ট!" বলেই ফের মুখ নিচু করে কেঁদে ফেললেন, "ক্যান উই এন্ড দিস নাউ?" একটুও বাড়িয়ে বলছি না, বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। নিশ্চিত হয়ে গেলাম, কনভিকশন এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।'

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের বিস্তারিত দিনপঞ্জি দিয়ে দীর্ঘায়িত করছি না এ-লেখার কলেবর। তবে এটুকু অবশ্যই উল্লেখ্য, যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি খুব বেশি হলে এক বা দেড় বছরের মধ্যে হয়ে যাবে বলে ভেবেছিলেন লালবাজারের কর্তারা, বিস্তর টানাপোড়েনের বাধা পেরিয়ে তার রায় বেরিয়েছিল প্রায় সাড়ে চার বছর পরে। ২০১৮-র জানুয়ারিতে। আলিপুর আদালত সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল সুজয় মিত্রকে। জরিমানা বাবদ জুডিথকে দুই লক্ষ টাকা দেওয়ারও নির্দেশ ছিল সুজয়ের উপর।

'জাস্টিস ডিলেইড' হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'ডিনায়েড' হয়নি। গৌরী-তৃষ্ণা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে দেননি ভারতে এসে যৌন-নির্যাতনের শিকার হওয়া এক বিদেশিনীকে। বিচারপ্রক্রিয়ায় তদন্তকারীদের মরিয়া লড়াই আর নিরলস অধ্যবসায়ের জন্যই গোয়েন্দাপীঠ লালবাজারের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে এই মামলা।

কল্পনার গোয়েন্দা কাহিনিতে সংখ্যার নিরিখে হোক বা জনপ্রিয়তায়, মহিলা ডিটেকটিভের সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা। বিদেশি গোয়েন্দা সাহিত্যে এক এবং অদ্বিতীয়া আগাথা ক্রিস্টি সৃষ্ট মিস মার্পল। বাংলায় মুখ ফেরাই যদি, আছেন অনেকে। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা' থেকে মনোজ সেনের 'দময়ন্তী'। প্রদীপ্ত রায়ের 'জগাপিসি' থেকে নলিনী রায়ের 'গন্ডালু,' বা অদ্রীশ বর্ধনের 'নারায়ণী'। তবে লোকপ্রিয়তার মাপকাঠিতে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মিতিনমাসি' বা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোয়েন্দা গার্গী' অনেকটাই এগিয়ে অন্যদের তুলনায়। অনেকেরই স্বাভাবিক কৌতূহল, বাস্তবে নেই মহিলা গোয়েন্দা? পুরুষদেরই আধিপত্য একচেটিয়া?

সত্যের খাতিরে স্বীকার্য, আধিপত্য হয়তো আছে। হয়তো কেন, নিশ্চিতভাবেই আছে। কিন্তু তা মহিলা গোয়েন্দাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার মতো নিরঙ্কুশ নয় মোটেই। মেধা, পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার ত্র্যহস্পর্শে বহু জটিল মামলার সুচারু সমাধান করেছেন মহিলা অফিসাররা। আলোচ্য কেস তো একটা নমুনা মাত্র।

এ কাহিনির শেষ অনুচ্ছেদ লিখতে গিয়ে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' মনে পড়ে যায়। ছবির একদম শুরুতে রুকু ওরফে ক্যাপ্টেন স্পার্কের সেই ডায়লগটা ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে আসে অনিবার্য। 'সব সত্যি। মহিষাসুর সত্যি, হনুমান সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, টাইমজ্ঞান সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি...।'

বাস্তবেও তাই। ফেলুদা সত্যি, ব্যোমকেশ সত্যি। মিতিনমাসিও সত্যি।

BanglaBook.org

সিনেমাতেও এমন হয় না

এভাবেও গোল খাওয়া যায়?

ফুল টাইম হয়ে গিয়েছিল। যে কোনও সময় শেষের বাঁশি বাজত। ইনজুরি টাইমের দু'-তিন মিনিট খেলাচ্ছিল রেফারি। ঘড়ি দেখছিল বারবার। ওই সময় এই গোল কেউ খায়! যে ম্যাচ ওয়ান-অল শেষ হওয়ার কথা, সেটা কেউ এভাবে টু-ওয়ানে হারে? সব দোষ বুবাইয়ের। অপোনেন্ট অল আউট ঝাঁপাচ্ছে গোলের জন্য, তখন কেউ ওভাবে ডিফেন্স চিচিং ফাঁক করে ওভারল্যাপে যায়?

আর গেলি তো গেলি, অ্যাট লিস্ট বলটা হোল্ড তো কর! মাঝমাঠ পেরতে না পেরতেই কড়া ট্যাকলে বল কেড়ে নিল বুবলা, 'তরুণ সংঘের' মিডফিল্ডার। লহমায় উঠে এল উইং দিয়ে। বুবলার নিখুঁত ক্রসে নিটোল হেড রিন্টুর। গোল। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ওঠার গল্প শেষ। টু-ওয়ানে হেরে ছিটকে যাওয়া।

পাপ্পা আজ ডিফেন্সে থাকলে হত না এটা। ঠিক সামলে দিত। রিন্টুকে নিতেই দিত না হেডটা। ছিটকে দিত শোল্ডার-পুশে। এরিয়াল বলে পাপ্পাকে বিট করা অত সোজা নয়। আজ পাপ্পা থাকলে...।

শেষ মিনিটে হেরে যাওয়া ম্যাচের পোস্টমর্টেম চলছিল। ম্যাচ শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেও নাগেরবাজারের মাঠে মুহ্যমান বসেছিল 'দমদম ইয়ুথ স্পোর্টিং ক্লাব'-এর পাঁচ কিশোর।

যে থাকলে এই ম্যাচ এভাবে হারতে হত না বলে সমবেত আক্ষেপ, সেই পাপ্পাকে দেখা গেল এই সন্ধের মুখে মাঠের দিকে হেঁটে আসতে। কাছাকাছি আসতেই টোটো বলে ফেলল, 'এতক্ষণে সময় হল বাবুর! তরুণ সংঘ আমাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে যাওয়ার পর!'

টোটোর দেখাদেখি রাজাও কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল পাপ্পাকে দেখে। যার চোখমুখ অস্বাভাবিক রকমের থমথমে আজ। গনগনে রাগ যেন জমাট বেঁধে আছে চেহারায়।

'কী রে... এভাবে ঝোলালি আজ... লাস্ট মিনিটে হেরে গেলাম...', দেবা, মানে দেবাশিষ শুধু এটুকু বলেছিল। তাতেই ফেটে পড়ল পাপ্পা, 'কী করে আসব? শালা বাড়ি থেকে আসতে দিলে তো! বাবা, ওই ডাইনিটা আর দাদার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেল আফটারনুন শো-য়ে। এই ফিরেছে একটু আগে।

BanglaBook.org

'আমি বলেছিলাম, আজ কোয়ার্টার ফাইনাল, ম্যাচটা খেলেই চলে আসব। বাবা বলল, "ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে বুঝি? পাতি পাড়ার ম্যাচ কিছু বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে, তা নিয়ে এত কথার কী আছে? পেলে বা মারাদোনা হবি নাকি বল পিটিয়ে?" ডাইনিটাও তাল দিল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, "ফুটবল নিয়ে অত নখরা করতে হবে না, আমরা ফেরার আগে দুপুরের বাসনগুলো মেজে রাখবি। আর হ্যাঁ, কাজলের জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে আলমারিতে তুলে রাখবি। একটুও এদিক-ওদিক হলে মজা দেখাব।"

দাদাও এত শয়তান, বেরনোর আগে হাসতে হাসতে বলে গেল, "পাপ্পা, গুছিয়ে রাখিস কিন্তু সব। না হলে শুনলি তো, মা ফিরে এসে মজা দেখাবে।" দাদার কথায় আমার মাথায় আগুন চড়ে গেল। তেড়ে গেলাম। বাবা তাই দেখে বেদম মারল। এই দ্যাখ, দাগ হয়ে গেছে গায়ে। যখন মার খাচ্ছিলাম, দাদা দাঁত ক্যালাচ্ছিল। ডাইনিটাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। আমার ইচ্ছে করছিল গলা টিপে মেরে ফেলি সব ক'টাকে।'

পাড়াতুতো টুর্নামেন্টের হারজিতের সমস্যা গৌণ হয়ে যায় নিমেষে। বন্ধুরা অসম্ভব ভালবাসে পাপ্পাকে। ওরা জানে, বাড়িতে ঘোর অশান্তিতে কাটে পাপ্পার দিনগুলো। জানে, বাড়িটার রিমোট কন্ট্রোল থাকে ওর সৎমায়ের কাছে। প্রথম স্ত্রীর কথাতেই ওঠে-বসে পাপ্পার বাবা। সৎদাদা কাজল বাড়িতে থাকে রাজার হালে। আর পাপ্পার দিন কাটে চাকরের মতো। স্কুল থেকে ফিরে বাড়ির হাজারটা কাজ করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই বাবার কাছে নালিশ ঠোকে সৎমা। আর পিটুনি খায় পাপ্পা। একটাও শখ-আহ্লাদ মেটে না ছেলেটার। আজ যেমন। সেই বাচ্চা বয়স থেকেই পাপ্পা ফুটবল বলতে অজ্ঞান। খেলেও দারুণ। অথচ আজকের ভাইটাল ম্যাচটা খেলতে পারল না।

টোটো পিঠে হাত রাখে পাপ্পার, 'ছাড়... মন খারাপ করিস না। পরের মাসে শুনলাম বিরাটির দিকে একটা সেভেন-আ-সাইড টুর্নামেন্ট নামাচ্ছে ওখানের একটা ক্লাব। দেখিস, ওটায় ঠিক জিতব আমরা। এই তরুণ সংঘ-র সঙ্গে হিসেবটা মিটিয়ে দেব।'

পাপ্পার প্রতিক্রিয়ায় খানিক ঘাবড়েই যায় বন্ধুরা, 'তার আগে আমাকে বাড়ির হিসেবটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। অনেক ভেবে দেখেছি। এভাবে লাথিঝাঁটা খেয়ে থাকব না আর আমি। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।'

রঞ্জিত উত্তেজিতভাবে বলে, 'সত্যিই... সহ্য করা উচিতও নয়... কেলিয়ে কলাগাছ করে দেওয়া উচিত... বাড়ির কুকুর-ছাগলের সঙ্গেও লোকে এই ব্যবহার করে না... তোর বাপট মাইরি আজব পাবলিক!'

'যা বলেছিস!' দেবাশিষ যোগ দেয় আলোচনায়, 'নষ্টের গোড়া কিন্তু তোর বাবাই... না হলে তোর ওই সৎমা-র সাহস হত এভাবে অত্যাচার করার? মিমিয়ে নিস, তোর বাবাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে তোর দাদার নামে সব সম্পত্তি লিখিয়ে নেবে তোর সৎমা। কানাকড়িও জুটবে না তোর ভাগ্যে।'

BanglaBook.org

পাপ্পা শুনছিল চুপচাপ। রাজা পাশে এসে বসল, 'এই যে বললি বাড়ির হিসেব মিটিয়ে দিবি... মানে?'

—মানে আবার কী? হিসেব মিটিয়ে দেওয়ার যা মানে, তাই।

টোটোকে অধৈর্য শোনাল, 'হেঁয়ালি করিস না!'

পাপ্পা তাকাল বন্ধুদের মুখের দিকে। রাজা-টোটো-বুড়ো-দেবা-রঞ্জিত... এরা তার ছোটবেলার বন্ধু। প্রাণের-মনের সব কথা একমাত্র ওদেরই বলতে পারে সে। ওদের তো বলতেই হবে সব। একা হবে না কাজটা। বন্ধুদের হেল্‌প লাগবেই। আপাতত অবশ্য একটাই জিনিস জানার আছে ওদের কাছে।

—তোরা কে কে গতকালের 'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক' দেখেছিস?

—না না স্যার, নাকটা এরকম না। আপনি নাকটাকে একটু বোঁচা করে ফেলছেন। ওর নাকটা খাড়া, ধারালো। হ্যাঁ, চুলটা ঠিক আছে। একদম এমনটাই ঝাঁকড়া। জুলপি অবধি শুধু নামিয়ে দিন। ঠোঁটটা মনে হয় আর একটু পাতলা হবে... হ্যাঁ হ্যাঁ... এরকমই। চোখদুটো কিন্তু হচ্ছে না স্যার। বললাম না... বিকাশের চোখগুলো এমন ছোট নয়। বরং বড় বড়। ঝকমক করে একদম। হ্যাঁ স্যার... এইবার ঠিক হচ্ছে... মুখের আদলটা আসছে। গোঁফটা পারফেক্ট হয়েছে...।'

লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে 'পোর্ট্রেট পার্লে'-র প্রক্রিয়া চলছে। অপরাধীর চেহারার বিবরণ শুনে পেশাদার শিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকানো হচ্ছে। যোধপুর পার্কের এক গেস্ট হাউসে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছিল সপ্তাহখানেক আগে। দু'জন ধরা পড়েছে। স্বীকারও করেছে অপরাধ। জেরায় গোয়েন্দারা জেনেছেন, এই দু'জন চুনোপুঁটি লেভেলের ক্রিমিনাল। ডাকাতিটায় লিড করেছিল বিকাশ বলে একজন। মাস্টারমাইন্ড ওই বিকাশই। যে এখনও ধরা পড়েনি। ধৃত দু'জনের থেকে বিকাশের চেহারার বর্ণনা শুনে স্কেচ করা হচ্ছে।

অধরা অপরাধীর ছবি আঁকা শেষ। ডাকাতি-দমন বিভাগের ওসি এলেন। যিনি নিজের তিরিশ বছরের কেরিয়ারে অজস্র অপরাধীর ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, বহু দাগি আসামির ইতিহাস-ভূগোল যাঁর ঠোঁটস্থ। ওসি স্কেচটা হাতে নিলেন। অন্তত মিনিটদশেক দেখলেন একদৃষ্টিতে। যখন শেষ হল দেখা, ততক্ষণে ভুরু কুঁচকে গেছে ভদ্রলোকের। দ্রুত ফোন করলেন গোয়েন্দাবিভাগের সিআরএস (ক্রাইম রেকর্ডস সেকশন)-এ। যেখানে সযত্নে নথিবদ্ধ থাকে শহরের এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কবে কোন অপরাধী ধরা পড়েছিল, তার সবিস্তার খতিয়ান। থাকে গ্রেফতারির সময়ের ছবি। সিআরএস থেকে একটা ছবি চেয়ে

BanglaBook.org

পাঠালেন তড়িঘড়ি। আঠারো বছর আগের এক মামলায় মূল অভিযুক্তের ছবি।

এসে গেছে ছবি। যা ধৃত দুই অভিযুক্তের সামনে মেলে ধরেছেন ওসি, 'ভাল করে দ্যাখ তো.. একে চিনতে পারিস কিনা।' ছবিটায় একটু চোখ বুলিয়েই মুখ খুলল ধৃতদের একজন, 'স্যার এটা তো মনে হচ্ছে বিকাশেরই ছবি... ছোটবেলার ছবি।' অন্যজনও সায় দিল, 'হ্যাঁ স্যার, বাচ্চ বয়সের ছবি, কিন্তু এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিকাশই!'

ষোলো বছরের সজল

ওসি মৃদু হাসেন। তাকান পাশে দাঁড়ানে মধ্যতিরিশের সহকর্মী সাব-ইনস্পেকটরের দিকে, 'স্কেচটা দেখে যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। এর নাম আদৌ বিকাশ নয়। নামট বানিয়ে বলেছিল এদের।'

—বিকাশ নয়? তা হলে কে স্যার?

—তোমার সেই আর্লি নাইন্টিজের কেসটা মনে আছে? নাইন্টিন নাইন্টি থ্রি টু বি প্রিসাইস। কলকাতার নয়, নর্থ টুয়েন্টি ফো পরগনার মামলা। তখন বোধহয় তোমর স্কুলে-টুলে পড়ো। আরে, দমদমের সেই কেসটা, যেটা নিয়ে তখন তুমুল হইচই হয়েছিল। ওই যে, একটা ষোলো বছরের ছেলে তার পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে নিজের বাবা সৎমা আর সৎদাদাকে খুন করেছিল ঠান্ড মাথায়... মনে পড়ছে?

—কী বলছেন স্যার! ওটা মনে থাকবে না? তখন ক্লাস এইটে পড়ি। কাগজে রোজ গোগ্রাসে পড়তাম মামলাটার কথা। ছেলেটা তো প্রায় আমাদেরই বয়সি ছিল। ছবি বেরত কাগজে সজল বারুই!

—ইয়েস... সজল বারুই। সে সময় যে ছবিগুলো বেরিয়েছিল কাগজে, সেই চেহারাটাই মনে আছে লোকের। সে সময়ের ছবিটা আর এই স্কেচটা পাশাপাশি রাখো। এত বছরেও চেহারা বিশেষ একটা পালটায়নি। একটু মাংস লেগেছে শরীরে। বাকি ফিচার্স মোটামুটি একই আছে। বিকাশটা ভুয়ো নাম। এটা মোস্ট ডেফিনিটলি সজল। সজল বারুই।

BanglaBook.org

সজল বারুই মামলায় ভূমিকা অনাবশ্যক, প্রাক্-কথন অপ্রয়োজনীয়। সরাসরি ঢুকে পড়ি ঘটনায়।

সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল সুবল-নিয়তির। সেটা সাতের দশকের মাঝামাঝি। সুবলের কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল সদাগরি আপিসের মোটামুটি ভদ্রস্থ চাকরি দিয়ে। পাশাপাশি পৈতৃক ব্যবসাও ছিল একটা। দুয়ে মিলে রোজগার মন্দ হত না। সচ্ছল পরিবার বললে পুরোটা বলা হয় না। 'সম্পন্ন'-ই সঠিক বিশেষণ।

নিয়তির সঙ্গে বিশেষ বনিবনা ছিল না শ্বশুর-শাশুড়ির। খিটিমিটি লেগেই থাকত। বিয়ের মাসছয়েকের মধ্যেই সুবল পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দমদমে উঠে এসেছিলেন তিন কামরার ফ্ল্যাটে। ৫, এন সি সেনগুপ্ত সরণিতে 'শুভম অ্যাপার্টমেন্ট'-এর পাঁচতলায়। ফ্ল্যাট নম্বর ৪/এ। বিয়ের বছরখানেক পর পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন নিয়তি। নাম রাখা হয়েছিল কাজল।

সুবল চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, এমন 'বদনাম' দেওয়া যাবে না। পরনারীসংসর্গে অবিচল আগ্রহ ছিল। মিনতি নামের এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এবং এতটাই গভীরভাবে, যে নিয়তিকে একপ্রকার পরিত্যাগই করলেন। দেড় বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলেন নিয়তি।

সুবল নতুন সম্পর্ককে বৈধতাও দিলেন। কালীঘাটে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করলেন মিনতিকে। তবে দমদমের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন না দ্বিতীয় স্ত্রী-কে। উত্তর শহরতলির প্রত্যন্তে একটা দেড় কামরার ঘুপচি ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। মিনতির থাকার ব্যবস্থা হল সেখানে। সারাদিনের কাজ সেরে সুবল সন্ধেয় আসতেন। রাত কাটিয়ে দমদমে ফিরে যেতেন সকালে। মিনতির সঙ্গে বিয়ের বছরদেড়েকের মাথায় জন্ম হল সজলের। সুবলের দ্বিতীয় সন্তান। যার ডাকনাম রাখা হল পাপ্পা। সুবলের দুই ছেলে বেড়ে উঠতে লাগল যে যার মায়ের প্রতিপালনে। নিয়তির কাছে কাজল। মিনতির কাছে সজল।

'৮২-৮৩ সাল তখন। সজলের তখন কতই বা বয়স? পাঁচ-ছয় সবে। সে মায়ের সঙ্গে থাকে। সে এটা বোঝে যে তার বাবা-মা একসঙ্গে থাকে না। বাবা সপ্তাহে অন্তত তিন-চার দিন আসেই তার আর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু যখন আসে, তাকে বা মা-কে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার কথা কখনও বলে না। কেন এমনটা হয়েছে, কেন এমনটা হয়, সেটা বোঝার মতো বয়স তখনও হয়নি বালক সজলের। তার শুধু মনে হয়, বাবা-মা দু'জনের সঙ্গেই থাকতে পারলে ভারী মজা হত।

সুবল দ্বিতীয় বিয়েটা করেছিলেন মিনতির শরীরী মোহে সামগ্রিক আচ্ছন্ন হয়ে। মোহের একটা আয়ু থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আয়ুর ক্ষয় ঘটছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। মিনতির কাছে আসা

BanglaBook.org

ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছিলেন সুবল। আগে সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন আসতেন। সেটা কমে দাঁড়াল হপ্তায় একদিনে। মাসিক খরচ হিসেবে যা দিতেন এতদিন, তার এক-চতুর্থাংশও দিচ্ছিলেন না আর। আর সে দেওয়াও ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত।

বাবার ব্যবহার অদ্ভুত লাগতে শুরু করেছিল ছ'বছরের সজলেরও। ইদানীং বাবা কমই আসে। কিন্তু যখন আসে, মুখ হাঁড়ি করে থাকে সবসময়। এই তো সেদিন, সে শুধু ঘুড়ি-লাটাই কেনার জন্য পয়সা চেয়েছিল, তাতেই বাবা কী ভীষণ রেগে গিয়েছিল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা দেখিয়ে বলেছিল, 'এক পয়সাও দেব না। আর যদি ঘ্যানঘ্যান করিস, গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দেব।' ভয়ে আর কথা বাড়ায়নি সে। সুবলের ভাবভঙ্গি দেখে কথা বাড়াতেন না মিনতিও। যিনি তখনও জানতেন না, সুবলের সঙ্গে নিয়তির যোগাযোগ ফের স্থাপিত হয়েছে। জানতেন না, কিছুদিনের মধ্যেই কিশোর কাজলকে নিয়ে দমদমে স্বামীগৃহে ফিরতে চলেছেন সুবলের প্রথম স্ত্রী নিয়তি।

মিনতি ছিলেন নেহাতই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই আর। দুই দাদা আছেন, যাঁরা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সুবল অর্থসাহায্য কমিয়ে দেওয়ায় মিনতি অকূল পাথারে পড়লেন। সেলাইয়ের কাজ শুরু করলেন। আর এ বাড়ি-ও বাড়ি খুচরো রান্নার কাজ। নিজের এবং ছেলের পেট চালাতে পরিশ্রম করতেন উদয়াস্ত। অর্থকষ্ট ছিল তীব্র, সামর্থ্য ছিল না সজলকে কোনও ভাল স্কুলে ভরতি করানোর। স্থানীয় যে বিনে-মাইনের কর্পোরেশন স্কুলে ভরতি করিয়েছিলেন সজলকে, সেটা নামেই স্কুল। সেখানে পড়াশুনোর নামগন্ধ নেই বিশেষ। সেখানে বইখাতার থেকে ডাঙ্গুলি-পিট্টু-গুলতির চল বেশি।

সজলের যখন আট বছর, সুবল এলেন একদিন। কোনও ভূমিকা ছাড়াই মিনতিকে বললেন, 'এই পরিবেশে থাকলে, এই থার্ড ক্লাস স্কুলে পড়লে পাপ্পার কিছুই হবে না। লাইফটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ঠিক করেছি, পাপ্পাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখব। ভাল স্কুলে ভরতি করাব।'

ধোপে টিকল না মিনতির মৃদু প্রতিবাদ। একপ্রকার বাধ্যই হলেন ছেলেকে ছেড়ে দিতে। নিজেও বুঝতে পারছিলেন, ছেলেকে একটা ভদ্রস্থ স্কুলে পড়ানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। হবেও না অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে। ছেলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। ছাড়া গোরুর মতো ঘুরে বেড়ায় এখানে-সেখানে। যার-তার সঙ্গে মেশে। শাসন করার কেউ নেই। বাবার কাছে গেলে অন্তত একটা নিয়মের মধ্যে থাকবে। সুবল যখন বললেন, 'এখানে এভাবে থাকলে ছেলেটা ক্রিমিনাল তৈরি হবে', মুখে উত্তর জোগায়নি মিনতির। অবশ্য বাক্যটা যখন চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করছিলেন সুবল, নিজেও কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন, শব্দগুলো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে কয়েক বছরের মধ্যেই, ছেলের 'ক্রিমিনাল' হওয়ার বীজ বরং বপন হবে বাবার কাছেই, এবং তাতে শাখাপ্রশাখার বিস্তার ঘটবে দ্রুত?

সুবল ছোটছেলেকে নিয়ে এলেন দমদমের ফ্ল্যাটে। প্রথমা স্ত্রী নিয়তির তীব্র এবং সহজ বাধ্য অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করেই। প্রথম দু'-তিন বছর মন্দ কাটেনি সজলের। সাজানো-গোছানো নতুন

BanglaBook.org

বাড়ি। নতুন স্কুল, নতুন বইখাতা। সবচেয়ে ভাল যেটা, এই নতুন বাড়িটার কাছেই একটা বড় মাঠ আছে। সেখানে সজল যায় বিকেলে ফুটবল খেলতে। খেলতে খেলতেই জুটে গেছে নতুন বন্ধু।

বাড়িতেও দিব্যি সময় কেটে যেত দাদার সঙ্গে খুনসুটি করে। কাজল, তার নতুন দাদা। তার থেকে তিন বছরের বড়। বাবা বলে দিয়েছে, দুই ভাই যেন মিলেমিশে থাকে। ঝগড়াঝাঁটি যেন না করে। ঝগড়া যে হয় না, তা নয়। তবে মিটেও যায়।

বাড়িতে একজনকে অবশ্য তার শুরু থেকেই পছন্দ হয়নি। 'নতুন মা'। এই ফ্ল্যাটটায় আসার পর যাকে দেখিয়ে বাবা বলেছিল, 'পাপ্পা, ইনি হলেন তোমার নতুন মা, এঁকে "মা" বলে ডাকবে আজ থেকে।' পাপ্পা তো অবাক! মা তো মা-ই! তার আবার নতুন-পুরনো হয় নাকি? তা ছাড়া তার তো মা আছে। ইনি তো দাদার মা। নিজের মা ছাড়া অন্য কাউকে মা বলে ডাকা যায় নাকি? তবু পাছে বাবা বকে, এই নতুন মা-কেই 'মা' বলে ডাকতে শুরু করেছিল।

মায়ের জন্য শুরুর দিকটায় মন খারাপ করত খুব। কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেই বাবার মুখ থমথমে হয়ে যেত। বলত মায়ের কথা ভুলে যেতে। একদিন মায়ের কথা মনে পড়ছিল খুব। 'মায়ের কাছে নিয়ে চলো' বলে সকাল থেকে একটু বেশিই আবদার জুড়েছিল। বাবা একটা সময় ঠাস করে চড় কষিয়ে দিয়েছিল। 'তোকে আমি শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি আর কোনওদিন যদি মায়ের সঙ্গে দেখা করার কথা শুনেছি ঘরে বন্ধ করে রেখে দেব। নেমকহারাম তৈরি হয়েছে একটা। ভিক্ষা করে খেতিস ওই মায়ের কাছে থাকলে।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে চোখে জল এসেছিল সেদিন। তার কি আর কোনওদিনই মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না? সে না হয় ভিক্ষে করেই খেত। সে কি বাবাকে বলেছিল মায়ের কাছ থেকে এখানে নিয়ে আসতে? তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এই নতুন মা কত আদর করে দাদাকে। চুল আঁচড়ে দেয়। স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে দেয়। কই, কখনও তো তাকিয়েও দেখে না তার দিকে! নিজের ছেলে নয় বলেই তো? তা হলে সে-ই বা কেন 'মা' বলে ডাকবে সৎমাকে?

বাবার উপরও ভারী অভিমান হয় তার। বাবা কি অন্ধ? দেখতে পেল না, গত পরশু রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় দাদার প্লেটে দুটো দরবেশ পড়ল, আর তার প্লেটে একটা। বাবারই তো আনা মিষ্টি। প্যাকেটে আরও তিন-চারটে মিষ্টি তো ছিলই। সেগুলো নতুন মা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দিল। কেন ঢুকিয়ে রাখল, সে জানে। ওগুলো কাল দাদার টিফিনে যাবে। সে লজ্জায় বলতেও পারল না, 'আমাকেও আরেকটা দাও।' অথচ দরবেশ খেতে সে কী অসম্ভব ভালবাসে।

চাইলেই হত, কিন্তু তবু কেন সে চাইতে পারল না? শুধু লজ্জায়? না কি ভয়েও? নতুন মা-কে সে ভয়ই পায়। এখানে আসার পর থেকে একদিনও তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি নতুন মা। বাবার কি এসব চোখে পড়ে না? নতুন মায়ের কথার উপরে বাবাও কথা বলে না কেন? বাবাও ভয় পায় এত? তা হলে সে আর কাকে নিজের কথা বলবে?

শৈশব থেকে কৈশোরের দিকে যত এগোচ্ছিল কাজল-সজল, ছেলে আর সৎছেলের মধ্যে

BanglaBook.org

তফাতটা বেআব্রু করে দিচ্ছিলেন নিয়তি। এবং সব দেখেশুনে, জেনেবুঝেও উদাসীন থাকছিলেন সুবল। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত সজলের একটা ভরসাস্থল দরকার ছিল। সুবল সেই ভরসার পরিসরটুকু ছোটছেলেকে দিতে পারেননি। সৎবাবার মতো আচরণ করতেন ছোটছেলের সঙ্গে।

কীরকম?

কাজল ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে। ক্রিকেট-কিট চাই, আবদার করল বাবার কাছে। নতুন মা-ও ইনিয়েবিনিয়ে বলল বাবাকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বড়ছেলের জন্য ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস-অ্যাবডোমেন গার্ড হাজির। সজল ফুটবল-পাগল। কবে থেকে বাবাকে বলছে একজোড়া স্পাইক বুট আর শিনগার্ডের জন্য। ক্রিকেট-কিটের তুলনায় অনেক কম খরচায় হয়ে যায়। অথচ সময়ই হচ্ছে না বাবার। মনে করাতে গেলে খিঁচিয়ে উঠছে বরং। অন্যায় নয়?

সজল আঁকতে ভালবাসে। ভাল আঁকে। রং-তুলিকে তার বন্ধু বলে মনে হয়। স্কুলে ড্রয়িং কন্টেস্টে সবসময় ফার্স্ট হয়। তাদের ড্রয়িং স্যার বলেছেন, 'তোমার ট্যালেন্ট আছে আঁকায়। একটু মাজাঘষা করলে ভাল পেইন্টার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তোমার। বোলো বাড়িতে।' সে বলেছিল বাড়িতে, কিন্তু বাবা শুনলে তো! অথচ নতুন মা একবার বলতেই বাবা তড়িঘড়ি সুইমিংয়ে ভর্তি করিয়ে দিল দাদাকে। তার সাঁতার অত ভাল লাগে না। তার ছবি আঁকতে ভাল লাগে। বাবা জানেও সেটা। পারত না তাকে একটা ড্রয়িং শেখার স্কুলে ভরতি করিয়ে দিতে? বলল একবারও? অবিচার নয়?

হ্যাঁ, সে পড়াশুনোয় ভাল নয় বড় একটা। টেনেটুনেই পাশ করে পরীক্ষায়। কিন্তু দাদাই বা লেখাপড়ায় কীসের দিগ্‌গজ? সে এইট থেকে নাইনে ওঠার পরীক্ষায় মোটেই ভাল করেনি। অঙ্ক আর ইংরেজিতে ফেল করতে করতে বেঁচে গেছে। রিপোর্ট কার্ড দেখে কী মারটাই না মারল বাবা! কিন্তু দাদার মার্কশিট দেখে শুধু বলল, 'পড়াশুনোয় আরও মন দিতে হবে।' অথচ ইলেভেন থেকে টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষায় একটা সাবজেক্টেও দাদা একশোয় পঞ্চাশের বেশি পায়নি। তার বেলা? যত মার বরাদ্দ শুধু তার বেলায়? অত্যাচার নয়?

বাবা-মায়ের আচরণে কাজলও দ্রুত বুঝতে শুরু করেছিল, এবাড়িতে তারই জন্য বরাদ্দ বাজার পার্ট। সৎভাই সজল হীনদরিদ্র প্রজামাত্র। ক্লাস এইট থেকে টেনের মধ্যবর্তী সময়টায় বাড়িতে ক্রমশ একা হয়ে পড়েছিল সজল। তার রাগ-দুঃখ-ক্ষোভ-অভিমান উগরে দেওয়ার একমাত্র জায়গা হয়ে উঠেছিল ফুটবল মাঠের বন্ধুরা। মাঠে বিকেলের ফুটবল আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাটুকুই ছিল সজলের জীবনে একমাত্র সবুজ। বন্ধুরা শুনত পাপ্পার বাড়ির রোজনামচা। শুনত, ক্রমশ বাড়ির 'ছেলে' থেকে কীভাবে বাড়ির 'চাকরে' পরিণত হচ্ছে পাপ্পা।

চাকর ছাড়া কী? ক্লাস এইটে ওঠার পরই সজলকে বাসন মাজার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন নিয়তি। ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাসন-মাজার লোক। 'প্লেটগুলো একটু ধুয়ে দিস তো পাপ্পা' দিয়ে শুরু। ক্রমে পাকাপাকিভাবে দিনরাতের বাসন মাজার কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। শুধু কি তাই?

BanglaBook.org

কাজলের জামাকাপড় ইস্ত্রি করা। রাতে শোবার আগে নিজের বুট পালিশ করার সময় কাজলের বুটও পরিষ্কার করে রাখা। 'কেন, দাদা করতে পারে না নিজেরটা?' একদিন বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছিল সজল। উত্তরে রে রে করে তেড়ে এসেছিল নতুন মা। ডেকে এনেছিল বাবাকে, 'শুনে যাও, মেজাজটা শুধু দেখে যাও তোমার ছেলের। দাদার জুতোটা একটু পালিশ করে দিতে বলেছি বলে প্রেস্টিজে লেগেছে বাবুর! তোর মা তোর জুতো পালিশ করার জন্য কতজন দাসদাসী রেখেছিল রে?'

সুবল এসব ক্ষেত্রে যা করে থাকতেন, সেটাই করেছিলেন। উদ্দাম মেরেছিলেন সজলকে, 'মুখে মুখে কথা বলার সাহস হল কোত্থেকে তোর? যা বলা হচ্ছে করবি। নয়তো দূর করে দেব বাড়ি থেকে। পচে মরবি তোর ওই ভিখিরি মায়ের কাছে।' সজল লক্ষ করেছিল, সে যখন মার খাচ্ছিল, দাদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছিল তখন। ভাইয়ের হেনস্থায় আনন্দ যেন আর ধরছে না। একবারও বলতে পর্যন্ত এল না, 'পাপ্পাকে আর মেরো না।'

বাড়ি, না জেলখানা এটা? বাবা লোকটা একটা কসাই। এমন বাবা থাকার থেকে না-থাকা ঢের ভাল । আর এমন সৎমা যেন চরম শত্রুরও না হয়। ডাইনি ডাইনি! রইল বাকি সৎদাদা। পাকা শয়তান একটা। সুযোগ পেলেই বাবা আর ওই ডাইনিটার কাছে চুকলি করে মার খাওয়ায় তাকে। বন্ধুরা ঠিকই বলে, বাবাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে সব সম্পত্তি দাদার নামে লিখিয়ে নেওয়ার তাল করছে ডাইনিটা। বাবার যা কিছু, সব দাদা ভোগ করবে। আর তার জীবন কাটবে এদের দয়ায়, চাকরগিরি করে। নাহ, ঢের হয়েছে! আর নয়। তিনটেকেই মেরে সে জেলখানায় থাকবে, তা-ও ভাল। কিন্তু এভাবে আর নয়।

পাড়ার ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালটাও তাকে খেলতে দিল না ওরা। অথচ এই ম্যাচটা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কত প্ল্যানিং করেছিল গত পরশু। ওরা তিনজন সিনেমা দেখতে গেল। সে খেলতে যেতে চেয়েছিল বলে বাবা বলল, 'পেলে হবি? মারাদোনা হবি?' দাদার জামাকাপড় গুছিয়ে রাখার কাজ চাপিয়ে গেল ডাইনিটা, 'ঠিকঠাক না হলে ফিরে এসে মজা দেখাব।' আর দাদা খ্যাকখ্যাক হাসল, 'শুনলি তো পাপ্পা!' পাছে সে বেরতে না পারে, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে বেরল বাবা।

ওরা ফেরার পর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে যখন মাঠে এসেছিল সজল, তখন টিম শেষ মিনিটের গোলে হেরে যাওয়ার শোকে মুহ্যমান। সঙ্গে আক্ষেপ, 'পাপ্পা থাকলে ম্যাচটা এভাবে হারতে হত না।' পাপ্পার মুখে সব শুনে টোটো সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, 'মন খারাপ করিস না...পরের মাসে বিরাটিতে একটা টুর্নামেন্ট আছে শুনছি... তখন তরুণ সংঘ-র সঙ্গে হিসেবটা মিটিয়ে দেব।'

পাপ্পার প্রতিক্রিয়ায় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল বন্ধুরা। 'তার আগে বাড়ির হিসেবটা মিটিয়ে দেওয়া দরকার।'

BanglaBook.org

—মানে? হিসেব মিটিয়ে দেওয়া মানে?

—আগে বল, গতকাল তোরা কে কে 'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক' দেখেছিস?

পাপ্পার প্রশ্নের উত্তরে রাজা-টোটো-বুড়োরা মাথা নেড়েছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ... দেখেছি তো। কেন?'

—ওই সিনটা দেখলি? কোকের ক্যানটা নিয়ে পয়সা দেওয়ার সিনটা?

'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক'। আটের দশকের শেষদিকে টিভিতে শুরু হওয়া যে নিউজ় সিরিজ় প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল সেসময়। সে রাজনীতিই হোক বা খেলাধুলোর জগৎ বা বিনোদনের দুনিয়া, বিশ্বে গত সাতদিনে গুরুত্বপূর্ণ যা যা কিছু ঘটেছে, তার হরেক ঝলক প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় উঠে আসত দূরদর্শনে। প্রণয় রায়ের স্মার্ট ঝকঝকে পরিবেশনা আলাদা মাত্রা দিয়েছিল প্রোগ্রামে। ভারতীয় টিভি-তে এই ধরনের নিউজ় সিরিজ় সেই প্রথম। বড়রাও দেখতেন, তবে বিশেষত সেসময়ের স্কুল-কলেজপড়ুয়াদের কাছে নেশার মতো হয়ে উঠেছিল 'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক'। শুক্রবার রাত আটটা মানেই তখন টিভি এবং প্রণয় রায়।

পাপ্পা গতকালের এপিসোডটার কথা বলছিল। সে বছরই, '৯৩ সালে, রিলিজ় করেছিল মাইকেল ডগলাস অভিনীত হলিউড থ্রিলার 'ফলিং ডাউন'। সুপারহিট এই ছবির একটা বিখ্যাত দৃশ্য গতকাল দেখানো হয়েছে 'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক'-এ। একটা মাঝারি সাইজের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিকের সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন মাইকেল। স্টোরের মালিক একটা বেসবল ব্যাট নিয়ে মারতে যান মাইকেলকে। ব্যাটটা কেড়ে নেন মাইকেল। দোকানের অর্ধেক জিনিসপত্র ওই ব্যাট দিয়েই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। তারপর একটা কোকের ক্যান তুলে নেন দোকানে রাখা একটা শেলফ থেকে। কোকের দাম হিসেবে দোকানের ক্যাশবক্সে পঞ্চাশ সেন্ট রেখে দেন। এবং কিছুই যেন ঘটেনি, এমন একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে যান দোকান থেকে। কোকের ক্যানে চুমুক দিতে দিতে।

রাজা বলে উঠল, 'হ্যাঁ... ওটা হেব্বি ছিল। দোকানটার বারোটা বাজিয়ে দেওয়ার পর কী স্মার্টলি কোকের ক্যানটা নিল। আর দামটা দিয়ে কী ক্যাজুয়ালি বেরিয়ে গেল! কিন্তু তুই ওই সিনটার কথা হঠাৎ বলছিস কেন?'

পাপ্পা হেঁয়ালি-মেশানো উত্তর দেয়, 'ওটাও প্ল্যানের মধ্যে থাকবে।'

টোটো বলে ওঠে, 'আরে প্ল্যানটা তো বল! কী প্ল্যান, কিসের প্ল্যান?'

অপরাধবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল শিশু বা কিশোরমনের অপরাধপ্রবণতা। যা নিয়ে সেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত কত যে গবেষণা হয়েছে, হয়ে চলেছে নিরন্তর, তার ইয়ত্তা নেই কোনও। শিশু-কিশোরদের 'অপরাধী' হয়ে ওঠার নেপথ্য

BanglaBook.org

কারণগুলি নিয়ে যুক্তি-তর্ক-ব্যাখ্যা আছে এত, যে নির্যাসটুকু লিখতে গেলেই আস্ত একটা বই হয়ে যায়।

একটা বিষয়ে অবশ্য অপরাধ-গবেষকরা সকলেই কম-বেশি সহমত, শিশু বা কিশোরদের ঘটানো প্রতিটি অপরাধ তাদের পটভূমির বিচারে এতটাই আলাদা, চরিত্রবৈশিষ্ট্যে এতটাই ভিন্ন, যে নির্দিষ্ট কোনও কারণ বা কারণসমূহকে চিহ্নিত করা কঠিন।

কিংবদন্তিসম ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ ক্যাথরিন ব্যানহাম তাঁর বহুপঠিত প্রবন্ধ 'Factors Contributing to Juvenile Delinquency'-তে স্পষ্ট লিখেছেন, 'Each juvenile offense is the outcome of complexity of causes, some of whose origins date back years before the committal of the offense and other whose origins are more obviously and immediately connected with the act of delinquency. It has been shown that a different set of causes is involved in each individual case. It is impossible therefore to state the group of causes which will invariably result in any particular offence.'

সাধারণভাবে তবু কিছু 'কমন' কারণ উঠে আসে শিশু-কিশোরদের অপরাধমনস্কতা বিষয়ক গবেষণায়। ছোটবেলায় যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া বাচ্চাদের মধ্যে ভবিষ্যতে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গিয়েছে বহুক্ষেত্রে। তেমনই বাবা-মায়ের অসুখী দাম্পত্য এবং তজ্জনিত অশান্তির সাক্ষী থাকা ছেলেমেয়েদেরও দেখা গিয়েছে অপরাধে জড়িয়ে পড়তে। সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা যায় আরও বহুবিধ। মা-বাবার বিচ্ছেদের সাক্ষী থাকা, অভিভাবকদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত স্নেহ-ভালবাসা না পাওয়া, সহোদর ভাইবোনের সঙ্গে সুসম্পর্কের অভাব ইত্যাদি প্রভৃতি।

কারণ চিহ্নিত করা গেলেও ক্ষেত্রবিশেষে নির্মূল করা যায় না শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা, এমন ধারণাও পোষণ করেন অনেকে। এঁদের মতে, কেউ কেউ জন্মায়ই অপরাধপ্রবণতা নিয়ে। অপরাধে জড়িয়ে পড়ার জন্য কোনও কারণ বা অনুঘটকের প্রয়োজন হয় না জন্মগতভাবে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের।

সত্যিই কি 'বর্ন ক্রিমিনাল' বলে কিছু হয়? অপরাধবিজ্ঞানের জনক হিসেবে যিনি স্বীকৃত, যিনি বিজ্ঞান আর নৃতত্ত্বকে একসূত্রে বেঁধে অপরাধ-গবেষণার নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন, সেই ইতালীয় মনস্তত্ত্ববিদ সিজার ল্যামব্রোজো লিখেছিলেন, 'many individuals are born with perverse propensities, regardless of their parents, attempts to turn them around.'

সজলের বেড়ে ওঠার দিনগুলো যেভাবে কেটেছিল, সেই নিরিখে বিচার করলে 'বর্ন ক্রিমিনাল'-এর গোত্রে কোনওভাবেই ফেলা যায় না তাকে। একটু ভালিয়ে ভাবলে বরং মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের কথা। লোভ সামলানো যায় না গল্পটির কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়ার।

'তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই,

BanglaBook.org

কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে-মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের কাছে নরক।'

গল্পের ফটিকের সঙ্গে বাস্তবের সজলের অমিল বিস্তর। ফটিক মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল না। শান্তশিষ্ট ছোটভাই মাখনের উপর তার 'দাদাগিরি'-তে মা মাঝেমাঝে রুষ্ট হতেন, এই পর্যন্তই। ফটিক স্বেচ্ছায় কলকাতায় মামার বাড়িতে এসেছিল। মামীর ঔদাসীন্য অসহনীয় বোধ হওয়ায় সে মামার বাড়ি থেকে মরিয়া যাত্রা শুরু করেছিল 'মাতৃভবনের' উদ্দেশে। মধ্যপথে ঘোর অসুস্থ হয়ে পড়ে ফিরতে হয়েছিল মামার বাড়িতেই। খবর পেয়ে যতক্ষণে ছুটে এসেছিলেন মা, ততক্ষণে ফটিকের 'ছুটি'-র সময় হয়ে এসেছিল।

কোথায় ফটিক আর কোথায় সজল! আট বছর বয়স থেকে বাধ্যতই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল সজল। 'মাতৃভবন' থেকে চলে আসার পর আর ফেরা হয়নি। বাবা আর সৎমায়ের নিস্পৃহতা-নিষ্ঠুরতা এবং লাগাতার অযত্ন-অনাদর-অবহেলা কিশোর সজলকে দিক্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল।

প্রেক্ষিত-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা ঠিকই। তবু বয়ঃসন্ধির কিশোরের যে অস্তিত্ব-সংকট, পরিপার্শ্বের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার যে তাগিদ, সেই মোহনাতেই যেন অনেকটা মিশে যায় কল্পনার ফটিক আর রক্তমাংসের সজল।

'ছুটি' সজলেরও হয়ে গিয়েছিল, সুস্থ জীবন থেকে। তার অভিমান জমতে জমতে পরিণত হয়েছিল ক্ষোভে। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে রাগে। রাগ সঞ্চিত হতে হতে প্রতিশোধস্পৃহায়। বন্ধুদের সঙ্গে ছক কষতে বসেছিল বাড়ির 'হিসেবটা মিটিয়ে দেওয়ার'।

– –প্ল্যানটা তো বল?

– –বলছি। আগে তোরা বল? তোরা সঙ্গে আছিস তো...

BanglaBook.org

সমস্বরে উত্তর এসেছিল বন্ধুদের থেকে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! বল না কী কী করতে হবে!'

সজল খুলে বলেছিল তার পরিকল্পনা। সব শুনে রঞ্জিত বলেছিল... 'দে শালা শেষ করে, কুত্তার জীবন কাটাচ্ছিস, এবার এসপার-ওসপার। আর তোর বাবা, সৎমা আর সৎদাদাটা ফুটে গেলে ফ্ল্যাটটা তোর। সব সম্পত্তিও তোর। মিটিয়ে দে শালা হিসেব।'

—হুঁ... কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, সজল বলেছিল, কী কী লাগবে, তার একটা লিস্ট করা দরকার। গ্লাভস, নারকেল দড়ি, ছুরি, ভোজালি...

—কাজটা করবি কবে?

—আমি বলব তোদের। পুজো আসছে। পাড়ার প্যান্ডেলে রাত অবধি কাজ হয়। লোক থাকে। এসময় রিস্কি হয়ে যাবে।

—তা হলে?

—পুজোটুজো মিটে যাক। শীতটা পড়ুক। সময়টা ভেবে রেখেছি অবশ্য। দাদার এখন ফার্স্ট ইয়ার। কলেজ থেকেই টিউশনিতে যায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা। বাবার অবশ্য আরও দেরি হয় ফিরতে। তোরা ঢুকবি সাড়ে আটটা নাগাদ। ওটাই পারফেক্ট টাইম।

২২ নভেম্বর, ১৯৯৩। সোমবারের রাত। ঘড়িতে সাড়ে আটটা। 'পারফেক্ট টাইম'।

শুভম অ্যাপার্টমেন্টের বসার ঘরে বসে নিয়তি টিভি দেখছেন। সজল রয়েছে ভিতরে নিজের শোবার ঘরে। পাঁচতলায় ফ্ল্যাট নম্বর ৪/এ-তে বেল বাজল ঠিক আটটা পঁয়ত্রিশে। নিয়তি দরজা খোলামাত্র রাজা-বুড়ো-দেবা-রঞ্জিত ঢুকে পড়ল ঘরে। নার্ভ ফেল করল টোটোর, নারকেল দড়ি আর গ্লাভস যে জোগাড় করেছিল। ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। ঢুকল না । ফিরে গেল বন্ধুরা ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর।

নিয়তি অবাক। এদের মুখ চেনেন। পাড়ারই বা আশেপাশের এলাকার ছেলেছোকরা। পাপ্পার বন্ধু এরা। একসঙ্গে ফুটবল খেলে। এত রাতে এভাবে সবাই মিলে হঠাৎ? হাতের ব্যাগ থেকে ওগুলো কী বার করছে ওরা? দড়ি আর ছুরি না? চিৎকার করতে যাওয়ার আগেই পেছন থেকে এসে নিয়তির মুখ চেপে ধরল সজল। বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্ল্যানমাফিক বেরিয়ে এসেছে বাইরের ঘরে।

ভিতরের দুটো বেডরুমের একটায় নিয়ে আসা হল নিয়তিকে। গলার কাছে ছুরি ধরে রইল দেবাশিষ। একটা চেয়ারের সঙ্গে নিয়তিকে বেঁধে ফেলা হল। মুখে কাপড় গুঁজে দিল রঞ্জিত। আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাওয়া সৎমায়ের চোখে চোখ রেখে সজল বলল, 'অনেক মজা দেখিয়েছিস না এতদিন আমাকে? আজ তোদের মজা দেখাব। তোর ডাইনিগিরি জন্মের মতো ছুটিয়ে দেব আজ!'

BanglaBook.org

কলিংবেলের আওয়াজ ফের ন'টা চল্লিশে। তার আগে ঘরের গোটাতিনেক আলমারি তছনছ করা হয়ে গেছে। সঙ্গে আনা ব্যাগে বেশ কিছু গয়নাগাটি নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুড়ো। ফ্ল্যাটে সজলের সঙ্গে রয়ে গেছে রাজা-দেবা-রঞ্জিত। এবার দরজাটা সজল খুলল। কাঁধে কলেজের ব্যাগ নিয়ে কাজল ঘরে ঢুকতেই সজল দ্রুত বন্ধ করে দিল দরজা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাজলের গলায় ভোজালি ঠেকিয়ে দিল দেবা। চেয়ারে বসিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজটা দ্রুত সারল রাজা-রঞ্জিত। সৎদাদার মুখে কাপড় গুঁজে দিতে দিতে সজল শাসাল, 'এতদিন তো শুধু পাঁউরুটির মাখন-লাগানো দিকটাই খেয়ে এসেছিস। আজ দেখবি, সেঁকা দিকটা খেতে কেমন লাগে!'

এবার সুবলের জন্য অপেক্ষা। যিনি ফিরলেন সাড়ে এগারোটায়। এবারও দরজা খুলল সজলই। এবং ঢোকামাত্রই বসার ঘরে অপেক্ষমাণ রাজা-দেবা-রঞ্জিত মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবলের উপর, 'একটা শব্দ করলে পেটে ভোজালি ঢুকিয়ে দেব কিন্তু... চুপ... একদম চুপ!'

প্রাথমিক কাজ শেষ। ভিতরের দুটো ঘরে চেয়ারে বসা তিনজন। একটায় নিয়তি। অন্যটায় সুবল-কাজল। তিনজনেই হাত-পা বাঁধা এবং মুখে কাপড়-গোঁজা অবস্থায়। বাবা এবং সৎদাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সজল, 'তোমাদের ব্যবস্থা একটু পরে করছি। আগে ডাইনিটাকে খালাস করে আসি।'

নিয়তি চেয়ারে বসে কাঁপছিলেন। সজল সজোরে গলা টিপে ধরল সৎমায়ের। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল নিয়তির। শ্বাসরোধ, মৃত্যু।

আরও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু অপেক্ষায় ছিল সুবল-কাজলের। প্রথমে বাবা। তারপর সৎদাদা। ছুরি-ভোজালি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ চালাল সজল। সঙ্গত দিল রঞ্জিতও। গলায়-বুকে-ঘাড়ে-পেটে একাধিক আঘাত ধারালো অস্ত্রের। প্রবল রক্তপাত, মৃত্যু।

মূল 'অপারেশন' কমপ্লিট। পুরোটাই গ্লাভস পরে, যাতে হাতের ছাপ না পাওয়া যায় কোথাও। বন্ধুদের সঙ্গে বসার ঘরে এল সজল। এবার প্ল্যানমতো একটা ডাকাতির চেহারা দেওয়া দরকার পুরো ঘটনাকে। কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে যে। একটু কিছু খাওয়া দরকার। ফ্রিজে সন্দেশ ছিল এক বাক্স। বার করে ধীরেসুস্থে মিষ্টিগুলো খেল চার বন্ধু। ভিতরের দুটো ঘরে তখন তিনটে মৃতদেহ। একটা ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তস্রোতে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর সজল বলল, 'এবার পয়সাটা রাখতে হবে। "ওয়ার্ল্ড দিস উইক"-এ সেই সিনটা দেখেছিলাম না? হিরোটা দোকান ভেঙেছিল। কিন্তু কেকটার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। এখানেও ডাকাত এসেছিল। ফ্রিজ থেকে বের করে মিষ্টি খেয়েছিল। আর মিষ্টির টাকা টেবিলে রেখে গিয়েছিল... ক্লিয়ার?'

দু'-পাঁচ টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা মিলিয়ে কুড়ি টাকার মতো জমা হল বসার

BanglaBook.org

ঘরের সেন্টার-টেবলে। ছুরি-ভোজালি থেকে রক্তের দাগ তেল-জল দিয়ে ধুয়ে ফেলে একেবারে সাফসুতরো করে রাখা হল সোফার উপর।

আর একটাই কাজ বাকি। সজল বলল, 'নে, এবার বাঁধ আমাকে।' সজলকেও চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল রাজা-দেবা-রঞ্জিত। কিন্তু এতটাই আলতো করে, যে তিন বন্ধু বেরিয়ে যাওয়ার পরেও যাতে স্বচ্ছন্দে ভিতর থেকে দরজাটা লক করতে পারে সজল।

টিভি চলছিল। রাতটা সজল কাটাল মূলত টিভি দেখেই। ভোরের দিকে ঝিমুনি এলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ল হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। পাশের দুটো ঘরে পড়ে থাকল বাবা-সৎমা-সৎদাদার লাশ।

সজল চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল পরের দিন দুপুর দেড়টা নাগাদ। ধাক্কা দিতে লাগল দরজায়। প্রতিবেশীরা সে আওয়াজ শুনলেন। পাপ্পা 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চেঁচাচ্ছে ভিতর থেকে। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ফোন গেল দমদম থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভাঙল। সুবল-নিয়তি-কাজলের লাশ উদ্ধার হল। মুক্ত করা হল চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থাকা সজলকেও। যে তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে সবার দিকে। এতটাই যেন আতঙ্কগ্রস্ত, কথাই বেরচ্ছে না মুখ থেকে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন একঝাঁক আইপিএস। উত্তর ২৪ পরগনার এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, ডিআইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ), আইজি (দক্ষিণবঙ্গ), ডিআইজি (সিআইডি)। কেসের তদন্তভার বর্তাল সিআইডি-র ওপর।

তবে সত্যি বলতে সজল যে আষাঢ়ে গল্পটা বানিয়েছিল, তাতে তদন্তকারীদের কাজটা নেহাতই সহজ হয়ে গিয়েছিল। সজল এক দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের গল্প ফেঁদেছিল। সাতজন ঢুকেছিল। যাদের মধ্যে দু'জন প্রকাণ্ড চেহারার পাঞ্জাবি। সাতজনই হিন্দিতে কথা বলছিল। ওই দুই পাঞ্জাবি সহ সাতজনেরই মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। সুবল-নিয়তি-কাজলকে মেরে ফেলার পর ওরা সজলকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার আগে তার মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারে। সে অজ্ঞান হয়ে যায়। পরের দিন দুপুরের দিকে জ্ঞান ফিরলে সে দরজায় ধাক্কা দেওয়া শুরু করে। চিৎকার করতে শুরু করে।

এ গল্প ক্লাস ফাইভের বাচ্চাই বিশ্বাস করবে না, তো পুলিশ! কয়েকটা মাত্র প্রশ্ন করা হল সজলকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দরজা ভিতর থেকে লক করলে কী করে? তা ছাড়া তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, তা হলে কে লক করল? ডাকাতরা কুপিয়ে মারল দু'জনকে। গলা টিপে খুন করল আরেকজনকে। তোমার গায়ে আঁচড়টুকুও পড়ল না। এত নরমসরম ভাবে তোমাকে বেঁধে রেখে গেল, যে ইচ্ছে করলেই তুমি দরজা লক করতে পারতে। শুধু তোমারই প্রতি এত মায়াদয়া কেন ডাকাতদের? তা ছাড়া ডাকাতি করার পর অস্ত্রশস্ত্র এত পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখে গেছে ডাকাতরা, এটাই বা কে কবে শুনেছে?

BanglaBook.org

একটা প্রশ্নেরও সদুত্তর ছিল না সজলের কাছে। প্রথম দু'দিন শোকগ্রস্ত থাকার অভিনয় করে কাটাল। বয়ান বদলাল একাধিকবার। কিন্তু ওই আজগুবি গপ্পো আর সিআইডি অফিসারদের কাছে কতক্ষণ টিকবে? টিকলও না। তৃতীয় দিনেই এল স্বীকারোক্তি। সব খুলে বলল সজল।

শুভ্রশীল রায়, ডাকনাম রাজা। সমর সাহা ওরফে বুড়ো। অলোক সাহা, ডাকনাম টোটো। দেবাশিষ দে আর রঞ্জিত মণ্ডল। সবাই নাবালক। বয়স ওই ষোলো-সতেরোর মধ্যে। স্কুলপড়ুয়া সবাই। রাজা-বুড়ো-টোটো-দেবাশিষকে ধরতে এতটুকুও বেগ পেতে হল না পুলিশকে। রঞ্জিত ছিল বর্ধমানে এক আত্মীয়ের বাড়ি। তুলে আনা হল। ছুরি-ভোজালি রঞ্জিতই মধ্য কলকাতার একটি দোকান থেকে জোগাড় করেছিল এক পরিচিতের মাধ্যমে।

ষোলো বছরের এক কিশোর তারই সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে কীভাবে ছক কষেছিল বাবা-সৎমা-সৎদাদাকে হত্যার, খুনের পরে তিনটে লাশের সঙ্গে কী অবলীলায় রাত কাটিয়েছিল নির্বিকার, প্রকাশ্যে এল সব। আইজি (দক্ষিণবঙ্গ) প্রেসকে বললেন, 'The brutality is difficult to digest even for hard-boiled cops like us.'

মামলার বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হচ্ছিল রোজ। বেরচ্ছিল মনোবিদদের নিবন্ধ। বাসে-ট্রামে-মাঠে-ঘাটে-রকের আড্ডায় তখন একটাই আলোচনা। সজল বারুই। ঘটনার ভয়াবহতায় আমূল নড়ে গিয়েছিল কলকাতা সহ পুরো রাজ্যই। বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা নিয়ে রাতারাতি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন অভিভাবকরা।

একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন এবং প্রমাণ লোপাট। এই ছিল মামলার ধারা। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে বিশেষ কাঠখড় পোহাতে হয়নি তদন্তপর্বে। গয়নাগাটি সবই উদ্ধার হল অভিযুক্তদের কারও না কারও বাড়ি থেকে। গয়নাগুলো যে তাদের বাড়িরই, চিহ্নিত করল খোদ সজলই। একটা পলিথিনের প্যাকেটে গ্লাভস আর কাপড়ের টুকরো ফেলে দিয়েছিল রাজা, দমদমের এইচএমভি ফ্যাক্টরির ভিতরে। উদ্ধার হল সেই প্যাকেট। যে দোকান থেকে ছুরি-ভোজালি কিনেছিল রঞ্জিত, গ্লাভস আর দড়ি টোটো কিনেছিল যেখান থেকে, চিহ্নিত হল দুটোই। চার্জশিটে এতটুকু ফাঁকফোঁকর ছিল না।

জেলা আদালতের রায় বেরিয়েছিল '৯৫ সালে। প্রায় দুই বছর ধরে চলা বিচারপর্বে একদিনের জন্যও বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত মনে হয়নি সজল আর তার পাঁচ বন্ধুকে। বিচার চলাকালীন জেল থেকে যখন আদালতে আনা হত ওদের, প্রিজন ভ্যান থেকে ছয় নাবালক অভিযুক্ত নামত হাসতে হাসতে। জেলে ফিরেও যেত খোশমেজাজে, হিন্দি ফিল্মের হিট গান গাইতে গাইতে। কোনওদিন শাহরুখ খানের 'বাজিগর'-এর "ইয়ে কালি কালি আঁখে", তো অন্যদিন সলমন খানের 'সাজন'-এর "দেখা হ্যায় পহেলি বার..."।

যেদিন রায় বেরিয়েছিল, উৎসুক জনতার ভিড় সামলানোর জন্য বারাসতের আদালতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল। সেদিনও হাসতে হাসতেই পুলিশের ভ্যান থেকে

BanglaBook.org

আদালতে সজল আর শুভ্রশীল

নেমেছিল সজলরা। চোখেমুখে কোনও ভয়ডরের চিহ্ন তো ছিলই না, বরং শরীরী ভাষায় ফুটে উঠেছিল একটা নেই-পরোয়া মেজাজ, 'যা করেছি বেশ করেছি... দিক যা শাস্তি দেওয়ার।'

সজল-রঞ্জিতকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন বিচারক। বাকিদের যাবজ্জীবন কারাবাস। অলোক সাহা ওরফে টোটোর আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছিলেন, টোটো তো ফ্ল্যাটের দরজা থেকে ফিরে গিয়েছিল। সে কেন শাস্তি পাবে? বিচারক মানেননি এ যুক্তি। বলেছিলেন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে (১২০বি, আইপিসি) যুক্ত থাকা এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনায় (৩৪ আইপিসি) শরিক হওয়ার দায় অলোক এড়াতে পারে না।

যখন বিচারক রায় পড়ে শোনাচ্ছিলেন, আসামিদের জন্য নির্দিষ্ট কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টায় সময় কাটিয়েছিল সজল আর তার পাঁচ বন্ধু। যখন শেষমেশ সাজা শোনানো হল, মুখে আঙুল পুরে শিস দিয়ে উঠেছিল সজল। আর হাততালি দিয়ে উঠেছিল রাজা-টোটো-বুড়ো-দেবা-রঞ্জিত। ব্যাপার দেখে কথা হারিয়ে ফেলেছিল ভিড়ে ঠাসা বিচারকক্ষ। এবং সাজা ঘোষণার পর অন্যদিনের মতোই দিব্যি ফুরফুরে মেজাজে জেলে ফেরার ভ্যানে উঠেছিল ওরা ছ'জন। অন্যদিনের মতোই হিন্দি গানের লাইন গুনগুন করতে করতে! অকল্পনীয়! সিনেমাতেও কেউ কখনও দেখেনি এমনটা!

হাইকোর্টে সাজা মকুবের আবেদন জানিয়েছিল সজলরা। এক বছরের আইনি চাপানউতোরের পর হাইকোর্ট সজল আর রঞ্জিতকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। বরাদ্দ হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাস। বাকি পাঁচ অভিযুক্তের কারাবাসের মেয়াদও কমেছিল। যাবজ্জীবন থেকে কমে কারও তিন বছর, কারও পাঁচ, কারও বা সাত।

BanglaBook.org

শুরুর কয়েক বছর সজল ছিল দমদম সংশোধনাগারে। তারপর তাকে স্থানান্তরিত করা হয় মেদিনীপুরের সংশোধনাগারে। যেখানে সজল হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। বলে, পেটে প্রবল ব্যথা হচ্ছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় কিডনির সামান্য সমস্যা ধরা পড়ে। নিয়ে আসা হয় কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। সেটা ২০০১-এর সেপ্টেম্বর। চিকিৎসাধীন থাকাকালীন এক রাতে প্রহরারত দুই কনস্টেবলকে বোকা বানিয়ে হাসপাতাল থেকে চম্পট দেয় সজল। ২০০৩-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সে ছিল পলাতক। বহু চেষ্টাতেও সন্ধান পায়নি পুলিশ।

'ফেরার' থাকার এই প্রায় দেড়টা বছর কীভাবে কাটিয়েছিল সজল? হাসপাতাল থেকে পালানোর পর সজল পাড়ি দিয়েছিল মুম্বই। সেখানে টুকটাক ক্রাইম করেই হত দিন-গুজরান। মুম্বইতেই সেরে ফেলেছিল বিয়েটা। মেয়ে হয়েছিল বছরখানেক পর।

২০০২-এর শেষের দিকে কলকাতায় ফেরে সজল। মুম্বইয়ে বড্ড খরচ, পোষাচ্ছিল না আর। লেকটাউন এলাকার এক দাগি দুষ্কৃতীর দলে ভিড়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। হাত পাকানো শুরু করে তোলাবাজিতে। স্রেফ খুচরো তোলাবাজিতে বেশিদিন অবশ্য সন্তুষ্ট থাকতে চায়নি সজল। আর সেটাই কাল হয়েছিল। সিবিআই অফিসার সেজে সল্টলেকের একটা বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করল ২০০৩-এর জানুয়ারিতে। সেই মামলাতেই সপ্তাহদুয়েকের মধ্যেই নাম উঠে এল জনৈক শেখ কালামের। সোর্স মারফত খবর পেয়ে এই কালামকে ধরল পুলিশ। এবং ধরামাত্রই চেহারা দেখে বুঝতে পারল, শেখ কালামটা আসলে নাম। এ সজল। প্রায় দেড় বছর ধরে ফেরার সজল বারুই!

২০১০: এ জামিনে মুক্তির পর সজল

এরপর? ফের দীর্ঘ কারাবাস। 'দ্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ

BanglaBook.org

চিলড্রেন) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট'-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০১০ সালে সজলের আইনজীবী আদালতে জামিনের আর্জি জানালেন। বললেন, সজলের কারাবাসের ষোলো বছর অতিক্রান্ত। কিশোর বয়সে জড়িয়ে পড়েছিল অপরাধে। নিজেকে সংশোধনের একটা আইনানুগ সুযোগ প্রাপ্য বর্তমানে তেত্রিশ বছরের সজলের। আবেদন মঞ্জুর করেছিল হাইকোর্ট। ২০১০ সালের ১০ অগস্ট জামিনে জেলের বাইরে পা রেখেছিল সজল।

নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছিল সজল। তবে ব্যবহার করেনি সে সুযোগ। ২০১১-য় যোধপুর পার্কের এক গেস্ট হাউসে দেড় লক্ষ টাকার ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। দ্রুতই ঘটনার কিনারা করেছিল লালবাজার। দু'জন ধরা পড়েছিল। যারা কবুলও করেছিল অপরাধ, এবং যাদের জেরায় জানা গিয়েছিল, বিকাশ নামে একজন এই ডাকাতির মাস্টারমাইন্ড। পুরো ছকটা বিকাশেরই। ধৃতদের থেকে চেহারার বর্ণনা শুনে আঁকানো হয়েছিল স্কেচ। যে স্কেচ দেখে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল ডাকাতি-দমন শাখার ওসি-র। আরে, এই ছবিটার সঙ্গে সেই ছেলেটার ছোটবেলার মুখচোখ আর ফিচার্স অনেকটা মিলে যাচ্ছে না? সেই ছেলেটা, যে নাইন্টি থ্রি-তে দমদমে নিজের বাবা-সৎমা-সৎভাইকে খুন করেছিল বন্ধুদের সঙ্গে মিলে?

ক্রাইম রেকর্ডস সেকশন থেকে সজল বারুইয়ের ছবি এনে দেখানো হয়েছিল ধৃতদের। যারা ছবি দেখেই চিনেছিল, 'এটা বিকাশেরই ছোটবেলার ছবি... হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিকাশ।' মিলে গিয়েছিল ওসি-র আন্দাজ, 'যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। শরীরে একটু মাংস লেগেছে, কিন্তু বাকি চেহারাটা এতদিনেও বিশেষ পালটায়নি। বিকাশটা ভুয়ো নাম। এটা মোস্ট প্রোবেবলি সজল। সজল বারুই।'

এই ডাকাতির মামলায় বেশ কয়েক বছর জেল খাটার পর সজল মুক্তি পেয়েছিল ২০১৭-য়। তারপর থেকে বাইরেই আছে। নতুন কোনও অপরাধে তার নাম এখনও পর্যন্ত জড়ায়নি। ষোলো বছর বয়সে যে অভাবনীয় কাণ্ড সে ঘটিয়েছিল, তাতে আজ এই প্রায় তিন দশক পরেও 'সজল বারুই' পরিচয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভবই। অন্য কোনও নামে, অন্য কোনও পরিচয়ে নিজের মতো করে হয়তো চেষ্টা করছে সুস্থ জীবনে ফিরতে। ভাল হলেই ভাল।

অপরাধ-মনস্তত্ত্বের কত যে রসদ মজুত এই মামলায়! ভাবলে অবাক লাগে, সজল বারুইয়ের না হয় যথেষ্ট কারণ ছিল সুবল-নিয়তি-কাজলের সঙ্গে 'হিসেব' মিটিয়ে দেওয়ার। কিন্তু বাকি বন্ধুদের? শুভ্রশীল-অলোক-রঞ্জিত-দেবাশিষ-সমরের? ওদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর হয়েছিল প্রচুর। লেখালেখিও হয়েছিল অনেক। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর স্কুলপড়ুয়া সব। কোনও শারীরিক-মানসিক সংকট আপাতদৃষ্টিতে নেই যাদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকায়। তবু

BanglaBook.org

রাজি হয়ে গেল ষড়যন্ত্রে, তিনটে জলজ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলার পরিকল্পনায়? শুধুই বন্ধুর প্রতি ভালবাসায় হয় এটা? সম্ভব? নাকি অপরাধপ্রবণতার অঙ্কুর নিজেদের অজান্তেই ওদের কিশোরমনেও ঘাঁটি গেড়েছিল কোনও কারণে?

উত্তর মেলে না। বিদগ্ধ গবেষণায় বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মানবমনের সব গহনের, সব দহনের হদিশ মিললে তো হয়েই যেত। হয়েই যেত মনের পাসওয়ার্ড 'হ্যাক' করা।

সেটা হয় না বলেই না মন! মনের চলাচলের উপর কে আর কবে প্রভুত্ব করতে পারে? মনই কি কখনও পায় মনের সম্পূর্ণ মালিকানা?

জনপ্রিয় গানের লাইন মনে পড়ে যায়।

মন বলে আমি মনের কথা জানি না!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নির্দেশিকা

অদ্রীশ বর্ধন ১৪৬
অনিন্দিতা দাস ৫৪
অনিন্দ্য ঘোষ ৬৮, ৬৯, ৭১-৭৪, ৭৯
অপারেশন শ্যামল ১৮
অভিজিৎ ভৌমিক ৫৫- ৫৭, ৬১, ৬৩-৬৫,৭৯
অভিষেক/অ্যাবি ১৩১, ১৩২
অরিজিৎ ৪০, ৪১
অরুণিমা ৩৬
অরুণ কাটিয়াল ৩৫, ৩৬
অলকা বসু ১০৩, ১০৭, ১১৫
অশোক ৮৪, ৮৫
অ্যারেস্ট রেজিস্টার ৪২, ৪৩, ৪৯
অ্যালকালি/ আইসিআই ফ্যাক্টরি ৪, ৯

আইএমইআই নম্বর ৬২, ৬৭
আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য অ্যাকিউজ্‌ড ১৪৫
আইরিশ দূতাবাস, দিল্লি ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪
আগাথা ক্রিস্টি ১৪৬
আজাদ ৯৭-১০১
(ডা.) আফরোজ আলম ১৩১, ১৩৪, ১৩৫
আমির খান ১০৮
আয়ারল্যান্ড ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৮

ইউনাইটেড ভেজিটেবলস ৯
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ২৩, ২৪
ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ১৩০, ১৩৩

উইমেন্স গ্রিভান্স সেল ১৪১
উইলিয়ামস ১৩০, ১৩১, ১৩৩-১৩৫
উত্তরপ্রদেশ ৫৮, ৬২, ৭৭, ৭৯
উল্টোডাঙা ৩৯, ৪০

এইচএমভি ফ্যাক্টরি, দমদম ১৬২
এনআইসি (ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার) ১৪১, ১৪৩, ১৪৫
এভিডেন্স রিকভারি ভ্যান ৫৭
এসটিএফ (স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স) ৬৯, ৭০

কবিতা গুপ্তা/ মিসেস গুপ্তা ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮-৪০
কবীর সুমন ৬৬
'কয়ামত সে কয়ামত তক' ১০৮
কল মনিটরিং সেল ১৬, ১৭
'কলিযুগ' ২২, ২৩
কাঁচড়াপাড়া ৫২, ৫৩, ৬২, ৬৫, ৬৭, ৭২, ৭৭
কাঁচড়াপাড়া বাজার ৫৩
কাঁচড়াপাড়া স্টেশন ৫৯, ৭৮
কাঁসিরাম নগর ৭০
কাজল (বারুই) ১৪৮, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৫
কাঞ্জিলাল দাস ৪
কাদের চক ৬৮
কালীঘাট থানা ১২৯, ১৩৫
কালীঘাট মেট্রো স্টেশন ১৩৪, ১৩৭
কৃষ্ণেন্দু জানা ১১৭, ১১৮, ১২৩-১২৫
কে সি দাশ ১১৮, ১২৪
কোন্নগর আন্ডারপাস ৪, ৯
ক্যাটি মরিসরো ১৩৭
ক্যাথরিন ব্যানহাম ১৫৭
ক্যাফ (কাস্টমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম) ৬৮, ৭১-৭৩

খড়দা থানা ২৮, ২৯, ৪৯, ৫০
খাদিম কর্তা অপহরণ ১০৫
খ্রিস্টান কবরস্থান/ খ্রিস্টান বেরিয়াল গ্রাউন্ড ৮৫-৮৬

গণপত রাম ৭৬, ৭৭, ৮১
'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক' ৭৫
গোপাল রায় ৮৮, ৯০-৯৩, ৯৫- ৯৯, ১০১
গৌরী মুখোপাধ্যায় ১৩৭-১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬

ঘোলা থানা ২৮, ২৯, ৩০, ৩২

চন্দন বসু ৪২, ৪৩, ৪৯, ৫১
চন্দনা দাস / চন্দনাদেবী ৫৩-৫৭, ৬২-৬৪, ৬৬-৭০, ৭৮, ৭৯
চাঁদনি মার্কেট ৬৫
চিংড়িয়া ৬, ৮, ২৫
চিড়িয়া মোড় ১১৩
চিড়িয়া পার্ক ২০

'ছুটি' ১৫৭
'ছোটপাখি'/ ওসি ১০

'জয় বাবা ফেলুনাথ' ১৪৬
জানগরের কবরখানা ৯৮
জামালপুর থানা ৭১, ৭২
জিৎ ঘোষ/ মিঠুন ৪৭-৫১
জিতেন্দর ৬, ২৫, ২৬
জুডিথ/ জুডিথ ফ্লোরেন্স ১২৭, ১২৯-১৪২, ১৪৪-১৪৬
জেক স্টিল ৯

টাওয়ার লোকেশন/ টিএল ১২, ১৭-২১, ৩৩, ৩৫, ৪৩, ৫০, ৬৫, ৬৭, ৭২, ১৩৭
টেম্পল অফ গডেস কালী ১৩০, ১৩৪
টেরেন্স স্ট্যানলি আর্নল্ড/ আর্নল্ড সাহেব ৮৬, ৮৭
টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড/ শনাক্তকরণ প্যারেড ৫০, ৭৯, ৮০
টোটো/ অলোক সাহা ১৪৭-১৪৯, ১৫৫ ১৫৬, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫
ট্রায়াল মনিটরিং টিম ৮০
ট্রানজিট রিমান্ড ৭৬

'ডন' ৯
ডানকুনি ৯
ডানলপ ১৯, ২০
ডাবলিন ১৩০
ডিফেন্সিভ উন্ডস ১৩৬
ডেস্ক্রিপটিভ রোল ৫, ৬

তন্ত্র ১৩১, ১৩৭
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৬
তপনকুমার বিশ্বাস ৩২, ৩৭, ৫০, ৫১
তপসিয়া/ তপসিয়া থানা ৯৩, ৯৪
তরুণ সংঘ ১৪৭, ১৪৮, ১৫৫
তাপস বিশ্বাস ৬৪, ৮০, ৮১
তাপসী ৫, ১৫
তালবান্দা ২৯, ৬৪
তৃষ্ণা বসু ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩ ১৪৫, ১৪৬
ত্রিপাঠীজি ৪১

দমদম ইয়ুথ স্পোর্টিং ক্লাব ১৪৭
দমদম সংশোধনাগার ১৬৪
দশঘরা ৭৪
দিয়া গুপ্তা ৩১, ৩৮
দীপিকা ৩১, ৩৮, ৩৯
দুলাল সোম ১২০, ১২৩, ১২৪
দেবব্রত ঠাকুর ১২০, ১২৩
দেবযানী বণিক ১০৫
দেবাশিষ দে/ দেবা ১৪৭-১৪৯, ১৫৯-১৬৩, ১৬৫
দেবেন্দ্রমোহন পাল ১০৪, ১০৬, ১১৮, ১১৯
'দা ওয়ার্ল্ড দিস উইক' ১৪৯, ১৫৬, ১৬০

দ্য জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড
প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট
১৬৪, ১৬৫

ধনেখালি ৭২-৭৫, ৭৮, ৭৯
ধর্মডাঙা ৪, ৫, ৭, ৯
ধানুপুরা ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৬, ৭৯, ৭৮, ৮১

নলিনী রায় ১৪৬
নাদির ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১
নিউ ব্যারাকপুর ২৯, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০,
৬৫
নিউটাউন ৩৩
নিয়তি (বারুই) ১৫১, ১৫২, ১৫৯, ১৬১,
১৬৫
নিরঞ্জন পাল ৫৪-৫৭, ৬১, ৬৩-৬৫, ৭৯
নীলরতন সরকার হাসপাতাল ৮৮
নেপু/ নেপু গিরি ৬, ৮, ২৫, ২৬
নোয়াপাড়া ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১১৭, ১১৮,
১২২
নোয়াপাড়া থানা ১০৪, ১০৫
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ১৬৪

পানিহাটি মোড় ২৯
পার্ক সার্কাস ৯৭
পার্ক স্ট্রিট থানা ১৩৫
পার্ক হোটেল ১৩১, ১৩৭
পালবাড়ি ১০৪, ১০৬, ১১০, ১১৩, ১১৬,
১১৮, ১২০, ১২২
পি.ও/ প্লেস অফ অকারেন্স ৮৬
পিঙ্কি ৫৯
পুতন ৬, ৮
পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য ১৩৭, ১৩৯
'পেতে' ১, ১১, ২৬
পোর্ট্রেট পার্লে ৬১, ১৪৯
প্রণয় রায় ১৫৬
প্রদীপ্ত রায় ১৪৬
প্রবীর সান্যাল ৬০, ৬১, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৬,
৭৮-৮২, ১২২, ১২৩
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১৪৬
প্রেম পাল ৭৬, ৮১

'ফলিং ডাউন' ১৫৬
'ফুটবল মাঠ' ১১
ফুলমণি ৪৬, ৪৭

'বড়পাখি'/ এসডিপিও ১০
বনওয়ারি সিং ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১
বনগাঁ থানা ৪৩
বলবীর সিং ৭৬, ৭৮, ৮১
বাগুইআটি ১৮, ১৯, ২০, ২৮, ৩৪, ৩৯
বাগুইআটি ফাঁড়ি ৩২
বাঘা/ ভোলানাথ দাশ ৭, ১৩
বাচ্চু দাস ৪, ৫
'বাজিগর' ১৬২
বাদাউন ৬৮, ৬৯, ৭৮
বাদাম সিং ৬৮, ৬৯, ৭১
বাপি খাস্তগির দ্র. বেনারসি বাপি
বাবর আলি মণ্ডল ৬৪, ৬৫, ৮০, ৮১
বাবুলাল সিং ৭৬-৭৯, ৮১, ৮২
বারুজীবী কলোনি ৯, ১৩
বাসুদা ৪৬, ৪৭
বি দাস অ্যান্ড সন্স ৫৩
বিকাশ দ্র. সজল বারুই
বিটি রোড ২৯
বিদ্যুৎ দাস ৫৪, ৫৭, ৬৪, ৮১, ৮২
বিন্দাল ফ্যাক্টরি ৭, ৯
বিমল দাস ৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১-৬৫, ৬৭,
৬৮, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২
বিশ্বজিৎ মণ্ডল ৬৪, ৮০, ৮১
বিহার ১০০
বীজপুর থানা ৫২, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৫,
৬৭, ৬৮
বুড়ো/ সমর সাহা ১৪৯, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০,
১৬২, ১৬৩, ১৬৫

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ৩৭
বেঞ্জামিন বেসরা ১৪১, ১৪২
বেনারসি বাপি ৬, ৭, ৮, ২৩
বেনিয়াপুকুর থানা ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৩
বৈদ্যবাটি খাল ২৬
'বোটি কাবাব' ১১
ব্যারাকপুর ৫২, ৬৪, ৭৬
ব্যারাকপুর দায়রা আদালত ৮১
ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজ ৫৯
ব্যারাকপুর স্টেশন ৪৬, ১১৩, ১১৮
ব্যারাকপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লস ১১৩

ভগবান সিং ৭৬, ৮১
ভবানী ভবন ৪২
ভারতীয় দূতাবাস, আয়ারল্যান্ড ১৪১-১৪৪
ভিআইপি এনক্লেভ, বাগুইআটি ৩০, ৩৪, ৩৮
ভিআইপি রোড ৩০
ভিক্টোরিয়া ১১৩, ১৩০
ভিসি/ ভিডিয়ো কনফারেন্সিং ১৪০-১৪৩, ১৪৫

মনিকা ১৩০, ১৩১, ১৩৫
মনিরুল ইসলাম সরকার ৬০
মনোজ সেন ১৪৬
মন্টু ৬, ৭, ৮
মহেশতলা থানা ২
মাইকেল ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭
মাইকেল ডগলাস ১৫৬
মাইকেলনগর ৩৫, ৪৩, ৪৭
মাদার টেরিজা ১২৯
মাদার হাউস, কলকাতা ১৩০, ১৩১
মিতালি ১৫
মিনতি (বারুই) ১৫১, ১৫২
মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ১২৯, ১৩০
মিসিং ডায়েরি ৩২
মুঘলসরাই ৬, ১৬
মুড়াগাছা ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৩, ৪৯

'মেজোপাখি'/ সিআই/ সার্কেল ইনস্পেকটর ১০
মেডিক্যো-লিগাল একজামিনেশন ১৩৬
মেদিনীপুর সংশোধনাগার ১৬৪
মোবাইল ট্র্যাকার টেকনোলজি ৬৭, ৭৯

রতন তরাই ৬৪, ৮০, ৮১
রঞ্জিত পোদ্দার ৩৯, ৪০
রঞ্জিত মণ্ডল ১৪৮, ১৪৯, ১৫৯-১৬৩,১৬৫
রণধীর বসু/ গদু মাস্টার ১০৭-১২৬
(ড.) রবীন বসু ৮৯, ৯০, ১২২
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ৩২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ পোয়েট টেগোর ১৩০, ১৫৭
রমেশ/ রমেশ মাহাতো ৬, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৬, ২৫
রাইটার্স ৩৭, ৫৯
রাকেশ গুপ্তা/ গুপ্তা স্যার/ গুপ্তাজি/ মিস্টার গুপ্তা ২৮, ৩০-৪৯, ৫১
রাজ ৯৭-১০১
রাজস্থান ৭৬
রাজা / শুভ্রশীল রায় ১৪৭, ১৪৯, ১৫৬, ১৫৯-১৬৩, ১৬৫
রামলোচন ৭৭
রাহুল ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৯
রিষড়া থানা ১
রিষড়া রেলগেট ১, ৩, ৪, ৯
রুডইয়ার্ড কিপলিং ৩৭
রেশমা আলি ৯৩-৯৯

লক্ষ্মী ৪৭-৫১
লছমন সিং/ লছমনচাচা/ লছমন ৮৪-৮৬
লতিকা পাল ১০৪, ১০৬, ১১৮, ১১৯
লালবাগ সংশোধনাগার ১২৬
লেকটাউন ৩৫

শাহ্‌জামল মণ্ডল ৮৮, ৮৯, ৯০
শাহরুখ খান ১৬২
শিবু ৪৬-৫১

শিয়ালদা স্টেশন ৯১, ৯২
শিশুপাল ৬৯-৭২, ৭৬-৭৯, ৮১
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭৫
শুভম অ্যাপার্টমেন্ট ১৫১, ১৫৯
শেখ কালাম দ্র. সজল বারুই
শ্যামলদা /দাদা/ শ্যামল দাস দ্র. হুব্বা
শ্রীকান্ত দে/ দে বাবু ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১
শ্রীদুর্গা কটন মিল, হুগলি ৪

সজল বারুই/ পাপ্পা ১৪৭-১৫৩, ১৫৫-১৬০, ১৬২-১৬৫
সঞ্জীব সুরেকা ৩৫, ৩৬
সতীশ গৌতম ৭৬, ৭৯, ৮১
সত্য ৬
সমীর ভট্টাচার্য ৩২
সলমন খান ১৬২
সল্টলেক ২১
'সাজন' ১৬২
সিআরএস (ক্রাইম রেকর্ডস সেকশন) ১৪৯, ১৬৫
সিজার ল্যামব্রোজো ১৫৭
সিট (স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম) ৫২, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৭০
সিটি সেন্টার, সল্টলেক ২১, ২২, ২৩, ৪৪
সিডি ভ্যান (কর্পস ডিসপোজাল ভ্যান) ৮৭
সিডিআর (কল ডিটেলস রেকর্ড) ৩৩, ৩৫, ৩৬
সুকান্ত রুইদাস ৬৮-৭৪, ৭৯
সুচিত্রা ভট্টাচার্য ১৪৬
সুজয় মিত্র ১২৭, ১৩১-১৩৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৫
সুদীপা পাল/ বুড়ি ১০৫-১২৬
সুবল (বারুই) ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৫
সুবীর চক্রবর্তী ৩২
সুবীর চ্যাটার্জি ৩২, ৪২, ৪৩, ৭০, ৭১
সুভাষ পাল ১০৩-১০৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২১
সুমনজিৎ রায় ৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৬, ৮০
সুরজিৎ দাস ৬৪, ৮০, ৮১
সুরূপা গুহ হত্যামামলা ১০৫
সুলেখা পাল ১০২-১০৮, ১১০, ১১৩-১১৫, ১১৯
সুশান্ত ধর ৯০-৯৩, ৯৫, ৯৬, ১০১
সূর্য গোলদার ৬৪-৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৮, ৭৯, ৮১
সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক ২১
সেবক সংঘ ৯
স্টোনম্যান ১০৫
স্যামসাং কোম্পানি ৬৭

হরিণঘাটা ৬৫, ৭৮
হরিপাল ৭৭, ৭৮
হাওড়া স্টেশন ১৩, ৫০, ৮১
হায়দরাবাদ ৩১, ৩২, ৩৪
হিমতাজ তেল ৫৮, ৫৯, ৬২, ৭৫
হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০-২৩
হুব্বা/ হুব্বা শ্যামল ১, ৩-১০, ১৪, ১৫, ১৬
হোটেল সার্কুলার ১৩০, ১৩৫

authoritarian parenting ১১১
Control earth ৮৭
Customer Application Form ৬৮
'Factors Contributing to Juvenile Delinquency ১৫৭
hostile ২৪
international mobile equipment identify ৬২
last seen together ১০১
Scientronic India ১১৭
tailoring mark ৮৯
Teenage infatuation ১১২
Tender of pardon ১২৪
Test Identification Parade ২৪
tool marks ৫৮, ৮০
VC Location ১৪৩
Viscera ১২০